KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible]
Title : চিত্রবীক্ষণ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৮/২ ৪৮/৪ ৪৮/৫ ৪৮/৬	Year of Publication জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪ ॥ Jun 1987 শ্রাবণ ১৩৯৪ ॥ Aug 1987 ভাদ্র ১৩৯৪ ॥ Sep 1987 আশ্বিন ১৩৯৪ ॥ Oct 1987
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

সেপটেম্বর ১৯৮৭

□ আধুনিক জীবনেও ধর্ম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে কিভাবে, এই নিয়ে মননশীল নিবন্ধকার অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ঃ "ধর্ম ও আধুনিক সমাজ"। □ সম্প্রতি অতি-উচ্চাশী অভিভাবকরা শিশুকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে তার শৈশবের স্বাভাবিক বিকাশকে কিভাবে বিকৃত করে ফেলছেন, এই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী কামাল হোসেনের রচনা ঃ "শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঃ পদে-পদে বাধা।" □ বুদ্ধদেব বসুর আইডিয়া-প্রধান উপন্যাসের ভাববস্তুর সন্ধানে— অন্নদাশঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদারের আইডিয়া-প্রধান উপন্যাসের তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ আলোচনা। □ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন শান্তনু কায়সার। □ ভাবুক নাট্য-পরিচালক হিসাবেও বিতর্কিত কথাশিল্পী কমলকুমার মজুমদার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার তথ্যনির্ভর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। □ বাংলাদেশের বিপ্লবী সত্যেন সেনের সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুবীর রায়চৌধুরী। □ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবিড় প্রকৃতি-প্রেমের কয়েকটি চমকপ্রদ আলেখ্য নিয়ে তাঁরই এক ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতিচারণ।

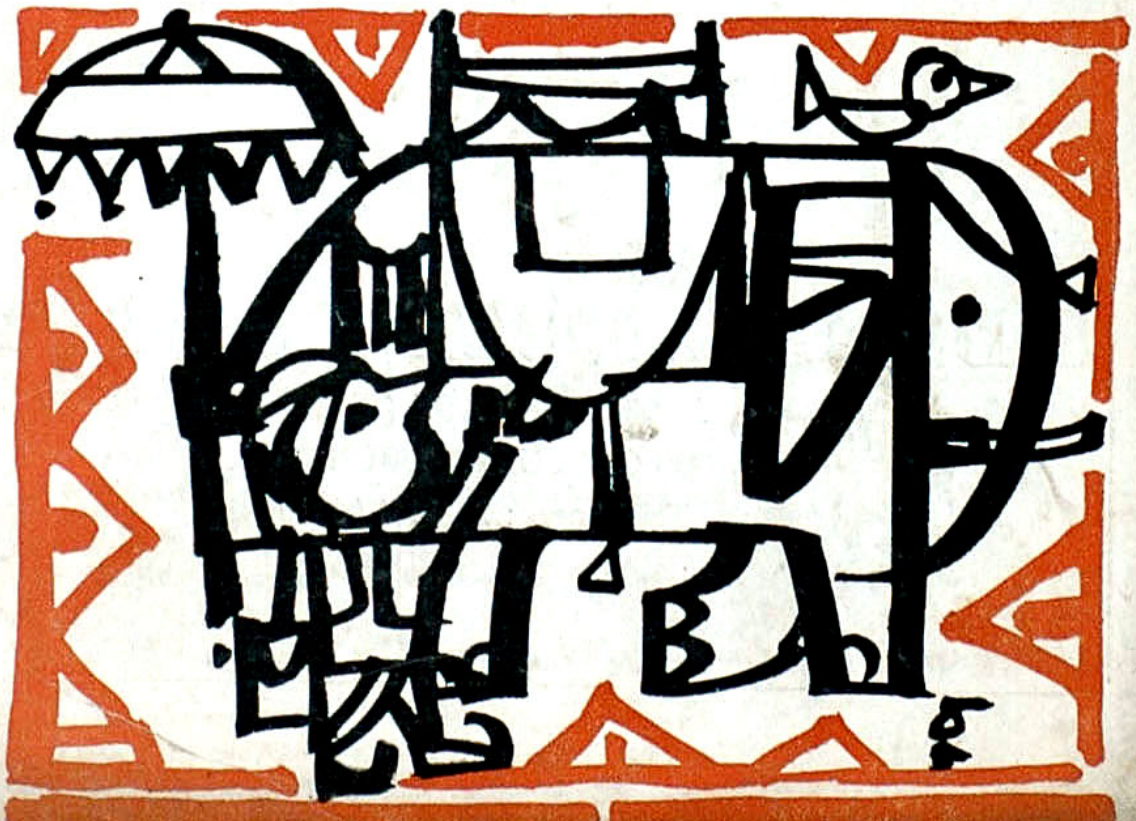

বর্ষ ৪৮। সংখ্যা ৫
সেপটেমবর ১৯৮৭
ভাদ্র ১৩৯৪

ধর্ম ও আধুনিক সমাজ অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩৬৩

শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশ কামাল হোসেন ৩৮০

উপন্যাসে আইডিয়া : বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সন্তোষ চকদার ৪১৪

জ্বলছে কোলকাতা, হে কোলকাতা ফারুক আলমগীর ৩৭২

মায়ের বাপের বাড়ি সুকুমার চৌধুরী ৩৭৪

নিসর্গ-পথিক পরিমল চক্রবর্তী ৩৭৫

সেতার প্রবীরকুমার রায় ৩৭৬

সোনার টুকরো গৌরী দেশপাণ্ডে / বীণা আলাসে ৩৭৭

তন্মাত্র সুভাষ ঘোষাল ৩৯৮

বেলাশেষের তান অমলেন্দু মিত্র ৪০৯

গ্রন্থসমালোচনা ৪২৭

জয়কৃষ্ণ কয়াল, সুবীর রায়চৌধুরী, কান্তি গুপ্ত, মেঘ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সেন

বাংলাদেশ থেকে ৪৪১

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য শান্তনু কায়সার

নাটক ৪৫২

নাট্যপরিচালক কমলকুমার মজুমদার হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

স্মৃতিচারণ ৪৬২

বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে করুণাময় মুখোপাধ্যায়

স্মরণে ৪৭৩

সমর সেন গৌরকিশোর ঘোষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

COLLINS DICTIONARIES

COLLINS POCKET ENGLISH DICTIONARY

70,000 References and 400 Illustrations

£ 2.95=Rs. 65.50

COLLINS FAMILY ENCYCLOPAEDIA :

People and Places : The Natural World : History and Culture : Science and Technology : The World Today.

£ 4.50. Special Indian Price Rs. 60.00

THE COLLINS PAPERBACK ENGLISH DICTIONARY

Over 71,000 References.

Rs. 45.00

COLLINS ENGLISH LEARNER'S DICTIONARY

Over 30,000 words and 35,000 Examples of usage.

Rs. 50.00

THE COLLINS PAPERBACK THESAURUS : A to Z form

Over 2,50,000 Synonyms.

Rs. 40.00

OTHER MEN'S FLOWERS

Compiled by D. MEHRA

Over 1225 Quotations for random reading.

Rs. 25.00

Rupa & Co

CALCUTTA : ALLAHABAD : BOMBAY : DELHI

New Books on History

N.G.L. HAMMOND **A History of Greece** *To 322 B.C.*	£12.50
R. MIDDLEKAUFF **The Glorious Cause**	$12.95
PETER GAY **Freud for Historians**	$17.95
C.C. TRENCH **The Frontier Scouts**	£5.95
W.H. CHAFE **The Unfinished Journey**	$14.95
C. CRUICKSHANK **Special Operations Executive in Scandinavia**	£15.00
D.C. HALLIN **The "Uncensored War"** *The Media and Vietnam*	$22.50
G.E. AYLMER **Rebellion or Revolution?** *England 1640-1660*	£12.50
S.J. UNGAR **Estrangement** *America and the World*	$19.95
BHATTACHARYA & THAPAR **Situating Indian History** *for Sarvepalli Gopal*	Rs200

Oxford University Press
Faraday House
P-17 Mission Row Extn
Calcutta 700013

ধর্ম ও আধুনিক সমাজ

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

আজকের পৃথিবীতে যাঁরা ধর্মকে অস্বীকার করেন তাঁদের সংখ্যা ধর্মে অনুগতদের সংখ্যার তুলনায় নিঃসন্দেহে অনেক কম। আমাদের নিজেদের দেশের বাস্তব পরিস্থিতির দিকে একটু নজর দিলেই এই তথ্যের নির্ভুলতা প্রমাণ করা যায়। আধুনিক ভারতীয় সমাজে শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নয়। এঁরা সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ না হলেও জনসংস্কৃতির ওপর এঁদের প্রভাব অপরিসীম এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চাবি-কাঠি কার্যত এঁদের হাতেই ন্যস্ত। এতৎসত্ত্বেও আমাদের সমাজের অবিসংবাদিত তথ্য এই যে, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস আছে, এমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য। এই ব্যাপক ধর্মানুরক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম সম্পর্কে আদৌ কোনো প্রশ্ন তোলা সংগত কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, অনেকে বলতে পারেন যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই যখন স্বেচ্ছায় ধর্মকে মেনে নিয়েছেন তাঁদের জীবনচর্যার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে তখন ধর্মের যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা নিয়ে কোনো বিতর্কের সূত্রপাত করা অবান্তর এবং অর্থহীন। এর উত্তরে বলা যায়, জীবন আর জগতের মৌল সত্য নির্ধারণে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের নীতি অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক। ইতিহাসে এমন নজির অনেক পাওয়া যায় যে একজনমাত্র মানুষ বিজ্ঞানের এক পরম নির্ভুল সত্য আবিষ্কার করেছেন, এবং এই আবিষ্কারের লগ্নে জনসম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করা সত্ত্বেও ওই আবিষ্কৃত সত্যই শেষ পর্যন্ত শাশ্বত সত্যের স্বীকৃতি লাভ করেছে পৃথিবী জুড়ে। ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সূর্যের চারিপাশে পৃথিবীর আবর্তন সম্পর্কিত সত্য যখন প্রথম জনসমক্ষে উদ্‌ঘোষিত হয় তখন প্রতিকূল মতামতের পরিবেশে নিন্দিত এবং নিগৃহীত হয়েছিলেন এর আবিষ্কারক। কাজেই ধর্মের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আসক্তি এবং আকর্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম স্বভাবতই সমস্ত প্রশ্ন এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে—এই যুক্তি কোনোমতেই গ্রাহ্য নয়।

আবার ধর্ম স্পষ্টতই ক্রিয়াশীল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের পরিমণ্ডলে। অর্থাৎ, ধর্মের অস্তিত্ব এবং প্রভাব অনুভূত হয় প্রধানত ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অভ্যাস আর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। সাধারণত, সব সমাজেই ব্যক্তির স্বকীয়তা রক্ষার স্বার্থে একটি নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলা হয়। এই নীতি অনুযায়ী মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মের স্বাধীনতায় যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। এই কারণেই ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাস, তার পোশাক-পরিচ্ছদের ধরন, পারিবারিক প্রেক্ষিতে তার কর্মপ্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে

বিতর্ক এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রচলিত রীতি নয়। কিন্তু ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও ধর্মের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়। কারণ ধর্মের প্রভাব এতই ব্যাপক যে একজন ব্যক্তির ধর্মীয় বিশ্বাস তার চেতনার মর্মে প্রবেশ করে পরিপার্শ্বের যাবতীয় বস্তু এবং বিষয় সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং এইভাবে ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনধারার সীমানা পার হয়ে বৃহত্তর সমাজজীবনের অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, ধর্মের বিভিন্নতার কারণে এক-একটি ধর্মের মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সংঘবদ্ধ হয় এক-একটি সম্প্রদায়ে, এবং এর ফলে ব্যক্তিস্তরে অনুসৃত হলেও ধর্ম অনিবার্যভাবে একটা সম্প্রদায়গত ব্যঞ্জনা লাভ করে। এই কারণেই খাদ্যাভ্যাসের মতো সাধারণ ব্যক্তিগত অভ্যাসের সঙ্গে ধর্মের সমীকরণ করা সম্ভব নয়। কাজেই ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে ধর্মের সামগ্রিক প্রভাবের তাৎপর্য সম্পর্কে নিবিড় বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ থেকেই যায়।

ধর্মকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে ধর্ম সম্পর্কে আধুনিক কালের মূল অভিযোগগুলি প্রথমে শনাক্ত করা দরকার। একথা অস্বীকার করা যায় না যে ধর্ম যাঁরা মানেন ধর্মের সপক্ষে তাঁদের বিশ্বাসের পাল্লা সব সময়েই ভারি, কিন্তু যুক্তির পাল্লা নয়। ধর্মানুরাগীদের অনেকেরই বক্তব্য এই যে, তাঁরা ধর্ম মানেন এই কারণে যে আবহমান কাল ধরে এ জিনিস চলে আসছে। অর্থাৎ, তাঁদের চোখে যা সনাতন তা-ই সত্য এবং অবশ্য-পালনীয়। কেউ-কেউ আবার তাঁদের ধর্মানুগামিতার একটা বাস্তববাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন পারিবারিক প্রভাবের। তাঁদের বিশ্লেষণ অনুসারে, পরিবারের প্রাথমিক সামাজিকীকরণ-প্রক্রিয়ার প্রভাবে একজন ব্যক্তির আচরণে অনিবার্য-ভাবে সঞ্চারিত হয় কিছু পারিবারিক প্রথা অনুসরণের প্রবণতা, এবং এইভাবে পরিবার থেকে লব্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। আর-এক দল প্রকাশ্যে সব সময় স্বীকার না করলেও তাঁদের আচরণে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে ধর্মকে কার্যত তাঁরা ভয় পান। অর্থাৎ, ধর্ম-অনুরক্ত না থাকলে ইহলোকে আর পরলোকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতি এবং বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হবে, এই আশঙ্কায় তাঁরা ধর্ম মেনে চলেন। বস্তুত, আমাদের ভাষায় 'ধর্মভীরু' কথাটির প্রচলন অকারণে হয় নি।

ধর্মানুরাগের কারণ হিসাবে উপস্থাপিত এইসব যুক্তি অবশ্যই ধর্মের সপক্ষে কোনো বাস্তবানুগ এবং বিজ্ঞানসম্মত সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করতে পারে না, এবং এর ফলেই আধুনিক কালের যুক্তিনিষ্ঠ মননশীলতার পরিবেশে ধর্ম সম্পর্কে গড়ে উঠেছে একটা বিরূপতার মনোভাব। ধর্মের বিপক্ষে ধর্মবিরোধীদের প্রথম যুক্তি এই যে, প্রমাণসাপেক্ষ তথ্য এবং যুক্তির ওপর ধর্ম আদৌ নির্ভরশীল নয়, ধর্মের শক্তি এবং সক্রিয়তার মূলে রয়েছে অলীক কল্পনা আর মিথ্যা বিশ্বাস। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, সব ধর্মই ঈশ্বরকেন্দ্রিক, কিন্তু কোনো ধর্মেই ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই। সব ধর্মই নানাবিধ আচার আর অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দেয়, কিন্তু কোনো ধর্মই এই আচার-অনুষ্ঠান পালনের যৌক্তিকতা প্রমাণে আগ্রহী নয়। এক কথায়, প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি হল প্রমাণনিরপেক্ষ পূর্বতঃসিদ্ধ অনুমান যার প্রভাবে মানুষের বাস্তববোধ আচ্ছন্ন হয় জড়তায়। দ্বিতীয়ত, এই জড়তা থেকে জন্ম নেয় সংকীর্ণ সংস্কার এবং তীব্র যুক্তিহীন আবেগানুভূতি যা মানুষের শুভবুদ্ধিকে হনন করে তার মানসিকতায় নিয়ে আসে ধর্মান্ধতা। এই ধর্মান্ধতার প্রভাবে এক ধর্মসম্প্রদায়ের বৈরিতার খড়্গ অকারণে উদ্যত হয় অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। বস্তুত, এই বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক হানাহানির অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে মানুষের ইতিহাসে। ধর্মবিরোধীদের তৃতীয় যুক্তি এই যে, ধর্ম মানুষকে ঐশী শক্তির সার্বভৌমতা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে উৎসাহিত করে যার ফলে মানুষ সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে

প্রতিরোধহীন বশ্যতা আর আত্মসমর্পণে। ধর্মের এই বিচিত্র প্রভাবের আনুকূল্যে শাসকশ্রেণী দুর্বল শ্রেণীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে সমাজজীবনে আগ্রাসী শাসন এবং শোষণের ধারাকে অব্যাহত রাখার সুযোগ পায়।

ধর্মের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগের কোনোটাই ভিত্তিহীন নয়। ধর্ম কেমন করে কলুষিত করতে পারে রাজনীতি, সমাজনীতি তথা সামগ্রিক জীবনধারাকে, তার অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায় আমাদেরই দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে। কিন্তু এর জন্য কি ধর্মই প্রকৃতপক্ষে দায়ী, না দায়ী ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার? অর্থাৎ, পৃথিবীতে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই কি সমস্যার সমাধান হবে, না ধর্ম সম্পর্কে এক যুক্তিবাদী এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারলে আমরা যথার্থই উপকৃত হব? মূলত এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

দুই

ধর্ম শব্দের উৎপত্তি 'ধৃ'-ধাতু থেকে। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ওপর নির্ভর করে ধর্মের প্রবক্তারা দাবি করে থাকেন যে, ধর্মের মূল কাজ হল সমাজকে ধরে রাখা অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কে শৃঙ্খলা-সংহতি রক্ষা করে এবং সমাজবন্ধনকে সুদৃঢ় করে ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনই হল ধর্মের উদ্দেশ্য। কিন্তু শুধুমাত্র সমাজের ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ধর্মের এই ধরে রাখার কাজ। ধর্ম ব্যক্তিকে ধরে রাখে এই অর্থে যে নিরন্তর জীবনসংগ্রামে রত মানুষ ধর্মের কাছ থেকে পেয়ে থাকে তার একান্ত প্রয়োজনীয় আশ্বাস আর আত্মবিশ্বাস। ব্যক্তিজীবনে ধর্মের এই সদর্থক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে নিয়ে ধর্মের প্রবক্তারা সাধারণত অধ্যাত্মবাদের অবতারণা করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও অনুগ্রহকে পরম সত্য বলে গ্রহণ করে তাঁরা এই যুক্তি দেন যে, যেহেতু ঈশ্বরই হল সমস্ত শক্তির উৎস, সে কারণে ঈশ্বরের শরণাগতিই ব্যক্তির শক্তি আর সাহসের শাশ্বত প্রেরণা। কিন্তু এই যুক্তি অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক, এবং স্বভাবতই আধুনিক যুগে অগ্রাহ্য। অবশ্য, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মনস্তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মের ইতিবাচক ভূমিকার একটা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, যে ব্যাখ্যা অবশ্যই আধুনিকতাবিরোধী বলে বিবেচিত হবে না। তবে এই ব্যাখ্যা পেশ করার আগে সুদূর অতীতে মানুষের সমাজে কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

মানুষের জীবনে নিতান্ত আকস্মিকভাবে অথবা অকারণে ধর্মের উদ্ভব হয় নি। প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মানুষের কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সভ্যতার সূচনা। সভ্যতার আদি পর্বে স্বাভাবিক কারণেই মানুষের জ্ঞান, শক্তি এবং নৈপুণ্য ছিল অপরিণত স্তরে। ফলত প্রকৃতি তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল অমোঘ, অজেয় ও দুর্বার রূপে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণামে পদে-পদে পরাজয়ের গ্লানি মানুষের পক্ষে ছিল বিষম ক্ষতিকর। কারণ এই গ্লানির ভারে ক্ষুণ্ণ হতে পারত তার আত্মবিশ্বাস, এবং অবসাদে আর আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিমুখ হয়ে পড়াও নিতান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। অথচ সেদিন এই সংগ্রামই ছিল মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায়। অর্থাৎ, প্রকৃতির কাছে পরাজিত হয়েও আবার নবোদ্যমে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই ছিল সেদিন মানুষের কাছে একমাত্র পথ। কাজেই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হয়ে মানুষ যাতে ব্যর্থতাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে সাহস আর সক্রিয়তা না হারায় সেজন্য তার প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষার। এই মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষার প্রয়োজন মেটাতেই ধর্মের উদ্ভব। যে-যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের কাছে

নিয়ন্ত্রণাতীত ও অজেয় বলে প্রতিপন্ন হতে থাকে, সেই-সেই শক্তিতেই সে আরোপ করতে থাকে দেবত্ব, এইসব দৈব শক্তিকে অধরা ও অসীম রূপে ধারণা করে নিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা আর অক্ষমতায় দিতে থাকে সান্ত্বনার প্রলেপ। একই ভাবে বিশাল প্রকৃতি-জগতের সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটন করার মতো উপযুক্ত বৌদ্ধিক ক্ষমতা মানুষ তখনও লাভ করতে পারে নি বলে সৃষ্টির মূলে চিহ্নিত হয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এ সবই ছিল নিছক কল্পনা। কাজেই একথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষের জীবন ধর্মের সূত্রপাত প্রমাণনিরপেক্ষ কল্পনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই কল্পনাকে যদি মানুষ সেদিন আঁকড়ে ধরতে না পারত তাহলে প্রকৃতির কাছে পর্যুদস্ত মানুষের ক্রমাগত পশ্চাদপসারণের ফলে সভ্যতার সূচনাতেই দেখা দিত সভ্যতার সংকট। আরও লক্ষণীয় যে, এই কল্পনা আর যুক্তিহীন বিশ্বাসে নিষিক্ত ধর্ম যুগ-যুগ ধরে সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও মানুষের সভ্যতা আজ বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে এবং বিজ্ঞান এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। অর্থাৎ, পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনও অপার্থিব ধর্মীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল হওয়া সত্ত্বেও পার্থিব শক্তির সহায়তায় মানুষের বস্তুগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। এর কারণ এই যে ধর্ম মানুষকে অদৃশ্য ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে, কিন্তু এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে উদ্যোগহীন আর নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরামর্শ কখনই দেয় নি। যে ধর্ম নিরন্তর গৌরবান্বিত করেছে অতীন্দ্রিয় জগৎকে সেই ধর্মই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-জয়ে এবং কাপুরুষতা পরিহার করে তাকে কর্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে ধর্ম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলে নি যে সামনের পথ ক্ষুরের ফলকের মতোই তীক্ষ্ণ আর দুর্গম, এবং এই পথ দিয়েই মানুষকে যেতে হবে 'চরৈবেতি'র মন্ত্র সম্বল করে।

অতীত কালে যে পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল তার জীবনে সে পরিপ্রেক্ষিত আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির প্রতিকূলতার উপযুক্ত মোকাবিলা করে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের আধিপত্য বিস্তারের পর্যাপ্ত সুযোগ এনে দিয়েছে। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই পরিবর্তিত অবস্থায় ব্যক্তিজীবনে আর ধর্মের প্রয়োজন কোথায়? বলা যেতে পারে যে প্রাকৃত শক্তিকে পরাভূত করার মতো অসংখ্য অস্ত্র আজ উদ্ভাবিত হয়েছে বিজ্ঞানের কল্যাণে। অতএব বিজ্ঞানের সাফল্যই আজ মানুষের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাসের সুনিশ্চিত উৎস, এবং অতীত দিনের মতো ধর্মের কাছ থেকে মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন মানুষের ফুরিয়ে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি অভ্রান্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে একথা মেনে নিতেই হয় যে, বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত মানুষের মানস-লোকে এমন সাহস আর আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করতে পারে নি যার আনুকূল্যে আধুনিক মানুষের পক্ষে ধর্মকে নিঃসংশয়ে নির্বাসন দেওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের এই ব্যর্থতা এই কারণে যে আজও প্রকৃতিকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হয় নি। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে আজকের পৃথিবীতে বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা প্রকৃতির অনেক রহস্য ভেদ করতে পেরেছি এবং প্রকৃতির বিপুল শক্তিকে অনেকাংশে বশে এনে অবিশ্বাস্য উন্নতি ঘটিয়েছি আমাদের জীবনচর্যায়। তথাপি প্রকৃতিজগতে এমন কিছু সত্য ধ্রুবতায় ভাস্বর হয়ে আছে যাকে পরিবর্তনের স্পর্ধা বিজ্ঞানের নেই। মৌল প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষমতাও নেই বিজ্ঞানের। বস্তুত, সূর্য এবং সৌরজগতের অস্তিত্ব এবং নিয়ম মেনে নিয়েই বিজ্ঞানীকে চালাতে হয় তার অনুসন্ধান; সৃষ্টি এবং বিনাশের মূল প্রাকৃতিক নিয়ম উপেক্ষা করাও বিজ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব। অন্য-ভাবে বলা যায় যে, আধুনিক পৃথিবীতে বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে আমরা প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে শিখেছি,

প্রকৃতিজগতে ক্রমাগত আধিপত্য স্থাপনের উদ্যোগ নিতে পেরেছি, কিন্তু প্রকৃতির অমোঘতাকে এখনও অস্বীকার করতে পারি নি। তাই তুষারপাত, বজ্র-বিদ্যুৎ, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদির পিছনে যে কার্যকারণ-সম্পর্ক ক্রিয়ারত, সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব নেই এবং বৈজ্ঞানিক কৃৎকৌশলের মাধ্যমে এগুলির পূর্বাভাসও আমরা দিতে পারি। কিন্তু যখন এইসব প্রাকৃতিক ঘটনার বিধ্বংসী প্রভাবে জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দেয় তখন এগুলিকে বন্ধ করার কোনো শক্তিই আমাদের নেই। নদী বা সমুদ্রের প্রলয়ংকর জলোচ্ছ্বাস অথবা ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানীও একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মতোই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করেন।

এই অসহায়তা সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয় তখন যখন মানুষকে বিনা প্রশ্নে আর প্রতিবাদে মেনে নিতে হয় নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত প্রাকৃতিক নিয়মের অনিবার্যতাকে। মানুষ জানে যে তার দেহের ক্ষয় আর বিনাশ প্রতিরোধের ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই; বস্তুত, এমন কোনো জাগতিক শক্তি নেই যার সহায়তায় সে মৃত্যুর প্রাকৃতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করতে পারে। আধুনিক মানুষ যত যুক্তিবাদীই হোক না কেন, এই উপলব্ধি অবশ্যই তার পক্ষে সুখকর নয়, এবং মৃত্যুচেতনায় রক্তমাংসের সাধারণ মানুষের সাহস আর আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। যে জীবন তার একান্ত নিজস্ব, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও সেই জীবনের ওপর তার প্রকৃতপক্ষে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই—এই যদি হয় কঠোর বাস্তব, তাহলে তার প্রভাবে যে হীনম্মন্যতা আর দুর্বলতা দেখা দেয়, তা এড়িয়ে যাওয়া অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ক্রিয়াশীলতায় আধুনিক মানুষের মানসিকতায় এই যে সংকট দেখা দেয়, তা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য একটা শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষার প্রয়োজন। অতীতে এই প্রতিরক্ষার উৎস ছিল ধর্ম এবং আজও ধর্মই দিতে পারে এই মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা। কাজেই বলা যেতে পারে যে আধুনিক কালেও ব্যক্তির জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। বস্তুত, মানুষ যদি অদৃশ্য আর অনন্ত ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে পারে তাহলে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে, বিশেষ করে মৃত্যুর অপরি-বর্তনীয় নিয়মের কাছে, অধীনতা মেনে নিতে গিয়ে সে নিজেকে ক্ষুদ্র আর অসহায় বলে ভাববে না, কারণ সে মনে করবে যে সমগ্র প্রকৃতিজগৎও তারই মতো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং এই বিচারে প্রাকৃতিক নিয়মও সেই সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার অভি-ব্যক্তি মাত্র। এইভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা মানুষ তার ব্যক্তিজীবনে প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার আর্তি থেকে মুক্ত হয়ে আত্মবিশ্বাস আর আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পারে, এবং আধুনিক ব্যক্তিজীবনে ধর্মের উপকারিতা এবং মূল্য এইখানে।

অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তব সত্যের কোনো সংযোগ নেই; প্রমাণনিরপেক্ষ অনুমান আর কল্পনাই হল ধর্মের ভিত্তি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মনের ধর্ম সম্পর্কে অন্যতম আপত্তি এই কারণে। কিন্তু মনে রাখা দরকার, আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং ব্যর্থতাই এই কল্পনায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষ যদি তার সমস্ত প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে পারত তাহলে ধর্ম আপনা-আপনিই বিদায় নিত আধুনিক জীবন থেকে। যতদিন মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের রাজত্বকে মেনে নিতে বাধ্য হবে, ততদিন ধর্ম কোনো-কোনো রূপে প্রভাবান্বিত করবে তার জীবনকে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম অবশ্যই কল্পনা। কিন্তু ব্যক্তির মননে আর চিন্তায় কল্পনার কোনো স্থান নেই—এই সিদ্ধান্তও কাল্পনিক। বস্তুত, মানুষ কল্পনা ছাড়া বাঁচতে পারে না। তবে যে কল্পনা তার সৃজন-শীলতার প্রতিবন্ধক, যে কল্পনা তাকে শক্তি যোগায়

না, সে কল্পনা অবশ্যই বর্জনীয়। ধর্ম কল্পনা হলেও তা মানুষকে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাকে সক্রিয় থাকার প্রেরণা দেয়। কাজেই ব্যক্তির জীবনে ধর্মরূপ কল্পনার ভূমিকা ইতিবাচক হতে পারে। তৃতীয়ত, মানুষের মনের উৎকর্ষ-সাধনে ধর্মের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। ধর্মের প্রবক্তারা দাবি করে থাকেন যে ঈশ্বরের প্রতি বিশুদ্ধ ভক্তি, বিশ্বাস এবং ভালোবাসা মানসিক দিক থেকে ব্যক্তিকে পবিত্র আর উন্নত করে তোলে এই-ভাবে যে ঈশ্বরচিন্তায় সযত হয় মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি এবং পাশবিক প্রবৃত্তি, এবং মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় মহত্তর বৃহত্তর জীবনাদর্শে। যুক্তিবাদী মানদণ্ডের বিচারে এই দাবি ভিত্তিহীন বলেই বিবেচিত হবে। কারণ ঠিক কোন্ প্রক্রিয়ায় এই পবিত্রতার উন্মেষ ঘটতে পারে সে বিষয়ে ধর্মের প্রবক্তারা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। তাঁদের বক্তব্য এই যে ঈশ্বর পরম পবিত্রতার প্রতীক। কাজেই ভক্তি আর ভালোবাসা নিয়ে এই ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন করতে পারলে ঐশ্বরিক করুণায় মানুষের মন আপনা-আপনিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে পবিত্রতার আলোয়। এই অধ্যাত্মবাদী ব্যাখ্যায় আধুনিক বস্তুবাদী মন অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে না। কিন্তু আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় ভক্তি ও বিশ্বাস এক ধরনের বিশেষ মানসিক ক্রিয়ার ফলমাত্র, যে মানসিক ক্রিয়ার সদর্থক মূল্য কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মনে রাখা দরকার, চিত্তের কঠোর অনুশীলন ছাড়া ইন্দ্রিয়াতীত, কল্পিত ঈশ্বরে অনুরাগী হওয়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যে ঈশ্বরকে চোখে দেখা যায় না, যার অস্তিত্ব বাস্তবে অনুভব করা যায় না, তাকে প্রিয়জনের মতো ভালোবাসতে হলে প্রয়োজন হয় একাগ্রতা আর মনঃসংযোগের, যার মূল ভিত্তি হল আত্মসংযম, এবং এই আত্মসংযমই হল যাবতীয় মানবিক সদ্‌গুণের উৎস। অতএব ধর্ম কল্পনা হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে ধর্মে নিহিত কল্পনাশক্তি উন্নত মানসিকতার সহায়ক।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে ধর্ম নিছক কল্পনা হলেও ব্যক্তিগত জীবনে এই কল্পনা নিরর্থক এবং নিষ্প্রয়োজন নয়। অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়ম এবং নিজের জীবনের সীমাবদ্ধতা মানুষের কাছে চরম বাস্তব। সাহস আর আত্মবিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে এই বাস্তবের উপযুক্ত মোকাবিলা করতে না পারলে মানুষের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। কল্পনা হলেও ধর্ম মানুষকে যোগাতে পারে এই সাহস আর আত্মবিশ্বাস। একই সঙ্গে ধর্মের কাছ থেকে মানুষ পেতে পারে মহৎ মূল্যবোধের প্রেরণা। কাজেই আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যদি ধর্মকে কেবলমাত্র এক প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক আশ্রয় রূপে স্বীকার করে নেয় এবং একের ধর্ম যদি অন্যের ক্ষতি বা স্বার্থহানির কারণ না হয় তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের অধিষ্ঠান কোনো আধুনিক যুক্তিতেই আপত্তিকর বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

তিন

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ম কখনই ব্যক্তিস্তরে এক নির্দোষ বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, অনেক ক্ষেত্রেই একের ধর্ম অন্যের বিপদ এবং বিড়ম্বনার কারণ হয়েছে। ধর্মের এই নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক ভূমিকা প্রকট হয়েছে মূলত ধর্মীয় রীতি এবং আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অনুরাগ প্রত্যেক ধর্মের মূল নীতি হলেও, সব ধর্মই অনুগতদের নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালনের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ দেওয়া হয় এই পূর্বানুমানের ভিত্তিতে যে এই-সব আচার-অনুষ্ঠান কঠোরভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়েই মানুষের বিমূর্ত ঈশ্বরানুরাগ বাস্তব রূপ লাভ করে, যেহেতু এই ধর্মীয় আচার পালন ঈশ্বরের অভিপ্রেত। এইভাবে প্রত্যেক ধর্মেই ব্যক্তিজীবনে ধর্মের মূল নীতি অনুসরণ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব

দেওয়া হয়েছে ধর্মানুষ্ঠান পালনের ওপর। অথচ এই ধর্মানুষ্ঠানের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য অথবা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করেন নি ধর্মের প্রবক্তারা। বস্তুত, মানুষ কেন ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মীয় আচার পালনে সচেষ্ট হবে—কোনো ধর্মগুরু বা ধর্ম-পণ্ডিতই এই প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি, কারণ তাঁদের অধ্যাত্মবাদী বিচারের মানদণ্ডে একজন ব্যক্তির ধার্মিকতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল ধর্মনির্দিষ্ট আচার আর অনুষ্ঠান পালনে তার নিষ্ঠা আর তৎপরতা।

সব ধর্মেই কার্যত ধর্মের আনুষ্ঠানিক অনুষঙ্গ তার নীতিগত দিক অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পাওয়ার ফলে, এবং ধর্মানুষ্ঠানের আবশ্যিকতা সপ্রমাণে নির্দ্বিধায় শুধুমাত্র যুক্তিহীন বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করার ফলে, ধর্ম মানুষের ব্যবহারিক জীবনে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। যুক্তিনিরপেক্ষ ও বিচার-নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ধর্ম আর সংস্কারের মধ্যে ভেদাভেদ করতে পারে না। ধর্মীয় রীতি কেন পালন করতে হবে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো স্পষ্ট, বাস্তবানুগ ব্যাখ্যা নেই, অথচ ধর্মের নির্দেশে এই রীতি তার কাছে অবশ্য-পালনীয়—এই পরিস্থিতিতে তার মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে, ধর্ম হল এক অনন্য জীবনরীতি যা অনন্তকাল ধরে একই-ভাবে চলে আসছে, যার ব্যাখ্যা নেই, পরিবর্তন নেই, যা যুক্তি আর জিজ্ঞাসার ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ যা বুদ্ধির অগম্য এক ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কার। এই সংস্কারের প্রভাবে মানুষের মনে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সংকীর্ণতা, অনমনীয়তা আর অন্ধ আবেগ। নিজের ধর্মানুষ্ঠানের মহিমায় বিমুগ্ধ ব্যক্তি ভিন্নধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সম্প্রদায়গত সম্পর্কে দেখা দেয় উপেক্ষা আর অসহিষ্ণুতার ভাব, যা সামান্য অজুহাতেই বিস্ফোরিত হতে পারে বিরোধ আর সংঘর্ষে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম-অনুষ্ঠানকে তার ধর্মপালনের প্রধানতম অঙ্গ রূপে গ্রহণ করার ফলে মানুষ নিজের ধর্মানুষ্ঠানক্রিয়ায় কোনো পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। এর ফলে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অপরিবর্তিত ধর্মীয় রীতি ব্যক্তির সামাজিকীকরণপ্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত, ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি অন্ধ আসক্তি মানুষের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে এক বিপজ্জনক যুক্তিহীন আবেগে। ফলত মানুষ তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধর্মবহির্ভূত সামাজিক বাস্তবকে বিচারের চেষ্টা করে যার দ্বারা কলুষিত হয় সমাজপ্রগতির ধারা।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মের মূল নীতির মতোই ধর্মীয় আচারও অকারণে প্রবর্তিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণের স্বার্থেই এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য বহু শতাব্দী পূর্বের অনুন্নত সমাজে যখন এগুলি প্রচলিত হয় তখন কঠোর যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে এগুলির উপযোগিতা যাচাই করে নেওয়ার মতো পরিণত মননশক্তি মানুষের ছিল না। অথচ সামগ্রিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বস্তরের মানুষের কাছে কতকগুলি আচার-আচরণকে অবশ্য-পালনীয় করে তোলা ছিল একান্তই জরুরি। যেহেতু ঈশ্বর এবং ধর্ম সম্পর্কে সেদিনের মানুষ ছিল স্বভাবতই দুর্বল সে কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে এক নির্দিষ্ট আচার-আচরণবিধি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এই আশায় যে ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণায় এই বিধি-পালনে কেউ-ই বিরত হবে না। এই কারণেই প্রারম্ভিক পর্বে ধর্মীয় আচারের কোনো বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নি, অধ্যাত্ম-বাদের বর্মের আড়ালে এগুলিকে সুরক্ষিত করে রাখাই সঙ্গত বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আধুনিক কালে উন্নত বিজ্ঞানের সক্রিয়তায় যখন মানুষের যুক্তিবাদী এবং অনুসন্ধানী মননে জাগরণ দেখা দিয়েছে তখনও ধর্মীয় আচারকে অধ্যাত্মবাদী বিশ্বাস থেকে বিযুক্ত করার কোনো চেষ্টা করা হয় নি।

এ বিষয়ে ত্রুটি ঘটেছে দুদিক থেকে। একদিকে ধর্মের তথাকথিত ধারক-বাহকেরা, অর্থাৎ পুরোহিত-মোল্লার দল, নিজেদের স্বার্থে ধর্মীয় আচারকে যুক্তি আর ব্যাখ্যার উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। তাঁরা মনে করেছেন যে এগুলির বস্তুবাদী ভিত্তি এবং ব্যবহারিক উপযোগিতা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে তাঁদের সামাজিক কর্তৃত্ব বিপন্ন হবে। এইজন্যই ধর্মীয় আচারকে অধ্যাত্মবাদে অনুপ্রাণিত অলঙ্ঘ্য এবং অপরিবর্তনীয় সংস্কাররূপে প্রতিপন্ন করতে তাঁরা সততই তৎপর। অবশ্য ধর্মীয় আচারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়ার মত সংস্কারমুক্ত, উদার মানসিকতা তাঁদের আছে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্যদিকে আধুনিক যুগের শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মানুষও এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি। তাঁরা ধর্মীয় আচারের বাইরের আকৃতি দেখে, এদের অপব্যবহার দেখে এগুলি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু এইসব ধর্মীয় রীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এদের প্রকৃত বাস্তব উপযোগিতা নিরূপণে এঁরা স্পষ্টতই অনাগ্রহী। ফলত, পুরোহিত-মোল্লাদের নির্বোধ প্রশ্রয়ে যেমন ধর্মীয় আচার ব্যক্তিএবং সমাজের ক্ষতি করে চলেছে, তেমনই যুক্তিবাদী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদাসীনতায়এই ধর্মীয় আচারের প্রকৃত সুফল সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে আধুনিক সমাজ।

সতর্কতার সঙ্গে, আন্তরিকতার সঙ্গে এবং প্রকৃত সত্য সন্ধানের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা যদি বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই তাহলে দেখতে পাব যে সব ধর্মের নির্দেশিত আচার-আচরণের মূল লক্ষ্য প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন : এই লক্ষ্য ব্যক্তি এবং সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। বস্তুত, প্রত্যেক ধর্মেই অধিকাংশ পালনীয় আচার এবং অনুষ্ঠান ব্যক্তির দেহ আর মনের সুষম বিকাশের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে ধর্মকে এক অর্থে মৌল স্বাস্থ্যবিধি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক কথায়, আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ধর্মীয় আচারের আভরণমাত্র, তার প্রকৃত তাৎপর্য অবশ্যই বাস্তব এবং বিষয়গত। যেমন ইসলামে নির্দেশিত সালাত বা নামাযে 'রুকু', 'সেজদা' প্রভৃতি প্রকৃতার্থে শারীরিক ব্যায়ামবিধি ব্যক্তির স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। একইভাবে হিন্দুদের পূজার্চনায় প্রচলিত পদ্মাসন, প্রাণায়াম, অঙ্গুলিমুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়ামের অঙ্গ। মুসলমানদের পালনীয় রোজা এবং হিন্দুদের উপবাসবিধিও স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিধান। যে তুলসীমঞ্চ স্থাপন হিন্দুগৃহে আবশ্যিক ধর্মীয় রীতি তা যে প্রকৃতপক্ষে তুলসীপাতার ভেষজ গুণের জন্য, একথা বুঝতেও অসুবিধা হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আচারের এই বাস্তব উপযোগিতা সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় না। কাজেই প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য প্রতিটি ধর্মীয় আচারকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যা একমাত্র শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার দ্বারাই সম্ভব।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা চলে যে, আধুনিক সমাজে ধর্ম বর্জনের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু ধর্ম সম্পর্কে এক পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির। কোনো তর্কাতীত আধ্যাত্মিক কারণে নয়, নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণেই মানুষের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন—এই সত্য যদি আমরা মেনে নিতে পারি তাহলে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধের আর কোনো অবকাশ থাকে না। কারণ ধর্মকে যদি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আশ্রয় রূপে চিহ্নিত করা হয় তাহলে ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞানের মূল্যায়নই বজায় থাকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারেই ধর্মের স্থান নির্ধারিত হয় ব্যক্তির কল্পনায়। অন্যদিকে ধর্মের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ বিজ্ঞানের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয় না। কারণ ব্যক্তির মননে কল্পনার ক্রিয়াশীলতা বিজ্ঞান অস্বীকার করতে পারে না। এ ছাড়া ধর্ম এক অনন্য কল্পনা এই অর্থে যে এই কল্পনার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয় বিজ্ঞানের ব্যর্থতায়। অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের

মোকাবিলায় বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতাই মানুষকে অন্য উৎস থেকে তার প্রয়োজনীয় সাহস আর আত্মবিশ্বাস আহরণে বাধ্য করে এবং এই কারণে বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও ধর্মে আস্থাশীল। কাজেই বিজ্ঞানের সাযুজ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি যত বস্তুবাদীই হোক না কেন, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্তরে নানা ধরনের বিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না। এর অর্থ এই নয় যে, যে মানুষ ধর্ম-বিশ্বাস ছাড়াই আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে তাকে জোর করে ধর্মানুরক্ত করা সামাজিক দায়িত্ব। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কল্পিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে অথবা অদৃশ্য কোনো শক্তিতে চিত্ত নিবদ্ধ করে আত্মশক্তিতে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে তবে তার এই ব্যক্তিগত জীবনচর্যাকে তুচ্ছ ভাবাও সঙ্গত নয়।

অবশ্য আধুনিক সমাজে ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা হিসাবে হয়তো অনেকে মেনে নেবেন, কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে শিক্ষিত, আধুনিক মানুষের অভিযোগের অন্ত নেই। এই অভিযোগ যে অসংগত নয় সে আলোচনা আমরা আগেই করেছি। তবে একথাও অস্বীকার করা যায় না যে ধর্মীয় আচার সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপনে আমরা সততই তৎপর, কিন্তু এই আচারের প্রকৃত স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য অনুধাবন করার জন্য বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় আমরা আদৌ উৎসাহী নই। বস্তুত, আধুনিক কালে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নানা বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা লক্ষ করা যায়, কিন্তু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় কেউ-ই আগ্রহী নন। অথচ এই গবেষণা আমাদের সাহায্য করতে পারে নানা দিক থেকে। প্রথমত, নিবিড় গবেষণা-মূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি ধর্মীয় আচারের বাস্তব উপযোগিতা নির্ধারণ করতে পারলে আমরা উপযুক্ত, যুক্তি এবং তথ্য সহ ধর্মানুগতদের বোঝাতে পারি যে কোন্ কোন্ আচার পরিবর্তিত পরিবেশে তাদের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এর ফলে ধর্মীয় আচার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাম্য পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় আচারের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত চিহ্নিত করতে পারলে মানুষের আচারনিষ্ঠা স্বভাবতই সংকীর্ণ সংস্কারমনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তৃতীয়ত, উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে সব ধর্মের ধর্মীয় আচারকে যদি আমরা তথাকথিত অধ্যাত্মবাদের আবর্ত থেকে মুক্ত করে ব্যক্তি এবং সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের জমিতে দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তাহলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে যে সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মূলত এক অভিন্ন বাস্তব লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত। একথা অনস্বীকার্য যে এই উপলব্ধিই হল ধর্মীয় বিরোধ অপসারণের এবং সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

জ্বলছে কোলকাতা, হে কোলকাতা

ফারুক আলমগীর

আমার পিতৃপুরুষবর্গের দীর্ঘশ্বাসের শহর তুমি
ছিলে বড়ো দেমাকি, ভিকটোরীয় ছাঁদের ঠাসবুনোন
তোমার শরীরে, দীর্ঘনাসা আয়তচক্ষু সুডৌল বক্ষ
সংগত কারণে লালসার বস্তু হয় এখনো জব চার্নকের।

আমার পিতামহ ছিলেন মেধাবী ছাত্র, আজীবনভর
ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ ছিল তাঁর ব্রত, এই শহরে
প্রথম আগমনেই হৃদয় কেড়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের—
তাদের তাবৎ পত্র হলদে তুলোট কাগজ সেই কবে থেকে
যত্নহীন পড়ে আছে আমার পিতার কালো নিজস্ব সিন্দুকে।

আমার পিতা, তিনিও মেধাবী ছাত্র অথচ জীবনের সোপান
তাঁকে পৌঁছে দেয় নি তাঁর অনন্যসাধারণ মেধার সমান
—এমন কি পারেন নি হাসান
শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী সামান্যতম সাহায্য করতে এই ধীমান
মুসলিম তরুণকে—মধ্যতিরিশের কোলকাতার অগণ্য শিক্ষিত বেকার
মুসলমান যুবকের মতোন তাঁর সামনে পড়ে ছিল বিশাল মৃত
কোলকাতা, সরীসৃপের খোলস, মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট বেকার হোস্‌টেল

অথচ আমার পিতা, প্রথম বসন্ত তাঁর
কেটেছে এই শহরে—এখনো দেখেন স্বপ্ন
কোলকাতার, পার্ক স্ট্রীট থেকে পায়ে হেঁটে
ট্রামের রাস্তা ধরে পেরিয়ে যান চৌরঙ্গী
যেন হাওয়ায় উড়ে যান, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল
ছাড়িয়ে ওপরে অনেক ওপরে মনুমেন্‌টে
কোলকাতার শীর্ষদেশ থেকে দেখেন তাঁর
তারুণ্যের যৌবনের শহর চলছে হাওড়া থেকে
ট্রেনে চেপে নিরুদ্দিষ্ট মানুষের স্রোতে—

আমার পিতার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল তার উত্তাল বসন্তের
দিনগুলো, এই শহর যখন হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল
যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ মারী ও মড়ক হন্তারক-দাঙ্গায়
কী নিদারুণ সাহসে তখন তিনি বাজাতেন সাইরেন
নিষ্প্রদীপ মহড়ার রাতে, আমার কিশোরী মাকে গৃহে রেখে

নিরুদ্বিগ্ন তিনি চলে যেতেন বেসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যূহকে
সুদৃঢ় করতে, নিজের গৃহকে অরক্ষিত রেখে ডাক দিতেন
শহর কোলকাতাকে ছুটতে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে
চল্লিশে বিয়াল্লিশে ছেচল্লিশে যে আগুনে পুড়েছিলেন
—আমার পিতা
শোকদুঃখ অন্তর্লীন বেদনায়, শহর কোলকাতা এখনো পুড়ছে
সে আগুনে—এখন মার্চের উনত্রিশে উনিশশো ছিয়াশি সালে
রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর কবিতা ভবন থেকে সল্ট-লেক
দমদমের উদোম উদাস হাওয়া চতুরঙ্গ প্রতিক্ষণের
বুদ্ধিপ্রভ সম্পাদক কবি চারুশিল্পীর দফতর জ্বলছে
নিসর্গের জন্যে, শিল্পের জন্যে প্রেমের জন্যে বাঁচার জন্যে—
আর এই প্রজ্বলিত আমার পিতৃপুরুষের শহরে
পদাতিক আগন্তুক আমাকে চেনে না কেউ, শঙ্কা হয়
ডালহৌসি স্কোয়ারে একবার হারিয়ে গেলে গনগনে আগুনে
পারব না ফিরে যেতে পুরোনো চেনা-গন্তব্য।

জ্বলছে কোলকাতা, ট্রামগুলো কী-রকম অসম্ভব হলুদ
মধ্য-চৈত্রের তরমুজ লজ্জা দিচ্ছে মিছিলের
লাল শালুকে, পাতালে হলুদ রঙ, মৃত্তিকাও
—মেট্রো একাকার

জ্বলছে কোলকাতা জ্বলছে সুভাষ বসুর প্রস্তরীভূত দেহ—
ফিরলে না তুমি হায়, কোলকাতার, হে নেতা
তোমার কোলকাতা স্বপ্নময় মানুষদের করেছে স্বপ্নহীন!

বাংলাদেশ

মায়ের বাপের বাড়ি

সুকুমার চৌধুরী

শৈশব থেকে জ্যোৎস্নারা এসেছিল দলবেঁধে
পঁচিশ বছর বাদে তাদের থৈ-থৈ নাচে
ইন্দ্রবিলে থেমেছিল ভিনদেশী ট্রেন
জংলাফুলের গন্ধ, হাসি ও আবির নিয়ে
এসেছিল ভালোবাসা···হাওয়া
ধানখেত লুটিয়ে পড়ছিল আমাদের পায়ের পাতায়
আর আলপথ ধরে কিশোরী মেয়ের মতো
ছুটে যেতে-যেতে
একসময় মা বলেছিলেন : ওই ছাখ শিবতলা,
মণ্ডপে প্রদীপ জ্বলে, তালবন, জোনাকির মালা
ওই দিকে তালাজুড়ি, ওইখানে···

মার মুখে জ্যোৎস্না নয়, ধ্রুবতারার আলো
খেলা করছিল, আর
বর্ষার মতো ছুচোখে ঝাঁপিয়ে নামছিল
স্মৃতি···সুখ···সমূহ আবেগ

নিসর্গ-পথিক

পরিমল চক্রবর্তী

উত্তুরে হাওয়াও যখন তাকে ফিরিয়ে দিল,
তখনও সে দক্ষিণে গেল না—
সে কেবল নৈঋত কোণের দিকে এগোতে থাকল।
সেখানে ঝড়ের সংকেত ছিল, ছিল ঝঞ্ঝার তাণ্ডব ;
একটা বিপুল বাত্যাবহের সম্ভাবনায়
সেদিকের স্বর্গ-মর্ত্য-চরাচর
বিস্ফারিত চক্ষু মেলে রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গুনছিল ;
আর, গর্ভিণী-প্রকৃতি যেন ঋতুবদলের প্রসবব্যথাকে
আপন অস্তিত্ব থেকে নিংড়ে-নিংড়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

অথচ তবুও সে বিরত হল না,
বিরতি নামল না তার অবিরাম অবিশ্রাম পথিকবৃত্তিতে
পথের গেরুয়া ধুলো, গেরুয়া ধুলোর পথ,
অদৃশ্য মায়ায় বেঁধে তাকে নিয়ে কেবলই ঘুরতে থাকল
এদিকে-ওদিকে, এপাশে-ওপাশে, এখানে-সেখানে।
উঁচুনীচু, ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো মাটি—
রুক্ষ কাঁকরস্তূপ, খোয়াইয়ের অসমবিস্তার—
আর দূরে, বহু দূরে···যেন দিক্‌চক্রবালরেখাকে ডিঙিয়ে
ঊর্মিল জলের ঢল
(কিশোরী মেয়ের মতো ব্যাকুল, চঞ্চল) ;
কাশবন, ঝাউবন, সপ্তপর্ণী বন,
আম-জাম-কাঁঠালের পল্লবের ছায়া,
আর মায়া···ঘন মায়া···অবগাঢ় মায়া
তার তৃষিত ছুচোখের সামনে
যেন ছুঃখিনী মায়ের জীর্ণ শাড়ির শীর্ণ আঁচল বিছিয়ে দিল।

তাই,
আর কোনোদিকে না গিয়ে
সে কেবল নিসর্গের দিকেই এগোতে থাকল॥

সেতার

প্রবীরকুমার রায়

উঠল বেজে মৃদু স্বর সেতারের।
বাজল তা মনের কানে।
নির্জন এই জলাতে বাজল সে একাকী।
বিস্মিত আমি শিশুর মতো
শুনি সে স্বর—
বেড়ে চলে লয়, তবলার বোল-বিস্তার।
হল সে জলা নিমেষেই ঢেউ-গতি,
সেখানে ফিসফিসানি
গোলাপের আর দোলে গোধূলি
ছড়ার ঘোরে শিশুর দোলনাতে!

তোমার উদ্ভাসন—
যেন ফোটে
সহাস নিবিড় মুখে
একটা গোটা চাঁদ জলজ রঙে।···
আর, ঝরে সেই সাথে
নরম-আঙুল-ছোঁয়া তোমার সে বারি।

সোনার টুকরো

গৌরী দেশপাণ্ডে

মারাঠি থেকে অনুবাদ বীণা আলাসে

অনেকদিন আগে আমার বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। রাজা নাম ছিল তার। (অনেকের বাড়িতেই তো 'রাজা' নামের একটা-না-একটা কুকুর থাকেই, তেমনি আর কী।) ওকে যে একদম বাচ্চা অবস্থায় আমাদের বাড়িতে আনা হয়েছিল তা নয়, এক বছর বয়স হওয়ার পরে ওর পাগলামি দেখে ওর মালিক ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। আমাদের ডাকতার ওকে বাড়ি নিয়ে যান এবং চিকিৎসা করে ভালো করে তোলেন। (এই ডাকতার মানুষের চেয়ে কুকুরের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন।) উনি ভাবতেন যে যারা কুকুরকে ছেড়ে দেয় তারা ভীষণ নিষ্ঠুর এবং নীচ। তাই উনি কুকুরটাকে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে না দিয়ে আমাদের দিয়ে দেন। আমরা যে নীচ এবং নিষ্ঠুর নই সেজন্য নয়, আমরা কুকুর ভালোবাসতাম, তাই। এই কুকুরটার লেজ কেটে শুধু দু-তিন ইঞ্চি বাকি রাখা হয়েছিল। "রাজা" বললেই ও সেই ছোট্ট লেজটা খুব জোরে-জোরে নাড়ত। আমার একটা ভাই তো ওকে দেখলেই 'রাজা, নাড়াও' বলত। বড়ো হওয়ার পর আমি এইরকম ছোট্ট লেজের কুকুর অনেক দেখলাম। কিন্তু রাজাই প্রথম।

ও বড়ো বয়সে আমাদের বাড়িতে আসার দরুন আমাদের খুব একটা ভালোটালো বাসত না। ও বোধহয় আমাদের শুধু খেতে দেওয়ার লোক, ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার লোক বা বর্ষাকালের আশ্রয়দাতা—এমনই কিছু ভাবত। ডাকপিয়নদের কামড়াত এবং সামনের উঠোনে বসে আশেপাশের অন্য-সব কুকুরদের ওপর দাদাগিরি ফলাত। ওর এই উদ্ধত এবং বেপরোয়া ভাবটা আমাদের খুব ভালো লাগত। আমরা সবাই এক-এক করে ওর সঙ্গে ছবি তুলেছিলাম। প্রায় সব ফটোতেই ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আছে। এবং আমরাই নাছোড়বান্দার মতো ওর গলায় পিঠে হাত-টাত দিয়ে আছি। ও খুব উঁচু জাতের কুকুর ছিল না। তবু আমরা ওকে "ওয়ার হেয়ারড্ টেরিয়র" বলতাম। আমার এক বন্ধু বলত

ওটা কি কোন কুকুর হল? কুকুর রাখতে হলে এমন কুকুর রাখবে যাকে কুকুর বলতেও কেউ সাহস পাবে না, কিন্তু রাজার ডাক এতই জোরালো আর দাপুটে ছিল যে কেউ ওকে কুকুর বলতে সাহস করত না। ও বসে-বসে শুধু 'ভৌ' করলেই গেট খুলে ভেতরে আসার সাহস থাকত না কারো। ও মরে যাওয়ার পরেও কয়েক মাস বাইরের গেট থেকে জিজ্ঞাসা করত, 'মালীদা, কুকুরটা বাঁধা আছে তো?' খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও ওর ভীষণ মেজাজ ছিল। রুটিতে দুধ দিতে হত। ডাল দিলে ছুঁতও না। আর হাড় দিলে পায়ের হাড় ছাড়া চলত না। বাসি পাঁউরুটিও খেত না।

আমাদের বাড়িতে ও একটুখানি পাস্তা দিত আমাদের রান্নার মাসিকে। মাসি রোজ দুপুরবেলায় হাতে দুটো আটার রুটি নিয়ে ছোটো-ছোটো টুকরো করে ওর সামনে রাখতেন। ওঁকে দেখলেই রাজা ছোট্ট ল্যাজটা নাড়তে-নাড়তে থালার সামনে এসে বসত। মাসি আগে থালাভরতি করে দুধ ঢেলে দিতেন, তারপর এক-এক টুকরো করে রুটি দুধে ফেলতেন। আর ও ব্যাটা বাজীরাওয়ের মতো বসে খেত।

তারপর ও খুব বুড়ো হয়। সমস্ত দাঁত পড়ে যায়। আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম যে ও এবার মরে যাবে। শেষের দিকে ও খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। (ততদিনে আমরা ছেলেমেয়েরা সবাই বেশ বড়ো হয়ে গিয়েছিলাম। কুকুরের আয়ু মানুষের আয়ুর চেয়ে কমই হয়, ও আমাদের আগেই মরবে—এসব ফিলোজফিক্যাল আলাপ-আলোচনা করতাম আমরা। এবং এ-সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে কিছুই না—এমন একটা ভান করতাম।)

একদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে মাসি একহাতে দুধের বাটি আর এক হাতে রুটি নিয়ে ওর দিকে যেতেই আমরাও একটু গিলটিলি ওঁর পেছন-পেছন গেলাম। রাজা বেচারা ছোট্ট লেজটা নাড়ল কিন্তু উঠে দাঁড়ানো ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল। আজ মাসি ওর সামনে বসে পড়লেন এবং একটা ছোট্ট রুটির টুকরো দুধে ভিজিয়ে নিয়ে ওর মুখের সামনে ধরে বললেন, 'খা রে রাজা, সোনার টুকরো আমার, খা বাবা।' ও খুব চেষ্টা করে মুখ তুলে ওই টুকরোটুকু গেল। কিন্তু তার বেশি পারল না। সেই রাত্রেই ও মারা যায়।

আমার বড়ো মেয়েকে আমি সোনার টুকরো বলি। ওযদি 'কেন?' জিজ্ঞাসা করে কী বলব বলুন? ওকে যে খুব সাদাসাদি করেও খাওয়ানো যায় না, তাই বলব? বা মাকে ও শুধু খাওয়ানোর লোক, চুল ধুয়ে দেওয়ার লোক, নতুন জামাকাপড় কিনে দেওয়ার লোক, বা মাঝে-মাঝে খিটখিট-করা মেশিন ভাবে,—তাই বলব? কিন্তু আমার মেয়ের আমার প্রতি ধারণা ঠিক রাজার মতো। মাঝে-মাঝে হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে, ঠিক যেমন রাজা মাঝে-মাঝে আমাদের দেখে লেজ নাড়ত, তেমনি। এসবের জন্যই যে সে সোনার টুকরো। কিন্তু ওকে কী বলব? (আমার মায়ের মণি ডাকের মতন। ওঁর সমস্ত নাতনিদের উনি মণি বলেই ডাকতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন,—আর এই বয়সে সবার নাম মনে থাকে না আমার। 'মণি' বললে সবাই আসে, খুঁজে নিই যাকে চাই। মণি মানেই নাতনি, মণি মানেই সাধের, মণি মানেই দুরন্ত। কিন্তু মণি মানেই আমার মায়ের মনের একটা বিশিষ্ট অবস্থা—কিছুটা ক্লান্ত, কিছুটা রেজাইও, কিছুটা স্নেহপ্রার্থী।)

এই প্রথম রাজা থেকে আরম্ভ করে পর-পর এমনি অনেক সোনার টুকরো এসে গেছে আমার জীবনে। ওদের সঙ্গে আমার বনে। ওদের দাদাগিরি আমি মানি, দাপটে ভয় পাই, একটু-একটু প্রতিবাদও করি, তাদের জন্য অনেক মনস্তাপ আর যন্ত্রণাও পাই। আমরা না চাইলেও তো শুরু থেকেই যে-কোনো সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার একটা আশঙ্কা আমাদের মনে লুকিয়ে থাকেই। আর ঠিক তেমনি আমরা সবাই আলাদা-আলাদা বলে সম্পর্ক ভেঙে যায়। ভেঙে

যাওয়ার পরও মনে থেকে যায় অনেক অশান্তি আর 'সেল্‌ফ ডাউট'।

এই-সমস্ত রুটিনে বিরক্ত হয়ে আমি মনে-মনে ঠিক করলাম যে এবার এমন একজনের প্রেমে পড়ব যে হবে খুব শান্তশিষ্ট, যে আমাকে খুব ভক্তি করবে এবং আমার সমস্ত কথাই শুনবে। এমন অনেক লোকই তো থাকে। তাই আমিও এমন ভেবে নেওয়ার পর খুব শিগগিরি আমার যাওয়া-আসার পথেই এমন একজনকে পেয়ে গেলাম। ও যখন জানতে পারল যে আমার মা আমাকে আদর করে 'মণি' বলে ডাকত তখন ও আমাকে 'মণি' বলে ডাকতে লাগল। আমার মনে মায়ের অভাবটা ভরতে চেয়েছিল কিনা কে জানে—কিন্তু আমি ওর মুখে ওই ডাক শুনে বেশ বিরক্ত হতাম। ওর সমস্ত আচরণ আমার পছন্দমতো। আর ও সেটা করতে না করতেই আমার সে পছন্দগুলো আর 'পছন্দ' থাকত না। একবার আমি একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম। আমি হঠাৎ বলে বসেছিলাম, পুরুষমানুষ নীলরঙের জামা পরলে আমার একদম ভালো লাগে না। দেখি সেদিন থেকেই ও নিজের সমস্ত নীল জামা তুলে রেখে দিয়েছে। আমি এতই বিরক্ত হলাম যে ওর জন্মদিনে ওকে একটা নীল জামা কিনে দিলাম। ও বেচারা তো অবাক। এমনি অনেক কিছুই ঘটে গেছে। সে বেচারা আর আমার অত্যাচার সহ্য করতে পারল না। যেমন করে হোক নিজেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে গেল। অনেকদিন পরে একবার দেখা করতে এল, তখন আমি টেবিলের কাছে ঝুঁকে কিছু একটা লিখছিলাম, অন্যদিকে বড়ো মেয়ে অঙ্ক কষছিল। শুরুতে দু-চার কথা হল। পরস্পরের ভালোমন্দ খবরাখবর জানা হল। কফি খাওয়ার পর হঠাৎ ও বলে উঠল—'তোমাকে আমি বুঝতেই পারি না, তুমি কী চাও? আসলে তোমার কী দরকার? নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে শুধু নিজের খেয়ালমতো, ভীষণ স্বার্থপরভাবে তুমি বিশ্বের সঙ্গে একটুখানি সম্পর্ক রাখ। যখন নিজে চাও তখন একটু হাত বাড়িয়ে সেটা কেড়ে নাও। অন্যথা একটুও পাত্তা দাও না। অন্যের কথা একটুও ভাব না। আমি চাই বলে তুমি নিজেকে একটুও পালটাবে না। আমি চাই বলে একটু সরে নিজের জায়গা করে দেবে না। আশ্চর্য লাগে! কী যে বলব তোমায়—'

বড়ো মেয়ে হঠাৎ হেসে উঠে বললে, "সোনার টুকরো।"

লেখিকা প্রসঙ্গে

গৌরী দেশপাণ্ডে মারাঠি সাহিত্যের এক খ্যাতনামা গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক। তিনি প্রয়াত লেখিকা ইরাবতী করবের কন্যা। তাঁর "এক এক পান গলাওয়া", "তেরুণ" ইত্যাদি উপন্যাস আলোচকদের দ্বারা বহু আলোচিত এবং পাঠকমণ্ডলী-দ্বারা সমাদৃত।

গৌরী দেশপাণ্ডে একজন বুদ্ধিমতী, সমাজসচেতন লেখিকা। তাঁকে ঠিক "ফেমিনিস্ট" বলা ঠিক হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে এক ধরনের সূক্ষ্ম নারীত্ববোধ (ফেমিনিন সেন্‌সিবিলিটি) দেখা যায়। আধুনিক যুগে মহিলাদের জীবনের সমস্ত জটিলতা তিনি এমন সহজ অথচ সঠিকভাবে প্রকাশ করেন যে বিস্মিত হতে হয়। এ ব্যাপারে তিনি যে নিজস্ব স্টাইল গড়ে তুলেছেন সেটাও অদ্ভুত—যাতে ভাবসমৃদ্ধতা থাকলেও ভাবালুতা একদম নেই। দারুণ জটিলতার সঙ্গে মর্মগ্রাহী রসবোধ মিশিয়ে দেওয়া ওঁর সৃষ্টির এক লক্ষণীয় বিষয়। "সোনার টুকরো" গল্প তাঁর "আহে হে অস্ আহে" গল্পসংগ্রহের মধ্যে সমাবিষ্ট।

—অনুবাদিকা

শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশ : পদে-পদে বাধা

কামাল হোসেন

"ব্যক্তিত্ব" শব্দটি এত বিচিত্র অর্থে আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়, মাঝে-মাঝে ভাবতে গেলে রীতিমতো অবাক হতে হয় : সত্যি-সত্যি ব্যক্তিত্ব বলতে আমাদের নিজস্ব ধারণাগুলির মধ্যে এত বৈপরীত্য নিয়ে কী ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব ব্যক্তির অস্তিত্ব-নির্ভর এই মোহময় শব্দটির যথার্থ সংজ্ঞা ?

হয়তো খুব বেশিমাত্রায় সরলীকরণের পথ না ধরেও বলা যায়, ব্যক্তির চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে ব্যক্তিত্বের রহস্যময় অভিধায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-মানুষের আইডেনটিফিকেশনের প্রশ্নটিই বোধহয় প্রধানতম সুর হিসেবে ধ্বনিত হয় ব্যক্তিত্বের বর্ণময় ব্যঞ্জনায়। চারপাশের পরিবেশ এবং নৃতাত্ত্বিক আবহ-মণ্ডলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মধ্যেও নিহিত থাকে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তির সামগ্রিকতার কাঠামোয় প্রকাশ পায় ব্যক্তিত্বের সুদূরপ্রসারী আকর্ষণের জোয়ার-ভাঁটা।

এবং এটা ভাবার প্রয়োজন নেই যে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা আবিষ্কারের চেষ্টা খুব আধুনিক কিছু ব্যাপার। মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকেই পারস্পরিক আইডেনটিটি নির্বাচনের মৌলিক প্রেরণা থেকেই ব্যক্তিত্বের চারিত্র-বৈশিষ্ট্য সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। এখন এই নির্বাচনের প্রক্রিয়া প্রথমটা গোষ্ঠীগত, না ব্যক্তিগত, তা এখন নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সিজারের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তের ওপারে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর নানাবিধ চারিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং জীবনধারার বৈচিত্র্যের লক্ষণ-গুলি নিয়ে রোমানরা মাথা ঘামাত। ১৬০০ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে দেখা গেছে প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত ধ্যানধারণার আলোকে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা স্থাপনের প্রবণতা। উনিশ শতকের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথের লেখায় মানুষের ব্যক্তিত্বের দার্শনিক বাতাবরণ নিয়ে রীতিমতো তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা লক্ষ করি। স্মিথের সেই বিখ্যাত থিয়োরি 'মানুষ-মাত্রেই অর্থনীতিনির্ভর প্রাণী' (economic man) ঘোষণা করার প্রাথমিক পর্বে ব্যক্তিত্বের নানাবিধ গুণ আর দোষ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়েছিল।

বস্তুত, ব্যক্তিত্ব বলতে যে সম্পূর্ণ মানুষের ছবিটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের। সেই মুহূর্তে আমাদের হিসেবে ভুল হয়ে যায় ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি করার বাসনায়। আমাদের মনে থাকে না—একটি মানুষ আকাশ থেকে সরাসরি কোনো মায়ামন্ত্রবলে পূর্ণ মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে না। প্রতিটি মানুষের থাকে একটি অমল পুণ্যময় ছেলেবেলা। মাতৃ-জঠরের চিরন্তন আঁধার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শৈশবের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের জীবনে। নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা, চারপাশের পরিবেশ এবং মানুষের ব্যবহার, অনুভূতির দ্বন্দ্বময় আদান-প্রদান, এবং সর্বোপরি দেহের অভ্যন্তরে নিত্য-পরিবর্তনশীল প্রাণ-রাসায়নিক এবং হরমোনের ক্রিয়া-কলাপ ধাপে-ধাপে বিকশিত করে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব। দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে এই ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের পর্ব কোনো অংশেই কম রোমাঞ্চ-কর নয় কুঁড়ি থেকে একটি ফুল ফোটার সৌন্দর্য বিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার তুলনায়।

আর তাই পৃথিবী জুড়ে মনোবিজ্ঞানীরা আজ মাথা ঘামাচ্ছেন শিশু-ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে-পথে নানাবিধ বাধাবিপত্তিগুলি নিয়ে। একটি সুন্দর শৈশবের ভিত্তি থেকেই তো আমরা আশা করতে পারি সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রকাশ। ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আবিষ্কারের মূল চাবিকাঠিও তো আসলে লুকোনো রয়েছে শৈশবের মণিকোঠায়।

শৈশব নিয়ে ভাবনা

একটি শিশুর জন্মের পর তার শৈশবের প্রতিটি পদ-ক্ষেপের জন্য মা-বাবার অগ্রিম প্রস্তুতি, পরিবারে আর সামাজিক জীবনে শিশুর স্থান এবং ভূমিকা, তাদের প্রতি বড়োদের ব্যবহারের রূপপ্রকৃতি, এমন-কি শৈশবকালের প্রকৃত সংজ্ঞা কী হওয়া উচিত—এসব ব্যাপারে ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম ধ্যানধারণার তথ্য দেখতে পাওয়া যায়। দেশে-দেশে বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোতেও নানারকম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তো একটি প্রধান সমস্যা।

শিশুকে বড়ো করে তোলার সঙ্গে বিভিন্ন সমাজের নিজস্ব বিশ্বাস, প্রয়োজন, অভ্যাস, চাহিদা এবং মূল্যবোধের সম্পর্ক অস্বীকার না করেও প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মারগারেট মীডের অনুসরণ করে বলা যায় : সব সমাজেই শিশুরা সব সময় অসহায়। তাদের দৈহিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর তাগিদ সব ক্ষেত্রেই এক। যে সমাজেই জন্ম হোক, একজন শিশুকে ধাপে-ধাপে ঠিকই শিখতে হয় নিজের হাতে খাবার খেতে, হাঁটতে, কথা বলতে, ছেলে বা মেয়ে হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে, বয়স এবং যৌন-পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যবহার করতে, ধীরে-ধীরে বড়ো হয়ে বয়স্কদের ভূমিকায় প্রবেশ করতে। এত কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও পার্থক্যগুলি তৈরি হয় —কী ভাবে তাদের বড়ো করা হচ্ছে, বাবা-মা কী ভাবে তাদের পরিচালিত করছেন, এবং অবশ্যই পারি-পার্শ্বিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের অবশ্যম্ভাবী প্রভাব কী ভাবে তাদের নিয়ন্ত্রিত করছে—সেসব জটিল ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ওপর।

ভাবলে অবাক লাগে, শিশুর শৈশবকেও একদা স্বীকার করা হত না। তখন ভাবা হত, শিশু মানে "মিনিয়েচার বয়স্ক"। পনেরো শতকের ইউরোপে বিভিন্ন 'পেইনটিং'-এ দেখা যায়, শিশুদের আঁকা হয়েছে বড়োদের মিনি সংস্করণ হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে শিল্পী পিয়েরো ডেলা ফ্রানসেসকার আঁকা 'ভারজিন অ্যানড চাইলড উইথ টু অ্যানজেলস'

লেখক পেশায় মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগচিকিৎসক। কবিতা, গল্প ও উপন্যাস রচনায় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

বিজ্ঞানীরাও রীতিমতো চিন্তিত। মনোবিজ্ঞানী স্পোক এ সম্পর্কে বেশ সুন্দরভাবে বলেছেন, মা-বাবাকে অনুসরণ করতে হবে 'Play-it-by-car' পদ্ধতি। খুব কঠিন হলেও মা-বাবাদের গ্রহণ করতে হবে ভার-সাম্য রক্ষা করার একটি কঠিন পদ্ধতি। ভালোবাসার সঙ্গে থাকবে শাসন। বন্ধুত্বের সঙ্গে কর্তৃত্ব। স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ। বস্তুত, বাবা-মাকে কিছু কর্তৃত্ব সব সময় হাতে রাখতে হবে। মাঝে-মধ্যে প্রয়োজনমতো বকুনি দিলে শাসন করলে শিশুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না। বাবা-মা তো সব সময় শিশুর মঙ্গল চাইবেন। সেজন্য শিশুর সঙ্গে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃত চালচিত্র কেমন দাঁড়াচ্ছে, তার জন্য মাঝে-মাঝেই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। শৈশবকে প্রভাবিত করার জন্য অবশ্য আরো অনেক কারণ রয়েছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের বিভিন্ন আলোচনার পর্বে-পর্বে আমরা সেসব সমস্যার মুখোমুখি হব।

ব্যক্তিত্বের বিকাশ : কয়েকটি মতবাদ

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বুঝতে গেলে আমাদের সেইসব মতবাদের সাহায্য নিতে হবে, যেগুলি প্রধানত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে ব্যক্তির নিজস্ব কর্মদক্ষতার সীমানা, তার বৃদ্ধি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অবশ্যই ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করার নানাবিধ পদ্ধতি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ধাপে-ধাপে নানা জনে নানারকম তথ্য, যুক্তি, বিশ্লেষণের পাহাড় সাজিয়েছেন, আমরা এই স্বল্প-পরিসরে কিছুটা আভাস গ্রহণের চেষ্টা করব, কী ভাবে শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে প্রতিবেশ ও প্রতিবেশী সাহায্য করে থাকে, মা-বাবার ভূমিকাই বা কতখানি, সামাজিক জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির প্রভাবও কতখানি সৃষ্টিশীল।

প্লেটো তাঁর "রিপাবলিক" গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। 'আত্মা'র তিনটি অংশ তিনি চিহ্নিত করেছিলেন, আজকের দিনের ভাষায় যাদের আমরা বলি বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তি। ব্যক্তিত্বের এই তিনটি অংশকে তিনি কয়েকটি ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করেন, যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে একজন চালক। এই চালক হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। ঘোড়াগুলি হচ্ছে অনুভূতি আর ইচ্ছাশক্তি। ব্যক্তিত্বের কর্মতৎপরতার পেছনে তারা সর্বদা শক্তি যোগায়। ব্যক্তির বিকাশের গতিপথ নির্দেশ করে বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণক্ষমতা।

ব্যক্তিত্বের কাঠামো নির্ধারণে ফ্রয়েডের মতবাদকে নানা দিক দিয়ে যুগান্তকারী বলে মনে করা হয়। ফ্রয়েড মনে করতেন মানুষ এমন একটি প্রাণী, যার মধ্যে জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজ ও নীতিগত ব্যাপার-স্যাপার সবকিছু একসঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। দেহ আছে, সুতরাং প্রাণীর জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনগুলিকে পূর্ণ করা প্রয়োজন। মন আছে, সুতরাং আত্মসচেতনতা আছে, আর তাই দেহ আর সমাজের প্রয়োজনগুলির মধ্যে তাকে সব সময় একটা ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। তাকে শিখতে হয় কী ভাবে পৃথিবীর অন্য সব মানুষ আর বস্তুর সঙ্গে বাস্তববোধের সাহায্যে খাপ খাইয়ে চলতে হয়। সামাজিক ও নৈতিক প্রাণী হিসেবে মনের মধ্যে বিবেক নামক একজন প্রহরীর সৃষ্টি করতে হয়। সামাজিক আদর্শগুলিকেও গ্রহণ করতে হয়। এ-ভাবেই ফ্রয়েড ব্যক্তিত্বের কাঠামোকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন : ইদ, ইগো, সুপার-ইগো। বস্তুত মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের কোনো পার্থিব পরীক্ষায় এ তিনটি সত্তার হদিশ মিলবে না, বিজ্ঞানের পরিভাষায় এগুলি নিছক হাইপোথেটিক্যাল কনস্ট্রাক্টস্ (hypothetical constructs)।

ফ্রয়েড বলেন, জন্মের সময় থেকেই ইদের আবির্ভাব। শিশু-ব্যক্তিত্বের সমগ্র চালনা-শক্তির দায়িত্ব নেয় ইদ। তারপর প্রথম বছরের মধ্যে গঠিত হয় ইগো এবং সুপার-ইগো। ইদ এবং সুপার-ইগো কিন্তু একে-বারেই অবচেতন স্তরের আড়াল থেকে ব্যক্তির

ছবিটির কথা বলা যায়। অনেক কাল ধরে ভাবা হত শিশুরা দৈহিক দিক দিয়ে দুর্বল, কোনো জ্ঞানবুদ্ধি নেই, কথা বলার বা বক্তব্য রাখার যোগ্যতা নেই, যৌন পরিচয় নেই। তাদের একমাত্র কাজ বয়স্কদের হুকুম তামিল করা। চিরকালই দেখা গেছে, অধিকাংশ বাবা-মা শিশুপালন সম্পর্কে বোঝেন কতখানি নিয়ম-শৃঙ্খলার বেড়াজাল আরোপ করা যায় খুদে মানবটির চারপাশে। চরিত্রগঠনের জন্য শাসন এবং শাস্তি-প্রদানের আসুরিক পদ্ধতিটিই তাঁদের বেশি পছন্দ। এ শতাব্দীতেও বিশ আর তিরিশের দশকের ইউরোপে শিশুলালন বিষয়ে বিভিন্ন বইপত্তরেও এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া থাকত। "বাধ্য ছেলে" বানানোর জন্য ছিল নিদারুণ চেষ্টা। জে. বি. ওয়াটসনের মতো খ্যাতনামা বিহেভিয়ারিসটও ছিলেন শৈশবে চরিত্র-গঠনশিক্ষার এক প্রধান প্রচারক। এ শতাব্দীর প্রথম দিকের চল্লিশ বছর ধরে ছিল তাঁর চিন্তাভাবনার প্রভাব। ওয়াটসনের ধারণা ছিল—শৈশবের এই বাধ্যতামূলক শিক্ষণপদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব। যীশুর অনুগামীরা যেহেতু মনে করেন শিশু আদি-পাপের ফলাফল, সুতরাং তাঁরাও ছিলেন শৈশবের প্রাথমিক স্তরে যথাযথ শিক্ষা দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব গঠনের সমর্থক। অবশ্য ১৯২৭ সালেই সুশান আইজাক ওয়াটসনের চিন্তাধারা থেকে কিছুটা সরে এসে বলেছিলেন, বাচ্চাদের পেচ্ছাব-পায়খানা ঠিক-মতো করার ট্রেনিং দেওয়া নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তা যথাযথ ধৈর্য আর সহানুভূতির সঙ্গে। বস্তুত এসব দৈহিক ক্রিয়াকলাপগুলি যে খুব অন্যায়ের কিছু নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, এ ব্যাপারে তাদের নিশ্চিন্ত করতে হবে। এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও ব্যাপ্তি পেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পর। নোংরা, হাড়বজ্জাত, চিল-চেঁচানো শিশু স্বীকৃতি পেল ভালোমানুষ, মিষ্টি, অপাপবিদ্ধ পবিত্র অস্তিত্ব হিসেবে।

ওদিকে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ততদিনে আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর শিশুর 'সাইকোসেকসুয়াল ডেভালপমেনটে'র বিপুল তত্ত্ব। শিশুর সামাজিক ও অনুভূতির বিকাশের ক্ষেত্রেও ফ্রয়েড এনে দিলেন নানাবিধ তথ্য। এ প্রসঙ্গে পরে কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

সমস্যা দাঁড়াচ্ছে : শিশুর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন বাবা-মা? ইদানীংকালে শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশে নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কেউ-কেউ একটি শব্দ খুব উচ্চারণ করছেন—"ফান ম্যারালিটি"। "আমেরিকান চাইলড ট্রেনিং লিটারেচার"-এ একজন প্রসঙ্গত মন্তব্য করেছেন, 'Parents are promised that having children will keep them together, keep them young and give them fun and happiness.'

এদের মত অনুযায়ী, বাবা-মা বন্ধুর মতো মেলা-মেশা করবেন শিশুর সঙ্গে। খেলা করবেন, হৈ-চৈ করবেন। কিন্তু এতেও সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হচ্ছে, তা বলা যায় না। এভাবে শিশুর মধ্যে এক ধরনের স্বাধীনতাবোধের জন্ম নেয়, ফলে বাবা-মা বিপদে পড়েন, যখন দেখেন ভালো-মন্দ কোনো কথাকেই আর গ্রাহ্য করছে না ছোট্ট খোকাবাবু। রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে হরেক রকম বজ্জাতি করার জন্য দৌড়ুচ্ছে।

স্বভাবতই সমস্যাটা দাঁড়াচ্ছে, বাবা-মার ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত? শিশুর বন্ধু এবং সমান-সমান, না তার প্রভু? আমরা নিশ্চয়ই চাইব না বাবা-মা আগের দিনের স্বৈরতান্ত্রিক মেজাজে ফিরে যান। কিন্তু ছেলের সঙ্গে আমোদ-ফূর্তি করতে গিয়ে অতিরিক্ত আদর দিয়ে তাকে বাঁদর বানানো নিশ্চয়ই আমাদের কাম্য নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, শিশুকে কী ভাবে সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের স্বীকৃত মাপকাঠিতে পূর্ণ দায়িত্ববীল পরিণত ব্যক্তিত্বে পরিণত করা যায়, এ সমস্যার তীব্রতা নিয়ে আধুনিক বাবা-মার সঙ্গে মনো-

ব্যবহারকে প্রভাবিত করে। তার মানে তাদের চালনাশক্তির প্রভাবে ব্যক্তিত্বের গঠন, ব্যবহার অনেকখানিই নিয়ন্ত্রিত হলেও সচেতনভাবে ব্যক্তি একেবারেই টের পায় না ব্যাপারটা। সজ্ঞান অবস্থায় একমাত্র ইগো খোলাখুলি প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে ব্যক্তির ব্যবহার ও অভিব্যক্তি প্রকাশের ওপর। যদিও সব সময় তা পুরোপুরি কার্যকরী হয় না।

ফ্রয়েড মনে করতেন, জৈবিক প্রাণী হিসেবে মানুষের সামাজিক ও মানসিক আত্মসচেতনতা সৃষ্টির পেছনে থাকে চারপাশের পরিবেশ থেকে তার দৈহিক প্রয়োজন কী ভাবে মিটছে না মিটছে তার গতি-প্রকৃতির ওপর। একটি ছোট্ট শিশু তার দৈহিক প্রয়োজনগুলি ছাড়া আর কিছু বোঝে না। বস্তুত তার নিজের সঙ্গে সে খুব সহজে চারপাশের পৃথিবীর মধ্যে কোন পার্থক্যও অনুভব করতে পারে না। এ সময় তার ব্যক্তিত্বকে ফ্রয়েড বর্ণনা করেছেন 'হোমিওস্টাটিক অরগ্যানিজমে'র (Homeostatic organism) সঙ্গে। এসময় তার জীবনধারণের একমাত্র লক্ষ্য থাকে একটি উত্তেজনাহীন তৃপ্তিদায়ক অবস্থার মধ্যে বাস করা। বস্তুত, খিদে পেলে বা তৃষ্ণা পেলে শিশু অসহায়ভাবে শুধু কান্নাকাটি করতে পারে। মুখের কাছে খাদ্য পানীয় পেলেই তার উদ্বেগের অবসান। ফ্রয়েডের মতানুযায়ী শিশুর প্রথম মানসিক গঠনে শুরু হয় এই উদ্বেগ-উত্তেজনা উপশমের জন্য ফ্যানটাসি বা কল্পনা-শক্তির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। এই কল্পনার সাময়িক আশ্রয় তাকে আনন্দ দেয়। ব্যক্তিত্ব গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে চিন্তাশক্তি ও সমস্যা-সমাধান করার ক্ষমতা অর্জনের পরবর্তী ধাপ। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ সবকিছুতে পূর্ণ তৃপ্তি খোঁজে, শুধুমাত্র কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সে খুশি হতে পারে না। এই পর্যায়ে শিশু বাস্তবতার সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে চায়। ধীরে-ধীরে বাস্তব পৃথিবীর সবকিছু স্পর্শ করে দেখবার আকাঙ্ক্ষা গড়ে ওঠে। ইগোর জন্ম হয়। বস্তুত, বাস্তব আর অবাস্তবের এই টানাপোড়েনে মানবশিশু আমৃত্যু পথ হেঁটে চলে। কল্পনা আর স্বপ্নও তার জীবনে একটি বড়ো অংশে সবসময় সঙ্গী হয়ে থাকে।

সুপার-ইগোর জন্ম ইগো বা অহং থেকে। ব্যক্তিত্বের সামাজিক এবং শুভবুদ্ধির নৈতিকতা বিচার করার দায়িত্ব সুপার-ইগোর। সহজ বাঙলায় তার পরিচয় হচ্ছে বিবেক। শৈশব থেকে অভিভাবক এবং সমাজ যে নীতিশিক্ষা দেয়, সেই পথেই ব্যক্তিমানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সুপার-ইগো। প্রয়োজনবোধে শাস্তি দেয় বা অপরাধবোধ সৃষ্টি করে ব্যক্তির মধ্যে।

আসলে ইদ হচ্ছে আদিম কামনা-বাসনা-ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক চাহিদা প্রকাশের প্রতীক। সে বাস্তবতা মানতে চায় না। যে ভাবেই হোক ইচ্ছে পূরণটাই বড়ো কথা। শৈশব থেকে আমৃত্যু অবচেতনে বাস করে তার অস্তিত্ব জানায়।

এই তিনটি স্তরের পারস্পরিক সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এবং তা নির্ভর করে কী ভাবে বাস্তবে এবং কল্পনায় চারপাশের মানুষজন আর পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে শিশু। আর কী ভাবে জীবনের প্রথম পাঁচটি বছরে 'সাইকো-সেকসুয়াল ডেভালপমেনটে'র মাইল-ফলকগুলি সে পেরিয়ে আসছে।

সাইকোসেকসুয়াল ডেভালপমেনট

ফ্রয়েড থেকে শুরু করে "নিও-ফ্রয়েডিয়ান" মনোবিজ্ঞানী সকলেই শিশুর মানসিক বৃদ্ধির ধাপে-ধাপে যৌন-চেতনার প্রভাব এবং বিবর্তনের ওপর নানাভাবে জোর দিয়েছেন। বিশেষ করে সম্প্রতিকালে এরিক এরিকসন পর্যন্ত বহু মনোবিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে অনেক নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন।

ফ্রয়েডের বক্তব্য ছিল : ব্যক্তিত্বের বিকাশ বুঝতে গেলে আপনাকে কল্পনা করে নিতে হবে কী ভাবে একজন মানুষ তার ভেতরকার এক শক্তির প্রভাবে বাইরের জগতে তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করে আনন্দ অনুভব করছে। অন্যভাবে বললে, বাইরের জগতের দাবি মেটানোর তাগিদেই মানুষকে এভাবে নিজেকে গড়ে নিতে হয়। ফ্রয়েডের মতে, জন্ম থেকেই মানুষের মধ্যে এক শক্তি প্রতিক্ষণে বেঁচে থাকার ক্ষমতাকে রক্ষা করছে এবং একই ভাবে মানবজাতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম পার করে চলেছে। এই জীবনীশক্তির দুটি রূপ : একটি লিবিডো বা যৌন অনুভূতি (life drive) এবং অন্যটি সংহারক শক্তি (aggressive drive)।

শ্বসন, খাদ্যগ্রহণ বা মল-মূত্র নিষ্ক্রমণ প্রভৃতি ক্ষমতা জন্ম থেকেই মানুষ লাভ করে। অথচ পূর্ণ যৌন ক্ষমতা লাভ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ফ্রয়েডের মতে, অনুভব এবং প্রকাশক্ষমতার চেহারাটা বয়সের ধাপে-ধাপে পালটায় মাত্র। বস্তুত জন্ম থেকেই মানুষের যৌন অনুভূতি থাকে।

অবশ্য যৌন-আনন্দ বলতে ফ্রয়েড কিন্তু শুধুমাত্র যৌন-সহবাস বোঝান নি। শরীরের বিভিন্ন অংশকে কেন্দ্র করে আমরা যে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আর অনুভূতি উপভোগ করি, ফ্রয়েডের ভাষ্য অনুযায়ী তাই যৌন অনুভূতি। এবং এই উপলব্ধিকে ফ্রয়েড যুক্ত করেছেন শিশুর নিজের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেগ, সামাজিক সম্পর্ক এবং ইন্দ্রিয়-অনুভূতি-জাত অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মানব-জাতকের যৌন-চেতনার প্রথম স্তর : **ওরাল স্টেজ** (oral stage)। শিশুর প্রথম দুই বছর বয়স পর্যন্ত বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মুখ। মুখের সাহায্যে মায়ের স্তনবৃন্ত চোষন করে খাদ্যগ্রহণের তৃপ্তি সে অনুভব করতে শেখে। মুখের সাহায্যেই কামড়িয়ে বা চিবিয়ে সে তার ক্ষোভ, ক্রোধ আর হতাশা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত হয়। একই ভাবে নিজের আঙুল চোষার মাধ্যমে সে নিজের শরীর ছোঁয়ার আনন্দ উপভোগ করে। কখনো-কখনো এ-ভাবে আঙুল চুষতে-চুষতে কল্পনা করতে চায় মায়ের স্তনবৃন্ত চুষছে। অর্থাৎ তার কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় স্তর : **অ্যানাল স্টেজ** (anal stage)। দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে শিশু অর্জন করে নিজে পায়খানা করা-না-করার ইচ্ছেশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা না-করার মধ্যে সে উপভোগ করে আনন্দ বা হতাশা বা ক্রোধ। এ বয়সে অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে সে সচেতন হয়। জিনিসপত্র হাতে চেপে ধরেও সে বেশ তৃপ্তি অনুভব করে।

তৃতীয় স্তর : **ফ্যালিক স্টেজ** (phalic stage)। তিন থেকে পাঁচ বা ছয় বছর বয়স পর্যন্ত থাকে এই অবস্থা। এ স্তরের শুরুতে শিশু তার যৌন-অঙ্গ স্পর্শ করে আনন্দ উপভোগ করতে শেখে। এ বয়সে ছেলে তার বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, ঈর্ষা অনুভব করে। কারণ মায়ের প্রতি তার ভালোবাসার অংশীদার হিসেবে সে আবিষ্কার করে বাবাকে। যদিও এই ধরনের অনুভূতি খুব স্বাভাবিকভাবে শিশুর মনে আসে এবং সচেতন মনে পুরোপুরি সবটুকু যে বুঝতে পারে তাও নয়। গ্রীক পুরাণের গল্প থেকে এই অবস্থার নাম দিয়েছেন ফ্রয়েড 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'। সেই ইডিপাস রাজার গল্প, যে তার পিতৃ-মাতৃপরিচয় জানত না, নিয়তির তাড়নায় বাবাকে হত্যা করে অজান্তে মাকে বিয়ে করে ফেলে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই অনুভূতি জাগে বাবাকে ঘিরে, যার নাম 'ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স'। মজাটা হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবেই ছেলে তার বাবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর প্রতিযোগিতার সম্পর্ক ভুলে যায়। বরং বাবার সঙ্গে একই যৌন-পরিচয় আবিষ্কার করে সে নিজেকে 'আইডেনটিফাই' করে গর্ব অনুভব করে। একই সঙ্গে সমাজে পুরুষের স্থান এবং মূল্যবোধ বিষয়ে ভাসা-ভাসা ধারণাগুলিকে সে গ্রহণ করতে শেখে। বস্তুত, 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'

অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মনের মধ্যে 'সুপার-ইগো' বা বিবেকবাবুর অধিষ্ঠান শুরু হয়ে যায়।

চতুর্থ স্তর: **লেটেন্‌সি স্টেজ** (latency stage)। ছয় থেকে বারো বছর পর্যন্ত। বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত এই স্তরে যৌন চেতনা অবদমিত থাকে। এ সময় শিশু নানারকম জাগতিক ব্যাপারে এবং কর্মকুশলতা বৃদ্ধির মধ্যে ব্যস্ত থাকে।

পঞ্চম স্তর: **জেনিটাল স্টেজ** (genital stage)। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যৌন-সহবাসের আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা লাভ করে।

মানবশিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই স্তরগুলি বিশ্লেষণের যথার্থ মূল্য প্রকাশ পায় পরবর্তী বয়স্ক জীবনের নানাবিধ সমস্যার কেন্দ্রস্থলে পৌঁছানোর সময়ে। শৈশবকালে কোনো-কোনো শিশুর এক-একটি স্তর স্বাভাবিকের তুলনায় দীর্ঘ বা হ্রস্ব হয়। ফলে, এক স্তরের অভিজ্ঞতা পরবর্তী স্তরের বিকাশকে প্রভাবিত করে। একটি স্তরে শিশু অতিরিক্ত তৃপ্ত হলে সেই স্তরকেই সে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবে। আবার কেউ কোনো স্তরে নানা কারণে হতাশাগ্রস্ত হলে পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করার সময় অকারণে অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। বস্তুত 'সাইকোসেক্সুয়াল ডেভালপমেনটে'র এই স্তরগুলি অতিক্রম করার সঙ্গে-সঙ্গে শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ধাপে-ধাপে গড়ে উঠতে থাকে। কোনো স্তরে এতটুকু গোলযোগ হলে তার দায় বহন করতে হয় মানুষকে সারাটা জীবন ধরে। অসুস্থ ব্যক্তিত্বের পানসিখানা সংসারসমুদ্রে চিরকাল হাবুডুবু খায়।

ফ্রয়েডের এই তত্ত্ব নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে পরবর্তী কালে। এরিকসন আটটি ভাগে স্তরগুলিকে বিশ্লেষণ করে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সিয়ার্স (১৯৪৪) এবং ফ্যারেল (১৯৫১) অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন। ১৯৭২-এ ক্লিনে (Kline) বিস্তারিতভাবে বিশাল সমীক্ষা প্রকাশ করেন। আইজেংক তার প্রচণ্ড সমালোচনা করেন। ক্লিনে অবশ্য উত্তর দিয়েছিলেন। যাই হোক, পণ্ডিত-মহলের এত সব তর্কবিতর্কের পরেও কিন্তু শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশ নিয়ে যাঁদের চিন্তা-ভাবনা করতে হয়, ফ্রয়েডের 'সাইকোসেক্সুয়াল ডেভালপমেনটে'র তত্ত্বকে এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না।

সোশাল লারনিং থিয়োরি

'লারনিং থিয়োরি' বা 'শিক্ষণতত্ত্বে'র দার্শনিক ভিত্তি আঠারো শতকের 'অ্যাসোসিয়েসনিস্ট' দার্শনিকদের রচনায় দেখতে পাওয়া যায়। এর পরীক্ষামূলক ভিত্তি তাঁর বিখ্যাত 'কনডিশনিং মতবাদের' মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেন ইভান পাভলভ (১৯৪৯-১৯৩৬)। তবে মনো-বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'বিহেভিয়ারিস্ট স্কুলে'র প্রবক্তা জে. বি. ওয়াটসনকেই (১৯৭৮-১৯৫৮) বলা চলে 'শিক্ষণতত্ত্বে'র প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ওয়াটসনের বক্তব্য ছিল : অভ্যাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোতে মানুষের ব্যবহারের ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মানুষের বাহ্যিক ব্যবহার বিশ্লেষণেই তিনি ছিলেন সন্তুষ্ট। মানুষের মনের চেতন-অবচেতন, ইচ্ছা-শক্তি, বাসনা, উদ্দেশ্য—ব্যক্তিত্ব গঠনে এ সবকিছুর উপস্থিতি নিয়ে তিনি ছিলেন নিরুৎসাহ। জেনেটিক প্রভাবকেও তিনি গুরুত্ব দিতে নারাজ।

এই মতবাদের সাহায্যে শিশু-ব্যক্তিত্ব বিকাশের নানাবিধ ক্ষেত্রে আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে। যেমন : কেমন করে শিশু স্নায়ু-অনুভাবক এবং পেশী-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে। কেমন করে শিশু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নানাবিধ অনুভূতি গ্রহণ করতে শেখে। কেমন করে তার ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। এই তত্ত্ব দেখানোর চেষ্টা করেছে কী ভাবে শিশুর মধ্যে নির্ভরতা এবং ক্রোধের সৃষ্টি হয়। উদ্বেগ আর বিবেকের অনুভূতি সৃষ্টিরও

ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনুকরণ এবং আত্মচিহ্নিত-করণের মতো শিক্ষণ-পদ্ধতিরও বর্ণনা পাওয়া যায় এই মতবাদের লেখায়।

শিক্ষণ মতবাদের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে 'কনডিশনিং' অর্থাৎ অভ্যেসের মাধ্যমে শেখার পদ্ধতি। এই পদ্ধতির দুই প্রধান রূপ : ক্ল্যাসিকাল ও ওপেরান্ট্। 'ক্ল্যাসিকাল কনডিশনিং'-এর উদাহরণ হিসেবে পাভলভের সেই বিখ্যাত ঘণ্টা আর কুকুরের লালার গল্প বলা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বাজলে কুকুর খাবার পায়। এক সময় এই পদ্ধতি অভ্যাস হয়ে গেলে নির্দিষ্ট সময়ে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেও দেখা গেল কুকুরের মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। যেমন শিশু রোজ মায়ের মুখ দেখে আর মুখে বোতল পায়। পরে নির্দিষ্ট সময়ে দুধের বোতল না পেলেও শুধু মায়ের মুখ দেখেই নানারকম আনন্দসূচক অনুভূতি প্রকাশ করবে।

'ওপেরান্ট্ কনডিশনিং'-এর মূল ভিত্তি হল পুরস্কার আর তিরস্কারের নিরিখে শেখার পদ্ধতি। শিশু বুঝতে পারে 'মা' বলে ডাক দিলে মা বেশি খুশি হয়, আদর করে। তখন কারণে অকারণে সেই আদরটুকু পাওয়ার লোভে শিশু বারবার 'মা' ডাক দেবে।

'সমাজশিক্ষণপদ্ধতি'র মাধ্যমে বলা হয়, অতি-শৈশব থেকেই যাদের কাছে শিশু বড়ো হয়, স্বাভাবিক কারণেই তাদের ওপর শিশুর নির্ভরতা সৃষ্টি হয়। তার অসহায় অবস্থায় প্রতিটি প্রয়োজন যারা মেটায়, তাদের অনুপস্থিতিতে শিশু বিপন্ন বোধ করে। তার মধ্যে সৃষ্টি হয় উদ্বেগ। এই উদ্বেগের মধ্যে দিয়েই শিশু শিখতে শুরু করে কোন্ কাজটা করা ভালো, কোন্ কাজটা খারাপ। অভিভাবক কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হলে যদি তারা তাকে ছেড়ে চলে যান, সেই আশঙ্কা আর উদ্বেগ থেকে সে নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করে। মায়ের গলার স্বর, মুখের ভঙ্গি আর ব্যবহার দেখেই শিশু বোঝে কাজটা আদৌ ভালো করেছে না অন্যায় কিছু করে ফেলেছে। মাকে সুখী করবার জন্য সে মায়ের পছন্দমতো কাজকর্ম করবার চেষ্টা করবে। এভাবে ছোটো বয়স থেকে মা-বাবাকে 'মডেল' বা আদর্শ হিসেবে শিশু অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

শিশু যখন মেজাজ দেখায় বা রাগারাগি করে, বুঝতে হবে কোনো কারণে তার মধ্যে হতাশাবোধ বা দুঃখবোধ কাজ করছে। আবার দেখা গেছে, শিশু মেজাজ দেখানোর পর মা তার সমস্যাটির সমাধান করে দিলেন। এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটবার পর শিশুটি বুঝতে শিখল, মেজাজ দেখালে বা চ্যাঁচা-মেচি-অসভ্যতা করলেই পুরস্কার হিসেবে প্রার্থিত বস্তুটি পাওয়া সম্ভব। তখন তার মধ্যে 'ব্ল্যাক-মেইলিং' করার প্রবৃত্তি বাসা বাঁধে। আবার রাগারাগি করার পর মায়ের কাছে মারধোর খেয়ে কেউ-কেউ রাগ দমন করতে শেখে, কারোর-কারোর ক্ষেত্রে হতাশা আরো বেড়ে গিয়ে আরো উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

কোনো অন্যায় কাজ করা বা করার ইচ্ছে থেকে মনের মধ্যে অপরাধবোধ সৃষ্টি হয়, বিবেক-নামক বস্তুটি সৃষ্টির মূলে এই অনুভূতির ভূমিকাকে বেশি প্রাধান্য দেন 'সমাজশিক্ষণ মতবাদে'র পণ্ডিতেরা। যেহেতু বাবা-মার উপর শিশু সবথেকে বেশি নির্ভর-শীল, সেজন্য বাবা-মা পছন্দ করেন না, এমন কোনো কাজ করলে বা করার কথা চিন্তা করলে তার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। এই উদ্বেগবোধ থেকেই অপরাধ-বোধের জন্ম। এভাবেই ঘটনাপরম্পরায় সামাজিক সুনীতি-শিক্ষার পটভূমিতে শিশুর মধ্যে ন্যায়নীতি-বোধ সম্পর্কে ধারণাগুলি গড়ে ওঠে। সামাজিক শৃঙ্খলা ও রীতিনীতিগুলিতে সে অভ্যস্ত হতে থাকে।

জাঁ পিয়াজেটের তত্ত্ব

জাঁ পিয়াজেটের (Jean Piaget) জন্ম ১৮৯৬ সালে। তিনি শিশু-ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধাপগুলি নিয়ে

গবেষণার সময় মনের সেই স্তরের দিকে নজর দিলেন, যার সাহায্যে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে, চিন্তা করে, কারণ খোঁজে। শিশুর মানসিক শক্তি বুদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চারপাশের পৃথিবী, ন্যায়নীতিবোধ, ভাষাব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে তার ধারণাগুলি নিয়মিত পালটে যায়। বস্তুত, জগৎসংসার প্রসঙ্গে শিশুর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের সঙ্গে বয়স্কদের উপলব্ধির গুণগত বিশাল পার্থক্য থাকবেই।

পিয়াজেট শুধু একজন মনোবিজ্ঞানীই নন, একজন জীববিজ্ঞানী হিসেবেও তাঁর পরিচয় আছে। অঙ্ক, তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। তাঁর এত কিছু বিষয়ের জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটে যেভাবে তিনি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের ধাপগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। খুব ছোট্ট উদাহরণ তিনি দিয়েছেন: ক-এর সমান খ এবং খ-এর সমান গ। একটি ছোট্ট বাচ্চা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না যে, ক-এর সমান গ। অথচ সাত বছরের বাচ্চার মনে সামান্যই সন্দেহ থাকবে এ বিষয়ে। এগারো বছরের ছেলের কাছে ব্যাপারটা একটি নিখাদ সত্য। এভাবে বোঝবার ক্ষমতা কী ভাবে মানবশিশুর মধ্যে ধীরে-ধীরে গড়ে ওঠে, তা নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন পিয়াজেট।

পৃথিবী সম্পর্কে বাস্তব এবং যুক্তিসমৃদ্ধ জ্ঞানের আলো কী ভাবে শিশুর মনে জন্ম নেয়, এ বিষয়ে অনুসন্ধানকে পিয়াজেট নাম দিয়েছেন "জেনেটিক এপিসটেমোলজি"। বড়ো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতাকে শিশু কী ভাবে গ্রহণ করে মানসিক বৃদ্ধি লাভ করে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়।

খুব ছোটো বাচ্চা হাত-পা ছুঁড়ে অভিব্যক্তি প্রকাশে যতটা তৎপর, কথায় বা চিন্তাশক্তিতে নয়। তারা তখনো ইন্দ্রিয়-অনুভূতিগুলিকে সংযতভাবে গ্রহণ করতে শেখে নি। যুক্তির ব্যবহারও তারা জানে না। সাত বছর বয়সে দেখা যায় চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা অনেকখানি সুগঠিত। কল্পনাশক্তির ব্যবহার করে কোনো কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করতে সে শিখেছে। বারো বছরের বালক আরো বাস্তববাদী চিন্তাভাবনা এবং কর্মতৎপরতার পরিচয় দেয়।

শিশুর মানসিক গঠন বুদ্ধিতে খেলার ভূমিকা নিয়েও পিয়াজেট গবেষণা করেছিলেন।

প্রভাব : হেরেডিটি

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি প্রধান উপাদান অবশ্যই হেরেডিটি বা বংশধারায় বহমান চারিত্র-বৈশিষ্ট্য। জিনের মধ্যে বংশপরম্পরায় বহমান গুণলিপি নির্ধারণ করে শিশুর ব্যক্তিত্বের কাঠামো। দেখা যায়, জন্মসূত্রে পাওয়া চারিত্র-বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা পরিবেশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি। শিশু যখন বুঝতে পারে সে ছেলে বা মেয়ে—এই নির্দিষ্ট পরিচয়সূত্রে পরিবারের মধ্যে তার ভূমিকার রকমফের হচ্ছে, গুরুত্ব বাড়ছে না কমছে, বাবা-মার কাছে ভালোবাসার তারতম্য হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই এইসব টানাপোড়েন চার-পাশের পরিবেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতি-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করবে। তার ব্যক্তিত্ব গঠনেও সৃষ্টি করে নানারকম সমস্যা।

জন্মসূত্রে কেউ বেশ সুন্দর বা কুৎসিত—এই রূপ নিয়ে আত্মপরিচয় গঠনের পটভূমিতেও নানারকম সামাজিক ধ্যান-ধারণা-সংস্কারের প্রভাবে ব্যক্তিত্ব বিকাশে জটিলতা এসে যায়।

প্রকৃতির নিয়মে জেনেটিক বিচ্যুতির কারণে বহু হতভাগ্য মানুষের জন্ম থেকে বুদ্ধিবৃত্তি এবং দেহগত বহু রকম অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। নানা ধরনের ব্যাধিরও শিকার হয় এরা। আজন্ম অসুস্থ দেহ আর মন নিয়ে বড়ো হতে-হতে এদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ কী ভাবে কোথায় রুদ্ধ হয়ে যায়, আমরা কল্পনা করে নিতে পারি।

সব মানুষের বুদ্ধি যেহেতু সমান নয়, তাই কেউ-

কেউ জন্মায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর মেধা নিয়ে। ঠিকমতো পরিবেশের সাহায্য পেয়ে বা না-পেয়ে এরা প্রতিভার ব্যাপকতায় মাঝে-মাঝেই আমাদের বিস্মিত করে দেয়।

প্রভাব : পরিবেশ

লক্ষ-লক্ষ বছরের জীবনধারায় বিবর্তনের সূত্রে পাওয়া জেনেটিক উত্তরাধিকার আমাদের ব্যক্তিত্বকে যেভাবে প্রভাবিত করে, একই ভাবে আমরা হাজার-হাজার বছরের সামাজিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেও এড়িয়ে যেতে পারি না।

দেখা গেছে, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর শিশুরা যেহেতু ভিন্ন-ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বড়ো হয়, সেজন্য গোষ্ঠীপরিচয় হিসেবে এক ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায় তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে। আদিবাসী জীবনে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একই ধরনের জীবনযাত্রার প্রচলন রয়েছে। মারগারেট মীড একবার লক্ষ করেন, একই ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে, একই জাতিগত জন্মপরিচয় নিয়েও দুটি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠেছে ভিন্ন-ভিন্ন চারিত্র-বৈশিষ্ট্য। অ্যারাপেস-রা খুব শান্ত, আর শান্তিপ্রিয়। অন্যদিকে মুনডুগুমোর-রা সব সময় যুদ্ধং-দেহি, সন্দেহবাতিক-গ্রস্ত, পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে ব্যস্ত। এই পার্থক্যের কারণ নিহিত রয়েছে সামাজিক প্রভাবের মধ্যে।

বস্তুত, সমাজের একটি নিজস্ব ক্ষমতা রয়েছে, যার প্রভাবে এক-একটি সামাজিক জীবনে গড়ে ওঠে নিজস্ব মূল্যবোধ। একটি সমাজে সভ্যদের মধ্যে নানা ধরনের পরিবার, পুরুষ ও নারী, ভিন্ন-ভিন্ন বয়সের মানুষ, জাতিগত, ধর্মীয় কিংবা জীবিকাগত পার্থক্য থাকলেও সেই বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে প্রত্যেকের যে নিজস্ব ভূমিকা নির্ধারিত থাকে, তা এড়িয়ে যাওয়া খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। দেখা গেছে, কেউ যখন তার সামাজিক ভূমিকা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পারছে না, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশেও এসে যাচ্ছে নানারকম গরমিল।

শিশুর ব্যবহার গড়ে ওঠে চারপাশের জগতে অন্য সকলের ব্যবহার দেখতে-দেখতে। তার কাছে সকলে কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করছে, সেটা মেটাতে গিয়ে যে পুরস্কার বা ভালোবাসা সে লাভ করে, ব্যক্তিত্ব গঠনে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

সামাজিক জীবনে আমাদের ভিন্ন-ভিন্ন ভূমিকার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনও আলাদা। আর এভাবেই আমরা গড়ে তুলি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরণের নিজস্ব পরিবেশ। অর্থাৎ, একই সামাজিক আবহাওয়াতে থেকেও আমাদের আলাদা-আলাদা বৈশিষ্ট্য তথা ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয় শুধুমাত্র সামাজিক কারণেই।

আমাদের দৈহিক গঠনেও পরিবেশের বিরাট প্রভাব রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়: আমরা কী ভাবে বাঁচব, চিন্তা করব, অনুভব করব, কাজ করব—তার অনেকখানিই নির্ভর করে আমাদের দৈহিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর।

কে আমি?

শুধুমাত্র হেরেডিটি বা পরিবেশ নয়, ব্যক্তিত্বগঠনের জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় তৃতীয় অংশীদার হচ্ছে ব্যক্তির আত্মবোধ অর্থাৎ 'আমি'। ছোটো থেকে বড়ো হওয়ার প্রাথমিক ধাপগুলিতে মানবশিশুর সবথেকে বড়ো এবং অসাধারণ পদক্ষেপ হল তার 'আমিত্ব'-বোধ উপলব্ধি। 'আমি'—'আমাকে'—'আমার জন্য'—আপনাকে জানার এই অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনের বীজ হিসেবে কাজ করে। এরপর থেকে সে তার নিজের আপন ব্যবহারকে নির্দিষ্ট পথে চালনার জন্য নিজের ইচ্ছেশক্তিকে ব্যবহার করতে শেখে। যখন

সে উচ্চারণ করে—'আমি জানি', 'আমি চাই', 'আমি মনে করি' তখন তার আত্ম-অভিজ্ঞতার মধ্যে জানার ইচ্ছে, পাওয়ার ইচ্ছে এবং কোনো কাজ করার ইচ্ছে প্রতিফলিত হয়। বস্তুত ব্যক্তিত্ব-কাঠামোর ক্রিয়াশীল উপাদান হিসেবে এই তিনটি ইচ্ছেশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।

বাইরের পৃথিবীর চাহিদায় আর প্রভাবে আমাদের ব্যবহার যেমন একটি নির্দিষ্ট চেহারা গ্রহণ করে, সেই সঙ্গে আমাদের নিজস্ব ইচ্ছেশক্তির প্রভাবে নানারকম পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির প্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও ব্যবহারের ধরন-ধারন নির্ভর করে। এভাবেই জীবনে চলার পথে নিজস্ব পথ-নির্দেশিকা আবিষ্কার করে প্রতিটি শিশু।

আত্মনির্ভরতা

একেবারে ভ্রূণ থেকে নবজাতক, শিশু, কিশোর, পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়া—এই নির্দিষ্ট জীবনপরিক্রমায় ব্যক্তিত্বগঠনের একটি বিশেষ সূচক হিসেবে বলা যায়: পরনির্ভরতা থেকে আত্মনির্ভরতা বা স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। ধীরে-ধীরে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস গঠন করে শিশুর কৌতূহল সঞ্চারিত হয় বাইরের পৃথিবীর নিত্যনতুন খবরাখবরের প্রতি, মূল্যবোধের প্রতি, পরিবারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতি। এবং একদিন কখন যেন পারিবারিক জীবনের মধ্যে তার নিজস্ব অস্তিত্বের মূল্য, মতামতের মূল্য বুঝতে পারবে সে। এভাবেই তার ছোট পৃথিবীর বাইরে আর-একটা বড়ো পৃথিবীর দিকে সে পা বাড়াবে নিজের ওপর অগাধ আস্থা নিয়ে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ

শিশুর প্রাথমিক ব্যবহারের ধরন প্রসঙ্গে ফ্রয়েড যে 'সুখনীতি'র (pleasure principle) কথা বলেছিলেন, তার মূল বক্তব্য ছিল, শিশু সব সময় ব্যথা এবং অস্বস্তিকর অবস্থাকে এড়িয়ে যেতে চায়, সব সময় সে সুখের প্রত্যাশী। ফ্রয়েডের মতে, এর পর শিশু 'বাস্তব নীতি'র (reality principle) মুখোমুখি হবে। তখন সে ধৈর্য ধরতে শিখবে, বাস্তব সমস্যার প্রয়োজনীয়তা বুঝবে। কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে শিখবে। উত্তেজনা আর বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সাময়িক সুখভোগ অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। এভাবেই জীবনের বাঁকে-বাঁকে শোক-আঘাত, ব্যর্থতা, হতাশার মুখোমুখি হবার মানসিক শক্তিকে সে অর্জন করতে শিখবে।

আমার মুক্তি আলোয় আলোয়

জন্মের পর সব কিছুই থাকে অন্ধকারের ছায়ায় আচ্ছন্ন। মানবশিশু এই অজ্ঞান অবস্থা থেকে দ্রুত নিজের এবং বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে দেয়। ধীরে-ধীরে এসব জ্ঞান আহরণের মধ্যে দিয়ে বাস্তবতা, সম্ভাব্যতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে থাকে তার মনে, যা তার ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। এই ধারণাগুলির ওপর ভিত্তি করে সে বাস্তব সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়। অবশ্য নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে এইসব ধারণাগুলিও পালটাতে থাকে তার জীবনে।

একেবারে ছোটো অবস্থায় হাত-পা নেড়ে শিশু তার বাইরের জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। বছর খানিক বয়সের মধ্যেই তার মধ্যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা দেখা দেয়। এভাবে তার মধ্যে চিন্তা করার প্রবণতা গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে শুধু চোখে যা দেখছে, কানে যা শুনছে, হাতে যা স্পর্শ করছে—এসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই তার চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। এসব চিন্তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'আমি-কেন্দ্রিক' অনুভূতিতে আচ্ছন্ন থাকে। দুই থেকে সাত বছরের মধ্যে দেখা যায়, বাইরের জিনিসের প্রতি তার আগ্রহ বাড়ছে, প্রতিটি ঘটনার পেছনে কারণ বোঝার চেষ্টা করছে। বস্তুত, সাত বছরের ছোটো বাচ্চা না-বুঝেই সবকিছু শিখতে চায়। সাত বছরের পর বুঝে শেখার চেষ্টা করে। বারো বছরের পর নতুন বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। জীবনের জটিলতম সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এই চূড়ান্ত বিকাশও নির্ভর করে নানাবিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের টানাপোড়েনের ওপর। আমাদের চারপাশে অনেক বয়স্ক মানুষকেও তো দেখি মনের এই উত্তরণ অর্জন করতে পারেন নি। যুক্তিহীন সংস্কার এবং আচারসর্বস্ব ধ্যানধারণার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখেন চিরকাল। শৈশবের অনুকরণপর্বকেই আজীবন আঁকড়ে ধরে তাঁরা বসে থাকেন।

ভাষার ভূমিকা

ব্যক্তিত্বগঠনে ভাষার রয়েছে এক বিশাল ভূমিকা। শিশুর মুখে প্রথম দুর্বোধ্য শব্দপুঞ্জ থেকে শুরু হয় অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রাথমিক ধাপ। বস্তুত, জন্মের পর কান্নার মধ্যে দিয়ে স্থাপিত হয় তার আত্মপ্রকাশের সূচনাপর্ব। দুর্বোধ্য শব্দ থেকে অর্থবহ শব্দ সৃষ্টির ক্ষমতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগরক্ষার প্রধান সেতুটি নির্মিত হয়।

ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক পর্ব নিয়ে লুইসের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একেবারে খুদে শিশুর ভাষাসৃষ্টির সময় লক্ষ রাখতে হবে সে মুখে ঠিকমতো আওয়াজ সৃষ্টি করতে পারছে কিনা। মানুষের গলার স্বর শুনে বুঝতে পারছে কিনা। মায়ের উচিত তার নানারকম আওয়াজের উত্তর দেওয়া, তার সঙ্গে কথা বলা।

দেখা গেছে, আনন্দ পেলে শিশু একরকম আওয়াজ করে, কষ্ট পেলে একরকম, খিদে পেলে আর-এক ধরনের আওয়াজ করে। মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সময়েও গলার আওয়াজ অন্য ধরনের হয়ে যায়। এভাবেই ধীরে-ধীরে তার মুখে প্রথম অর্থবহ শব্দ ফোটে 'মা'!

ছ সপ্তাহ বয়স থেকেই তার মুখে নানারকম ইচ্ছাকৃত শব্দপুঞ্জ প্রকাশিত হতে থাকে। এক সময় অন্যের মুখ থেকে শোনা শব্দ নকল করার চেষ্টা করে। তিন-চার মাস বয়স থেকেই অন্যের কথার উত্তরে বিশেষ-বিশেষ আওয়াজ তৈরি করে আনন্দ পায়। ধীরে-ধীরে সে চারপাশের মানুষজন এবং বস্তুসমূহকে যেমন চিনতে শেখে, সেই সঙ্গে তাদের সম্পর্কে ব্যবহৃত শব্দগুলির মানে বোঝার চেষ্টা করে। এটা বাস্তব সত্য যে, নিজে কথা বলা শেখার আগে অন্যের কথার মানে বুঝতে সে শুরু করে দেয়। ফলে প্রথম দিকে অন্যের কথার উপর ইশারায় জবাব দেয়। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় বর্ষ বয়স থেকেই শিশু খুব দ্রুত কথা বলতে শেখে। কী ভাবে মানবশিশু কথা বলতে শেখে তা নিয়ে অনেক মতবাদ প্রচলিত আছে। মনোবিজ্ঞানী স্লোবিন-এর মতে, অনুকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে শিশুর আঠারো মাস বয়সের সময় থেকে বয়স্কদের অনুকরণ করে তার শব্দসম্ভার বাড়ানোর চেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

পৃথিবীর প্রতিটি ভাষার ভিত্তিমূল বোধ হয় একই, যার কিছুটা প্রমাণ মেলে শিশুর নিজস্ব কথা বলা শেখার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করলে। সম্প্রতিকালে জাপানে আর রাশিয়ায় এক গবেষণায় জানা গেছে, একজন জাপানি শিশু যেভাবে প্রাথমিক অবস্থা থেকে কথা বলতে শেখে, একজন ইন্দো-ইউরোপীয়ানভাষী শিশুর সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই, যদিও বয়স্কদের মুখে এসব ভাষাগুলি একেবারেই আলাদা।

মনের ওপর চাপ

সারাটি জীবন ধরে বিচিত্র ধরনের সব চাপ আসে মনের ওপর। বয়স্ক মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে অভ্যস্ত

হলেও শৈশবের প্রথম দিনগুলিতে ব্যাপারটা অত সহজ দাঁড়ায় না।

কত রকম চাপ আসতে পারে? শরীরের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাস প্রবেশ করে অসুস্থ করতে পারে মানুষকে। দারিদ্র্যের মতো সামাজিক সমস্যাও মানুষকে কম সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয় না। আমরা এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য শুধু মানসিক সমস্যাগুলির কথা বলব।

হতাশা : যখন মনের কোনো উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, বা যেক্ষেত্রে জীবনের কোনো সঠিক লক্ষ্যই থাকে না, তখন স্বাভাবিকভাবে হতাশার সৃষ্টি হয়। হতাশা বাইরের পরিবেশ থেকেও আসতে পারে, নিজের শরীরের ভেতর থেকে তৈরি হতে পারে। সামাজিক মূল্যবোধের টানাপোড়েনও নানাভাবে হতাশার সৃষ্টি করতে পারে মনের মধ্যে।

দ্বন্দ্ব : হতাশা থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। দ্বন্দ্বের মধ্যে দোদুল্যমান মানসিকতায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক মতামত নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানসিক দ্বন্দ্ব নানাভাবে আসতে পারে। একটি লোভনীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে গেলে প্রিয় কিছু মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়ার শর্ত থাকলে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়। কখনো দুটি লোভনীয় বাসনা পূরণের সম্ভাবনা থাকলে কোন্‌টিকে গ্রহণ করব, সেই দুশ্চিন্তা থেকেও দ্বন্দ্ব আসতে পারে। কখনো দুটি অপছন্দের ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্যা হতে পারে, কোন্ পথে এগুলে কম ক্ষতি হবে।

আরো কতভাবে চাপ আসে শিশুর মনে। আজকালকার শিক্ষাব্যবস্থার বিপুল চাপে হাঁসফাঁস করার অবস্থা শিশুদের। ওদিকে নব্য বাবা-মায়েরা তাঁদের একটিমাত্র সন্তানকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না আইনস্টাইন বানাবেন, ঠিক করতে না পেরে এত বেশি জুলুম চালান, যার ফলে শিক্ষা ব্যাপারটাই একটি ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করছে ছোটোদের মনে। পরীক্ষার ফলাফলে প্রতিবেশীর ছেলে শ্রীমান অমুক পঁচাশি পেলে আমার বংশধরটি কেন আশি নম্বর পাবে, এটা মেনে নিতে না পেরে সন্তানের ওপর মানসিক অত্যাচার চালান অতি-উৎসাহী বাবা-মারা। কলকাতার একটি বিখ্যাত ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে শিশুদের ভয় দেখিয়ে শাস্তি দেওয়ার জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয় একটি অন্ধকার ঘরে। হ্যাঁ, এই উনিশশো সাতাশি সালেও!

জীবনের চলার শুরুতে শুধুমাত্র স্কুলের পড়াশুনোর প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়ে শিশুরা যখন অপমান আর অত্যাচারের সম্মুখীন হয়, স্বাভাবিকভাবেই নিজের সম্পর্কে হীনম্মন্যতা গ্রাস করে। সংসারে হরেক রকম প্রতিযোগিতায় তাকে যোগ দিতে হবে, এবং সেসব প্রতিযোগিতায় একজনমাত্র প্রথম স্থান লাভ করে, বাকিরা সবাই পরাজিতের দলে, জীবনের এই সহজ সত্যটুকু গ্রহণ করতে সে ব্যর্থ হয়। লড়াই করবার মধ্যে যে আনন্দ আর উত্তেজনা থাকে তা উপভোগ করার আর্ট সে কোনোদিন রপ্ত করতে পারে না।

ছোটোবেলা থেকেই শিশু দেখে, পাশের বাড়ির প্রতিবেশীর সঙ্গে স্ট্যাটাস আর সম্মানবোধ নিয়ে বাবা-মার প্রতিযোগিতা। দূরদর্শনের কল্যাণে ভোগ্যপণ্যর রকমারি লোভ ঘরের মধ্যে পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে যে সমস্যা সৃষ্টি করে, বড়োদের সেইসব হতাশা আর চাহিদার মাতামাতি শিশুমনকেও রীতিমতো প্রভাবিত করে। সংসারে হঠাৎ অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের আঘাতও ছোটোরা এড়িয়ে যেতে পারে না।

শৈশবের দুঃখ

কত রকম শোক, দুঃখ, আঘাত আসে মানুষের জীবনে। শৈশবে বাবা-মার মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নিরাপত্তার অভাববোধ। মনে আঘাত পাওয়ার যে-কোনো ঘটনার স্মৃতি আজীবন মানুষকে জড়িয়ে থাকে।

ছোটোবেলায় সাঁতার না জেনে পুকুরে হঠাৎ পড়ে গিয়ে ডুবে মরার অবস্থা হলে পরবর্তী জীবনে জল

সম্পর্কে তীব্র ভীতি সে এড়িয়ে যেতে পারে না।

কোনো একটি দুঃখজনক ঘটনার অভিজ্ঞতা অন্য পরিবেশেও ভীতি সৃষ্টি করতে পারে। ছোটোবেলায় জলের ভীতি থেকে পরবর্তী কালে নৌকায় বা অন্য কোনো জলযানে চাপতে ভয় পাবে জলে ডুবে যাবার আশঙ্কায়।

বস্তুত, শৈশবের যে-কোনো দুঃখজনক অভিজ্ঞতার সময় প্রয়োজন অভিভাবক বা বড়োদের সহানুভূতি এবং আশ্বাসপ্রদান। বিশেষ করে যখন সে কোনো ব্যাপারে অকৃতকার্য হচ্ছে, হাস্যাস্পদ হচ্ছে, অন্যদের দ্বারা অসম্মানিত হচ্ছে, বড়োদের উচিত সেক্ষেত্রে হাত ধরে তাকে সমস্যাটির মোকাবেলা করতে শেখানো।

বাবা-মার সান্নিধ্য

স্নেহ-ভালোবাসার উত্তাপে বড়ো হয় ছোটো শিশু। বাবা-মার সান্নিধ্য সেই উত্তাপের প্রধান উৎস। তাঁদেরকে অবলম্বন করেই সে নিজেকে চিনতে শেখে, নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হবার সাহস অর্জন করে, নিরাপদ বোধ করে।

সেজন্য দেখা যায়, যেসব শিশু ছোটো থেকে হসপটেলে মানুষ, মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্কের শেকড়ে কোথায় যেন শিথিলতা এসে যায়। অন্য মানুষের সঙ্গেও স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে এরা উৎসাহ বোধ করে না। বেশির ভাগ শিশুই বড়ো বেশি আত্ম-সচেতন হয়ে পড়ে। গ্রাস করে স্বার্থপরতা। অনেকের ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশে আসে নানাবিধ সমস্যা। সারাটা জীবন ধরে মানবিক অনুভূতিগুলির সঠিক উপভোগে সে হতে পারে ব্যর্থ।

আবার সংসারে বাস করেও শিশু বঞ্চিত হতে পারে মা-বাবার স্নেহ-মমতা থেকে। অনেক পরিবারেই শিশুরা হয় সবথেকে অবহেলিত। তাদের সামান্যতম প্রয়োজনের দিকেও নজর দেওয়ার সময় পান না বাবা-মা। দরকার হলে দুমদাম করে পিটিয়ে দেন তাঁরা। এরকম যন্ত্রণাদায়ক শৈশবে স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুর মানসিক বৃদ্ধি হতে পারে রুদ্ধ। অনুভূতির রাজ্যেও আসতে পারে নানারকম বিকৃতি। পড়াশুনোতে আগ্রহ কমতে পারে। মনের মধ্যে নানা ধরনের ভীতির সৃষ্টি হতে পারে। চুরি করা, মিথ্যে কথা বলা থেকে শুরু করে ধীরে-ধীরে বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে অসামাজিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে তারা। দেখা গেছে, যেসব বাবা-মা বাচ্চাদের অবহেলা করেন, তাঁদের নিজেদের ছোটোবেলাতেও বাবা-মার কাছে এরকম অবহেলা পেয়ে তাঁরা বড়ো হয়েছেন।

এর বিপরীতে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দেওয়াও প্রচণ্ড ক্ষতিকর। ছোট থেকে যেসব মা সব ব্যাপারে বড়ো বেশি আগলে-আগলে চলেন, জীবনে কোনো সমস্যা বা বিপদের সম্মুখীন হতে দেন না, তাঁরা শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনের মূল কাঠামোটাই করে দেন দুর্বল। জীবনের বৃহত্তর অংশে পৌঁছে এইসব দুর্বলচিত্ত ছেলে-মেয়েরা যে-কোনো চ্যালেনজের মুখোমুখি হতে সাহস পাবে না।

ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত শাসন আর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখার প্রবণতা কিছু-কিছু বাবা-মার মধ্যে দেখা যায়। ছোটোদের কোনোরকম স্বাধীনতা দিতে তাঁদের ভীষণ আপত্তি। বাবা-মার পছন্দমতো গোলগাল 'লক্ষ্মী ছেলে' হিসেবে তারা বড়ো হলেও মনের মধ্যে তারা লালন করে নানারকম ভীতি, পরনির্ভরতা, আনুগত্য এবং অবদমিত আক্রোশ। কখনো দেখা গেছে, বাবা-মার শাসনের চোটে ভয় পেতে-পেতে তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধির বিকাশই শেষ পর্যন্ত হয় না। বয়সন্ধির সময়ে এরা হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারে, মাদক-দ্রব্য গ্রহণ করতে পারে।

ছোটোদের অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর অভ্যাসও তাদের লোভী, স্বার্থপর আর অসামাজিক পথে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। অল্প থেকে শুরু করে এক সময় ছেলেমেয়ের আকাশছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা মেটাতে অক্ষম

হলে বাবা-মারা তাদের আক্রোশের শিকার হন। নানাভাবে অসম্মানিত হন। ওদিকে ছোটো থেকে বাবা-মার কাছে ইচ্ছেমতো সবকিছু সহজে পেতে অভ্যস্ত শিশুরা বড়ো হয়ে বাস্তব দুনিয়ায় প্রবেশ করে দেখে, জীবনে কিছু অর্জন করা কতখানি পরিশ্রমের ব্যাপার, সংগ্রামের ব্যাপার। স্বাভাবিকভাবেই সে তখন হতাশাগ্রস্ত হয়। অনেক সময় নেশার আশ্রয় নিয়ে বাস্তবের রুক্ষতাকে ভুলে যেতে চায়।

বাবা-মায়ের চরিত্রও বিরাট প্রভাব ফেলে শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে। বাবা মদ খেয়ে বাড়িতে এসে লাফা-লাফি করে, মাকে প্রহার করে, শিশুর কাছে মোটেই তা খুব উচ্চ আদর্শের ছবি আঁকবে না। মায়ের স্বভাব-চরিত্রের শিথিলতাও শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের মূল্য-বোধ, ন্যায়নীতিবোধকে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে। ক্রিমিনাল বা অপরাধী বাবা-মার ছেলেমেয়েরা কাল-ক্রমে অসামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সংসারে ঝগড়াঝাঁটি-অশান্তি সব সময় শিশুর মনে উদ্বেগ-অশান্তি-বিরূপতা বাড়ায়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসুস্থতার ভূমিকা বিরাট এসব সংসারে। বাবা-মা কেউ মানসিক রোগী হলেও সংসারে স্বাভা-বিক পরিবেশ থাকে না। শিশুর মানসিক গঠন হয় বিপন্ন।

বাবা-মার মৃত্যু বা ডিভোরস বা সেপারেশনের মতো সংসার ভেঙে যাওয়ার পটভূমিতে শিশুর অস্তিত্ব হয় বিপর্যস্ত। নিরাপত্তার অভাবে তার ব্যক্তিত্বের গঠনে সাংঘাতিক চাপ পড়ে। বয়ঃসন্ধিকালে বিগড়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। বাবার মৃত্যুর পর শিশু 'আইডেনটিটি ক্রাইসিসে' ভুগছে, এমন তথ্যও বহুক্ষেত্রে পাওয়া গেছে।

মানসিক জড়তা

শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে 'মেনটাল রিটারডেশন' বা জড়ধী শিশুর সমস্যা। যেহেতু এদের বুদ্ধির মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে অনেক-খানি কম, বাস্তব পৃথিবীর সংঘাতমুখর আবহাওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো মানসিক জোর এবং ব্যক্তিত্ব তারা অর্জন করতে পারে না। সাধারণ স্কুলের পড়া-শুনোয় এরা ক্রমাগত পেছিয়ে পড়ে।

বুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে এদেরকে কয়েকটি মাত্রায় ভাগ করা হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী এদের শিক্ষা ও বৃত্তিগত দিক দিয়ে সাহায্য করা উচিত। সমাজে সবক্ষেত্রে এরা পিছিয়ে পড়ার জন্য এদের ব্যক্তিত্বের খণ্ডিত বিকাশ হবে, এটাই স্বাভাবিক।

মানসিক জড়তার নানাবিধ কারণ উল্লেখ করা যায়। সংক্ষেপে: বিভিন্ন জেনেটিক-ক্রোমোজোমাল বিচ্যুতি, গর্ভবতী অবস্থায় মায়ের সিফিলিস বা কোনো ভাইরাল অসুখ হলে বা কোনো টক্সিক ওষুধ গ্রহণ করলে, নির্ধারিত সময়ের আগে শিশুর জন্ম হলে জন্মের সময় শিশুর দেহে কোনো আঘাত লাগলে, আর্সনিক রেডিয়েশন, গর্ভবতী অবস্থায় এবং শিশুর জন্মের পর অপুষ্টি ও প্রোটিনের অভাব প্রভৃতি।

হাইপারকাইনেটিক সিনড্রোম

এ অবস্থায় শিশু মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চল হয়। অনাবশ্যক ছোটাছুটি করে, মারপিট করে। এরা বড়োদের কথা মানতে চায় না। মনে যা ইচ্ছে হয় তাই করে বসে। জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে এদের কোনো দ্বিধা হয় না। এদের বুদ্ধি যে সব সময় কম থাকে, তা নয়। তবু অস্থিরতার জন্য স্থিরভাবে পড়াশুনোয় মন বসাতে পারে না।

কেন হয় এমন অবস্থা, এ বিষয়ে অনেক রকম মতবাদ রয়েছে। অনেক সময় অন্য কোনো মানসিক ব্যাধির বহিঃপ্রকাশও হতে পারে এরকম অস্থির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। কেউ-কেউ এক্ষেত্রে 'মিনি-ম্যাল ব্রেন ড্যামেজ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন।

চিকিৎসার সাহায্যে এদের অনেকেই সুস্থ হতে

পারে। কেউ-কেউ আপনা থেকেই ভালো হয়ে যায়। সময়মতো এদের দিকে নজর না দিলে বয়ঃসন্ধি বা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় এরা নানারকম সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে।

শৈশবের উদ্বেগ

নানারকম ভাবে ছোটোরা তাদের মনের উদ্বেগ প্রকাশ করে। অনেকে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর, কেউ অহেতুক ভয় পায়, কেউ খুব লাজুক, মুখ তুলে কথাই বলতে চায় না, কেউ অনাবশ্যকভাবে অসহায় বোধ করে, কারোর ঘুম ভালো হয় না, কেউ বা স্কুল যাবার নামে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাবা-মার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এসব সমস্যার সৃষ্টি করে।

কেউ-কেউ বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতে না চেয়ে দিন-দিন গুটিয়ে নেয় নিজেকে। কারোর সঙ্গে এরা মেলামেশা করতে চায় না। দিবাস্বপ্ন আর অবাস্তব সব কল্পনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

সঠিকভাবে শিশুকে সাহায্য করলে এসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। নইলে বয়ঃসন্ধিতে আরো বড়ো আকারে নানা রকম জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে!

অটিজ্‌ম

এ অবস্থায় শিশু কারোর সঙ্গে মেশে না। হাসে না, তাকায় না মুখ তুলে। খেতে বসলে খেয়ালও করে না কে এল গেল। সাধারণত কথা বলতে চায় না। জোর করে বললেও ওই 'হ্যাঁ' বা 'না' বা টিয়াপাখির মতো একই কথার পুনরাবৃত্তি করে। যে পরিবেশে এরা বাস করে, তার কোথাও কিছু পরিবর্তন হলে এরা অস্থির হয়ে পড়ে। খেলনা, পাথরের টুকরো, চাবি প্রভৃতি প্রাণহীন বস্তুতে এদের বেশি আগ্রহ। সবথেকে বড়ো কথা—এদের মধ্যে 'আইডেনটিটি' বা 'আমিত্ব-বোধ' একেবারেই জন্মায় না। মাঝে-মাঝে চিৎকার চ্যাঁচামেচি বা কান্নাকাটি করে। অনেক সময় চাইল্ড-হুড সিজোফ্রেনিয়ার সঙ্গে অটিজ্‌মের পার্থক্য করতে অসুবিধা হয়। তবে অটিজ্‌মের ক্ষেত্রে রোগের শুরু হয় অনেক অল্প বয়স থেকে।

তোতলামি

কথা বলার সময় উচ্চারণের অসুবিধা বা তোতলামি ছোটোদের ব্যক্তিত্ববিকাশে একটি প্রধান সমস্যা। অন্য ছেলে-মেয়ের সামনে অকারণে লজ্জায় পড়তে হয়, ব্যঙ্গের পাত্র হতে হয়। ফলে শিশু স্বাভাবিক-ভাবে কথা বলতে ভয় পায়, নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায় সবার কাছ থেকে। অকারণে হীনম্মন্যতার শিকার হয়।

ইতিহাসে দেখা গেছে, অনেক বিখ্যাত লোকের উচ্চারণে এই অসুবিধে ছিল। যেমন: মোজেস, অ্যারিস্টটল, ভারজিল, ডেমোসথিনিস, চার্লস ল্যাম্ব, ক্ল্যারা বার্টন প্রভৃতি। কিছু সমাজে সাধারণভাবে এই অসুবিধে দেখা যায়। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টুদের মধ্যে, দক্ষিণ প্যাসিফিকের পলিনেসিয়ান-দের মধ্যে।

তোতলামির বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রথমেই জেনেটিক এবং স্নায়বিক কারণগুলির উল্লেখ করতে হয়। এর পর আছে ভুল শিক্ষাপদ্ধতি আর নানারকম মানসিক চাপ।

শিশুদের ব্যবহারে অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে রয়েছে তিন বছরের বেশি বাচ্চার বিছানায় পেচ্ছাব করা, কখনো-কখনো পায়খানা করে ফেলা, ঘুমের মধ্যে হাঁটা, দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছায় নানারকম মুখভঙ্গি করা প্রভৃতি।

খেলা

শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনের সময় খেলার ভূমিকাকে অস্বীকার

করা সম্ভব নয়। তার জীবনে বৃদ্ধির সমস্ত কিছু উপাদানকে সাহায্য করে খেলা।

খেলার মাধ্যমেই শিশু তার চারপাশের নানা-রকম জিনিস সম্পর্কে পরিচিত হয়। আঠারো মাস থেকে দু বছর বয়সের সময় খেলার সাহায্যে তার পরিবেশের বস্তু এবং মানুষজন সম্পর্কে কল্পনার জগৎ তৈরি করতে শেখে। চার বছর বয়সের পর বাস্তব জগতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য খেলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পিয়াজেট-এর মতে এসময় শিশুর সামাজিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য খেলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের সঙ্গে পরিচিত হতে-হতে সামাজিক জীবনে আইন-কানুন শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করতে শেখে।

ফ্রয়েড এবং পিয়াজেট দুজনেই এ বিষয়ে একমত যে, খেলার মাধ্যমে কল্পনাশক্তির বিকাশ হলে তা শিশুকে বাস্তব জগতের সঙ্গে মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। এ ধরনের খেলার মাধ্যমে তার ভেতর-কার জগতের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর একটি যোগসূত্র গড়ে ওঠে।

ফ্রয়েড মনে করতেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবের সঙ্গে খেলার সম্পর্ক চোখে পড়ে না, তবু প্রতিটি খেলার একটি উদ্দেশ্য আছে, যার ফলে খেলার মধ্যে শিশু একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে, তার বাস্তব জীবনে যা বিরাট ছাপ এঁকে দেয়, যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মানসিক দৃঢ়তা তৈরি করে দেয়। ফ্রয়েডের চিন্তাভাবনাকেই সমর্থন করে পরবর্তী কালে আইজাক দেখিয়েছেন, কী ভাবে খেলার মাধ্যমে শিশুর মনে নানারকম অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগের উপশম ঘটে। আইজাকের মতে, কল্পনার জগৎ এবং বাস্তব জগতের মধ্যে সব সময় চলেছে এক নির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে যার গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব খেলায় কল্পনার প্রয়োজন হয়, তার মাধ্যমে শিশু খুব নিরাপদে নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

একসঙ্গে অনেক শিশু খেলা করার সময় তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং প্রতি-যোগিতার মানসিকতা গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এভাবেই তারা জীবনের প্রাথমিক ধাপেই সামাজিক বন্ধনের প্রয়োজনীয়তা নিজেদের অজান্তেই উপভোগ করতে থাকে।

শিক্ষকের ভূমিকা

পরিবারের বাইরে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে যাঁর সাহায্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন, তিনি শিক্ষক। ভালো শিক্ষকের কী কী গুণ থাকবে? তিনি শিশুর সবরকম সমস্যায় সাহায্য করবেন, ব্যাখ্যা করবেন, সাহস যোগাবেন। পাঠ্যবস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে। শৃঙ্খলা রক্ষার সময় দৃঢ়তা দেখাবেন। কখনো ধৈর্য হারাবেন না। সহমর্মিতা থাকবে। ঠাট্টা-রসিকতার সঠিক প্রয়োগে পাঠ্যবস্তুর একঘেয়েমি দূর করবেন। প্রতিটি বিষয়কে ভালোবেসে শেখবার অনুপ্রেরণা যোগাবেন। বদরাগী, মারকুটে মাস্টারমশাই কোনো শিশু পছন্দ করে না।

স্কুলের প্রথম দিনগুলোতে সব শিশুই উদ্বেগের মধ্যে বাস করে। বাড়ির বাইরে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসাটা যে নির্বাসন নয়, সেটা বোঝানোর দায়িত্ব শিক্ষকের। তিনি যেন শিশুর পরিবারের একজন, এরকম ব্যবহার করতে হবে। শিশুদের সমস্যাগুলি আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এবং তা খুব কঠিন কাজ নয়, কারণ সব শিক্ষকেরই নিজের জীবনে থাকে একটি করে ছেলেবেলা।

বয়ঃসন্ধির দ্বন্দ্বমুখর দিনগুলিতে শিক্ষকই হতে পারেন ছাত্রের একমাত্র বন্ধু এবং পথনির্দেশক।

শিশুর প্রয়োজন

একটা কথা মনে রাখা উচিত, সব শিশুর প্রয়োজন

এক নয়। তাই শিশু-ব্যক্তিত্বের গঠনপর্বে প্রত্যেকের সমস্যা নানারকম রূপ নিয়ে আসে। তবে দুটি প্রধান বিষয়ের দিকে নজর রাখতে হবে : প্রথমত শিশু যেন তার সমবয়েসীদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে ; দ্বিতীয়ত বয়স্কদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক এমন হবে, যার সাহায্যে শিশু তার স্বাভাবিক দক্ষতাগুলির পূর্ণতা অর্জন করতে পারে। এ দুটি বিষয়ের তারতম্যের মধ্যে দিয়েই শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অন্য মানুষের সঙ্গে মেশবার ক্ষমতা প্রভৃতির বিকাশ হয়।

কেলমার প্রিঙ্গল বলেছিলেন, প্রতিটি শিশুর চারটি প্রধান প্রয়োজন সব সময় একই থাকে : সে চায় ভালোবাসা আর নিরাপত্তা, সে চায় প্রশংসা আর স্বীকৃতি, সে চায় দায়িত্ব এবং নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে। এসব প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব শুধু একা বাবা-মার নয়, সমগ্র সমাজ তাকে সাহায্য করতে পারে সুস্বাস্থ্য, গৃহ, শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যোগ্যতামাফিক জীবিকার নিরাপত্তা দিয়ে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তাহলেই সম্ভব।

কৃতজ্ঞতা :

1. Culture, Behaviour and Personality—by Robert A Levine.
2. Children : The Development of Personality and Behaviour—by Margaret E. Word.
3. Theories of Personality—by C. S. Hall and G. Lindzey.
4. Two Short Accounts of Psycho-Analysis —by S. Freud.
5. Social Learning and Personality Development—by A. Bandura & R. H. Walters.
6. An Outline of Piaget's Developmental Psychology—by R. M. Beard.
7. Theories of Child Development—by A. L. Baldwin.
8. Human Intelligence : Its Nature and Assessment—by H. J. Butcher.
9. Abnormal Psychology and Modern Life —by J. C. Coleman, J. N. Butcher, R. C. Carson.
10. Readings in the Psychology of Parent-Child Relations—by G. R. Medinnus.

তন্মাত্র

সুভাষ ঘোষাল

পনেরো বছর আগে কিছুদিনের জন্য একটি অধ্যায় গড়ে উঠেছিল। রাত থাকতে-থাকতে জেগে উঠে ভোরবেলায় বেরিয়ে পড়া। এমনভাবে হাঁটা শুরু করা যাতে নিখিল নিদ্রার পটভূমিতে সরু সুবর্ণদাগ যেন স্থির হয়ে থাকে। সেসব দিনে বৃক্ষ ছিল, বৃক্ষের নিবিড় মধ্যস্থতা ছিল, জলস্থল ছিল এবং বৃক্ষ আর জলস্থলের পাশ দিয়ে ছিল রেলগাড়ি। গাড়ির স্বরে রূপরেখা ছিল। পনেরো বছর আগে কিছুদিন ধরে ভোরবেলায় হাঁটতে-হাঁটতে আমি সেই রূপরেখার দ্বারা হৃতসর্বস্ব হয়ে উঠতাম। একদিন হৃতসর্বস্ব হয়ে জল আর বৃক্ষের পাশ দিয়ে হাঁটছি। আমার সামনে শিশু-উদ্যানের খোলা দরজা। কোনো দিনও উদ্যানে ঢুকি না। কিন্তু সেদিন মুক্ত দরজার ওপরে বসে পড়েছিল টিয়াগুচ্ছ। সবুজের সেই উন্নয়ন দেখে আমি প্রবেশ করলাম। ভিতরে-ভিতরে যড়্‌রিপুর মতো ছোটো-ছোটো ঘরে পাখি উড়ছে। ছোটো-ছোটো উঠোনে হাঁটছে হরিণ, কচ্ছপ সূক্ষ্মভাবে মুখে নিয়েছে কপির ত্বক, ফুটে ওঠার সুযোগ খুঁজছে ময়ূর, কিন্তু ডালে-ডালে এসে গেছে প্রস্ফুটন। ঘুরতে-ঘুরতে মনে হচ্ছিল না এখানে মালীর অধিক কোনো মানুষ হাজির। তখন কোনো কুঞ্জ থেকে পরিষ্কার শব্দসমষ্টি রচিত হয়েছে—'কাঞ্চন, কাঞ্চন, এ তো কাঞ্চন ফুল।' কোন্ কুঞ্জ বাঙ্ময়, তা বের করতে এমন-কি নিশ্বাসের সাহায্য নিয়েছিলাম। চোখের ভূমিকা খুব মৃদু হয়ে এসেছে। বেড়ে চলেছে বাতাসের অবদান। শুধু অভিমানের মতো একাগ্রতায় দেখে নিলাম নাকের কোন্ রন্ধ্র দিয়ে বাতাস বইছে। যেদিকে বাতাস বইছে শুধু সেই দিকে ঘুরে যাওয়া, আর কোনো ভার নেই। মনে পড়ে বামপন্থী হয়েছিলাম। তখন সন্নত হয়ে যে বৃক্ষ রাজাধিরাজ হয়েছে তার দরবার। চটি হাতে নিয়ে সেই দরবার পার হতে গিয়ে বুঝলাম ঝরাপাতা, মৃত্তিকা আর শিশিরের স্বাদ কত আত্মিক। পায়ের কাছে ঋণী রইলাম। যতদূর জানি ঋণী হবার পরেই কুঞ্জমুখ ছিল। সেই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে-

ছিল একটি উজ্জ্বল পরিবার। পরিবারের কিশোর-কিশোরী-বৃদ্ধা আর প্রৌঢ়কে ছাপিয়ে থই-থই যৌবন। আমার থেকেও লম্বা একজন তার শুক্ল ত্বকের প্রায় সর্বত্র প্রসারিত করেছে তন্তুর শতসহস্র স্নায়ু এবং কমলা থরে-থরে ওপরে মধ্যে নীচে। সে হাসতে-হাসতে দুহাত দিয়ে ধরে আছে ফুলের ডাল। সবাইকে থামিয়ে আবিষ্কারের পবিত্রতায় সে ডালটিকে এতটাই অন্তর্গত করে নিয়েছে যে মনে হচ্ছিল সম্ভব হলে সে তার রাত্রির স্তনভার মুক্ত আর মূর্ত করত। কিন্তু মুক্তি পেয়েছিল শব্দ এবং মূর্ত হয়েছিল শব্দ—'কাঞ্চন, কাঞ্চন, এ তো কাঞ্চন ফুল।'

পনেরো বছর পরেও কাঞ্চনফুল কেন, কোনো ফুলই আমি চিনতে পারি নি। এই না-চেনাটা যে কত বড়ো অপরাধ তা অনেক পরে একটি কথায় মর্মে-মর্মে বুঝেছিলাম। সেই অনেক পরের কথাটা স্মরণের শুরুতেই স্মরণ করে নেওয়া ভালো। বন্ধুর টাকায় আমার প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছিল। যাদের-যাদের ছুটে গিয়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে হল তাদের নামের তালিকায় এমন একজনের নাম ছিল যিনি এক প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক। প্রতিদিন সরকারি বাসে লম্বা পথ পার করে ক্লাসে নৃত্যের তালে-তালে হাজির হতেন। হাজির হওয়া তো নয়, সে এক প্রাণময় উপস্থিতি। শোনা যায়, একমাত্র পুত্রের দেহান্তের পরের দিনও ক্লাসে তাঁর উপস্থিতি ছিল। কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে অমলধবল কেশরাশি। তিনি সন্ধেরাতে দরজা খুলে আমাকে দেখে হেসে উঠলেন—'কী ব্যাপার, তুমি?'

খুবই সংকোচ ছিল, তবু না বলে পারলাম না—আমার একটা কবিতার বই বেরিয়েছে। এক কপি আপনাকে উপহার দিতে এলাম।

আমাকে উপহার দিয়ে কী হবে? আমি তোমাদের কবিতা বুঝি না। শুধু-শুধু একটা বই কেন নষ্ট করবে?

তবু আমি জোর করে তাঁর হাতে তুলে দিলাম একটি সবুজ শীর্ণ সংকলন। তিনি হাসতে-হাসতে আমার পেছন-পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন। আমি দরজা পেরিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এমন সময় তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে একটু নীরবতা পালন করে উজ্জ্বল চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন—একটা ফুলের গন্ধ পাচ্ছ?

একটা হালকা গন্ধ সত্যিই শোভা পাচ্ছিল। আমি সানন্দে স্বীকার করলাম—হ্যাঁ-হ্যাঁ, পাচ্ছি তো?

—বলো তো কোন্ ফুলের গন্ধ? এই প্রশ্নের পর সেই প্রাণময় শিক্ষকের মুখে আমি যেন শিকারির অপেক্ষা দেখলাম। একবার চারিদিকে তাকিয়ে খুব অসহায় ভঙ্গিতে বলে ফেললাম—মনে হচ্ছে বেল-ফুলের গন্ধ। বিপুল হাসিতে চারিদিক কেঁপে উঠল—বেল নয়, শিউলি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এ-রকম ভুল করতেন না।

অধ্যাপকের শেষ বাক্যটিতে এমন এক নির্ভুলতা ছিল যা আমাকে অধোবদনে এবং নিঃশব্দে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। অথচ ফুল চেনার প্রহর জীবনের শুরুতেই পেয়ে গিয়েছিলাম।

অনেকেই জানে না জীবনের শুরুতে এই নগরের মধ্যে এমন এক পল্লী ছিল যা দ্বীপ মহিমার দিক থেকে, যাকে আজও বলা যায় পুর্ণ। অনেকেই জানল না পূর্ণসফর ট্রামগুলির সন্নিধানে গড়ে উঠেছিল পল্লীর দেহ আর চৈতন্য। এই পল্লীর নাভিমূলে আমার অবসরপ্রাপ্ত জ্যাঠামশাই তিনঘরের কমলা একতলায় দ্রবীভূত হতে চেয়েছিলেন। বলে রাখা ভালো, যে-দ্রবণ সম্ভব হয়েছিল তাকে আমি আজও বড়ো বলি। জ্যাঠামশাই জেনেছিলেন তিনঘরের পেছনে আছে পরিশীলিত পুকুর আর বহু গাছের নিমগ্নতা। তিন-ঘরের সামনে সুস্থ সড়ক এবং আধুনিক গৃহমালা। আর-একদিকে শ্বেতপাথরের দোতলা যার মূল রমণী প্রত্যহ বেদানার রস অধিক পরিমাণে গ্রহণে সক্ষম। তাকে সহজে দেখা যেত না। কিন্তু তার আনন্দঘন কণ্ঠস্বর মাঝে-মাঝে পুকুর আর গাছ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে

জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের ভিতরে গিয়ে প্রমাণ করত সংগীত শতগন্ধ। অন্যদিকে আধা-সামরিক বাহিনীর পাঁচিল। জ্যাঠামশাই জানতেন অন্তত দুটি ঘরের জানলা খুললে দেখা যাবে প্রত্যুষ আর প্রাক্‌গোধূলির কুচকাওয়াজ। কিন্তু আমি দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে জেনেছিলাম এই চতুর্দিক জুড়ে এমন এক ভুবন যা সর্বদা ব্যক্তিগত, এবং ব্যক্তিগত বলে দুরবগাহ।

এই পল্লীতে আমার বাস ছিল না। শুধু জ্যাঠা-মশাইয়ের স্নেহভালোবাসার জন্য আমি সুযোগ পেতাম আট-দশ বছরের শরীরটিকে মাঝে-মাঝে এই মাটিতে মেলে ধরার। প্রথম যেবার আসি, সে এক শীতঋতু ছিল। পৌঁছেছিলাম সন্ধের পরে। তিন-ঘরের প্রথম ঘরটিতে দাঁড় করিয়ে জ্যাঠামশাই আমার হাত ছেড়ে দিয়ে আমার টুপি খুলে দিলেন। সে এক স্বচ্ছ অবস্থা। বাড়ির পেছনে ছুটে যাবার ইচ্ছে হল। সেখানে তখন তরুলতার মাঝখানে পুকুর এবং পুকুরের ওপরে ওপরের আলো এসে পড়েছে। শ্বেতপাথরের দোতলা আলোয় সমাচ্ছন্ন। আমার খুবই কাছে কোথাও সদ্য উন্মোচিত হয়েছে ফুল। তার গন্ধের মধ্য দিয়ে জেগে উঠেছে ভবিষ্যতের শতগন্ধ। এক রোগা, নিয়বিত্ত আর স্বপ্নময় কিশোরের পক্ষে এই অভ্যর্থনা ছিল যথেষ্ট। আমি স্থানত্যাগ করে জ্যাঠামশাইয়ের কাছে ফিরে এলাম। এই প্রথম আমার একটি ফেরা অভয়ের দ্বারা আর্ত হল।

বাড়ির পেছনে দ্বিতীয়বার যখন গিয়ে দাঁড়ালাম তখন ভোর অদ্বিতীয় হবার সব-কটি উপকরণ নিয়ে আমাকে গ্রহণ করল। চারিদিকে এত জঙ্গম জবা, পুকুরের কাছে যেতে গিয়ে পথ হারানোর সম্ভাবনা ছিল। দুহাত দিয়ে আনত জবা সরিয়ে-সরিয়ে পথ করছি এবং প্রাতঃকালীন কুচকাওয়াজের বাজনা পাখিদের উড়িয়ে দিচ্ছে। এবার বুঝতে পারলাম পুকুরটিতে ভরে আছে শুধু জল নয়, জলের রাত-জাগা দায়িত্ববোধ। আর শ্বেতপাথরের ছাদের ঘর থেকে জলে নেমে আসার জন্য যে ঘোরানো সিঁড়ি সেই সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে ফুল। আমি চোখ বন্ধ করে হাত খুলে রেখেছিলাম। সেই কৈশোর যুগ থেকেই ফুল চেনার বদলে ধরতে চেয়েছিলাম ফুল। ফলে সব-কিছুর মধ্য থেকে সবকিছু কিভাবে যে ঝরে গেল আজও সত্যিই বুঝতে পারলাম না। সেই ঝরার শব্দ এই নিথর রাত্তিরে আমার কানে লেগে আছে।

অপর্ণা এখন নেই, নেই জয়। রাত সত্যিই নিথর। এই নিথর রাতকে একটু আগে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বিড়াল। কাঁদতে-কাঁদতে সে তার সন্তানকে সর্বত্র খুঁজছে। ঠিক দুদিন আগে তরতাজা বিড়ালবাচ্চা দুপুরে জয়ের এঁটো খেয়েছে। কিন্তু বিকেল থেকে সেই সুন্দর সপ্রতিভ শিশুটিকে আর কোথাও দেখা গেল না। রাতের খাওয়া শেষ হলে জয় অপর্ণার হাত থেকে এঁটোকাঁটার বাটি নিজে নিয়ে কতবার ডেকেছিল—আয় তিতিন, আয় তিতিন, আয় আয়। কিন্তু তিতিনকে কোথায় পাওয়া যায় নি। এমন-কি তার মরদেহ এই দুদিনেও খুঁজে পাওয়া গেল না। অপর্ণা খুঁজেছে, জয় খুঁজেছে, এমন কি আমিও অফিস থেকে ফেরার পথে এই দুদিন ট্রামলাইন আর বাসরাস্তায় দলিত সাদা দেহ খুঁজেছি। আমাদের দুদিনের খোঁজা শেষ হয়েছে। কিন্তু নবোদ্যমে শুরু হয়েছে মায়ের অন্বেষণ। আজ সারাদিন ধরে থেকে-থেকে এক হেতু-সর্বস্ব কান্না জ্বলে উঠছে। সেই সঙ্গে আছে এক অক্লান্ত গতি। কান্না একদিক থেকে আর-একদিকে, এক গলি থেকে অন্য গলিতে ছুটছে। একে থামানোর শক্তি আমার চারিদিকের কারও নেই। এইসব ভারী রাতের মধ্য থেকে কত রজনীবন্দনা উঠে এসেছে। যাঁরা সেইসব বন্দনাগান রচনা করেছেন তাঁদের কোনো একজনের সঙ্গেও আমার আজও দেখা হল না। এখনও বিজন রাতে বড়ো জোর নক্ষত্রবিস্তারের দর্শক হওয়া ছাড়া আমার আর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে না। আজ যদি অপর্ণা উপস্থিত থাকত কিছুতেই রাত জাগতে দিত না। মেয়েরা নিঃশব্দে কাউকে রাত জাগতে দেখলে বড়ো ভয় পায়। আর আমার ক্ষেত্রে

আরও অসুবিধে আমি ধূমপান করি না। কোনো বইয়ের পাতার পর পাতা একনাগাড়ে পড়ে যেতে পারি না। কয়েক পাতা পড়ার পর বইটা উলটে রেখে একটু চুপচাপ বসে থাকা আমার স্বভাবের মধ্যে পড়ে। চুপচাপ বসে থাকা মানে মেরুদণ্ড সোজা করে কোনো ধ্যানস্থ ভাবও আমার থাকে না, কেবল চোখ খোলা রেখে দেহ সংকুচিত করে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা। হাতে কোনো অগ্নি নেই, আঙুলের মধ্য থেকে উঠে আসছে না কোনো ধূমবলয়, চোখে নেই কোনো উজ্জীবন, অথচ গভীর রাত, বিছানায়-বিছানায় ফুটে উঠেছে নরমতম সব নিমজ্জমানতা। অপর্ণা কেন কোনো মেয়েই নির্ভয়ে প্রবল আলোকের নীচে বসে থাকা এমন কোনো পুরুষকে সহ্য করতে পারবে না। তাই মাঝে-মাঝে ধূমপানের কথা ভেবেছি, অন্তত একটা কোনো নেশার কথা। নিশিতে নেশা ছাড়া বসে থাকা খুব একটা জমে উঠবে না। সিগারেট আমি খেতাম কৈশোরে, বয়ঃসন্ধির অনেক মুহূর্তে। যা হয়ে থাকে। শুরু হয়েছিল স্কুলের ছুটির শেষে। এক বিখ্যাত অভিনেতার পুত্র আমাকে স্কুলের পাশের একটা গলির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে হাতে তুলে দিয়েছিল জ্বলন্ত সিগারেট—'আমি বলছি কিচ্ছু হবে না, কেউ দেখছে না, তুই টান।' তার সরল কমনীয় চেহারার সঙ্গে এই দৃঢ় কণ্ঠস্বর যুক্ত হয়ে তাকে খুবই প্রভাবশালী করে তুলেছিল। আমি যে কী কষ্টে কতটা গ্লানি নিয়ে তার কথা মান্য করেছিলাম তা আমার আজও মনে আছে। মনে আছে বাড়ি ফেরার আগে সেদিন আমি অনেক কিছু মুখে নিয়ে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কিন্তু দ্বিধা এবং অপবিত্রতাবোধ যা-কিছু সেই একদিনই। তারপর থেকে অতি সহজেই তামাকে অগ্নিসংযোগ বারবার ঘটেছে। ধূমপানের সমর্থনে নানা রঙের যুক্তিও সংগ্রহ করে ফেলেছিলাম। কোন্ মহাপুরুষ সিগারেট খেতে-খেতে বলেছিলেন সিগারেট খাওয়া দাঁত আর মাড়ির পক্ষে উপকারী, পল্লীর কোন্-কোন্ সুন্দরী ধূমপানরত ছেলেদের অস্বস্তিদায়ক না ভেবে অপরিহার্য মনে করে, আমি সবই কণ্ঠস্থ করে রেখে-ছিলাম তখন। কিন্তু ধোঁয়া ভিতরে নিতাম না। মুখের মধ্যে কয়েক সেকেনড রেখে সবই বের করে দিতাম। ফলে আমার সিগারেট খাওয়ার মধ্যে এমন একটা অসহায় কৌতুক ফুটে উঠত যা অনেকেরই উপভোগের বিষয় ছিল। কোনো এক অংশুমান বৃদ্ধের মুখে শহরের নানা গল্প শুনতে-শুনতে এও শুনেছিলাম এমন সিগারেট আছে যা জ্বালালে বহুদূরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পাড়া আর বেপাড়ার বহু দোকানে সেই সুগন্ধ সিগারেটের খোঁজে আমার অনেক বিকেল কেটেছে। বহু স্মিত হাসির বহু বিকাশ দেখে-দেখে একদিন পরাজয় বরণ করলাম। সত্যিই তো সিগারেট আমার কাছে কোনো মাদকদ্রব্য নয়, তা আমার একটা মুদ্রাদোষ। আরও আবিষ্কার করলাম সুগন্ধ সিগারেটের সন্ধানে রত থাকার মানে আমি মুখে জ্বলন্ত ধূপ রাখার কথা ভাবছি। এই আবিষ্কারের পরক্ষণেই ত্যাগ করি সিগারেট এবং ধরি ধূপ। আজও শ্রেষ্ঠ ধূপের সন্ধানে পাড়া আর বেপাড়া ছাড়িয়ে যদি বেশ খানিকটা দূরে যেতে হয় তাতে কষ্ট থাকলেও ক্লান্তি থাকে না। এই তো সেদিন শুনলাম এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা খালের পারে কয়েকটি শিক্ষিত ছেলেমেয়ে মিলে চন্দনের ধূপ তৈরি করছে। আমি খবর পেয়ে ছুপুরের শেষেই ছুটে গেছি। তাঁতের-শাড়ি-পরা সুশ্রী মেয়ে খালের সমস্ত অপরিচ্ছন্নতা ভুলিয়ে দিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছে চন্দনের সংকলন। সেই সংকলন এখনও শেষ হয় নি। আমার ঘরে এখন যে-দুটি কাঠি জ্বলছে তা সেই সংকলনের অংশ। সত্যিই স্বল্পমূল্যে এই রাতের ঘরে অমূল্য গন্ধের স্পর্শ এসেছে। ঘরেরও পরিবর্তন হয়। সে একটি সত্তা থেকে আর-একটি সত্তায় মিশে গিয়ে একেবারে অঙ্গগন্ধ হয়ে যায়।

আজকাল এই ঘর আমার, অপর্ণার আর জয়ের। কয়েক বছর আগে ছিল আমার আর অপর্ণার।

আমার আর অপর্ণার আগে এই ঘর যাঁর ছিল তিনি পিসিমা। ঠাকুরদার প্রথম পক্ষের কন্যা। নব্বইয়ের পরে পৃথিবী ছেড়েছেন। কিন্তু বিয়ে হয়েছিল ন মাস বয়সে। অপর্ণা বিশ্বাস করতে চায় নি। তার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ন মাসের একটি শিশুকে থালার ওপর বসিয়ে ন বছরের একটি ছেলের সঙ্গে পরিণীত করার কাজ। এই বিবাহের কয়েক বছর বাদে ছেলেটির মৃত্যু ঘটে। তখন থেকেই পিসিমার নামের পাশে তিন অক্ষরের যে শব্দটিকে অক্ষয় করে রাখা হয় তা হল—বিধবা। পিসিমাকে আমি বহুবার হো-হো করে হেসে উঠে বলতে শুনেছি—আমি যদি বিধবা হই তবে চিরকুমারী কে? পিসিমার মৃত্যুর পর আমি বেশ কিছুদিন ধরে পৃথিবীর যে-কোনো পাত্রে একটি উপবিষ্ট শিশুকন্যাকে কাঁদতে দেখেছি। আমাদের পরিবারে পিসিমার ভূমিকা কে পরিমাপ করতে যাবে? পিসিমার মা মারা গেলে ঠাকুরদা তাঁর প্রথম স্ত্রীকে হারিয়ে একটু দিশেহারা হয়ে পড়েন। কারণ তাঁর সামনে সন্তান বলতে অষ্টাদশী এক বিধবা ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি যাবার আগে পুত্রের মুখ দেখতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। প্রবীণ পিতার মনোবাসনাকে রূপ দিতে কন্যা একনিষ্ঠভাবে পাত্রীর খোঁজ করতে শুরু করেন। আর পাত্রী নির্বাচন করে বাবাকে বিবাহে রাজি করাতে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। পাত্রী তাঁরই সমবয়স্ক। এই পাত্রী আমাদের ঠাকুমা, পিসিমার নতুন মা। নতুন মা থেকেই আমাদের বংশ শাখা বিস্তার করে চলেছে।

আমি সজ্ঞানে পিসিমাকে যখন থেকে দেখতে শুরু করি তখন তিনি সত্তর পার হয়ে গেছেন। কিন্তু রঙ তখনও সমুন্নত। চোখেমুখে ৬টুট ব্রহ্মচর্যের ছাপ। তখন চুল ছোটো করে পুরুষের ছাঁটে এনে ফেলেছেন। এমন এক লজ্জা বজায় রেখে হাসতে পারেন যাকে আধুনিক অর্থে ব্রীড়া বলে। তিনি আমাকে মাঝে-মাঝেই গঙ্গাসাগরের গল্প শোনাতেন। তিনি তাঁর যৌবনে কয়েকজন বিধবার সঙ্গে বড়ো নৌকোয় বসে দিনের পর দিন কাটিয়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছেছিলেন। তাঁর কাহিনীর মধ্যে পথের যেসব দুর্গমতা ফুটে উঠত তা ঠিক রোমাঞ্চকর সব অভিযানের মতো আধুনিক। গঙ্গাসাগর কাহিনীটিকে তিনি যখনই শোনাতেন তার মধ্যে ঢেলে দিতেন একটি সিদ্ধির সমস্ত লাবণ্য। আজ আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তাঁর যৌবনের সেই গঙ্গাসাগরযাত্রা তাঁর পতিগৃহযাত্রারই একটি রূপ হয়ে উঠেছিল।

পিসিমার রূপের খ্যাতি তাঁর রন্ধনের খ্যাতিকে ছাড়াতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। শোনা যায়, এই রূপবতী যুবতী একসময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর দলবল নিয়ে নানা শুভ অনুষ্ঠানের রান্না রাঁধতে চলে যেতেন। তাঁর গতি আর শক্তিকে শ্রদ্ধা জানাত গতিময় এবং শক্তিময় পুরুষেরা। কিন্তু আমার বয়ঃসন্ধির দিনগুলিতে পিসিমা সূর্যাস্তের পর তাঁর ঘরের চৌকিতে উঠে একেবারে স্থাণু হয়ে যেতেন। শত প্রয়োজনেও তাঁকে আর কেউ নেমে আসতে দেখতে পেত না। সেই সংকীর্ণ চৌকিতে কখনও শুয়ে কখনও বসে তিনি শত-শত তুচ্ছ কাহিনী সমান মমতায় আগ্রহী শ্রোতাকে শুনিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতেন। আমি সেই ক্ষমতার সাক্ষী বহুবার হয়েছি। কখনও কখনও চৌকির একপাশে অতিকষ্টে বসে সত্যিই মন দিয়ে শুনতাম তাঁর নানারকম ফলবৃক্ষের অফুরন্ত দান, তাঁর দু-একটি গোরুর স্নেহময়ী প্রকৃতি, স্বাধীনতা সংগ্রামে একদল বিধবাকে পিছনে নিয়ে পতাকা হাতে তাঁর গ্রামের কয়েকটি পথ পরিক্রমণ। আঁতুড়ঘরের মধ্যে ধাত্রীরূপে তাঁর বহু সাফল্যের খবর—ওরে আমি যে তোর মায়ের আঁতুড়ঘরেও ছিলাম।—তাঁর এই কথায় একটি অন্য ধরনের গরিমা হত আমার। আমি কোনো হাসপাতালে হই নি। আমার নানা সম্পর্কের অনেক ভাইবোন হাসপাতালের বাতাসে প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েছে। আজও জানি না কেন ঠিক আমার সময়েই দেশের

মাটির ঘর বেছে নেওয়া হল।

গ্রীষ্মের সন্ধেরাতগুলিতে পিসিমা অনেক সময় হাতপাখা তুলে নিয়ে বুকের কাপড় সরিয়ে হাওয়া খেতেন। অনেক সময় হাওয়া খেতে-খেতে তিনি যেন একটু অস্থির হয়ে আমাকে বলে ফেলতেন—তুই এখন যা তো।—আজ আর বুদ্ধার বুক বলে কিছু নেই। শুধু নেমে এসেছে মাংসের দুটি ঘন শৈথিল্য।—পিসিমা, তোমার বুকের কী অবস্থা হয়েছে।—এই বিস্ময় প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে আমার দুটি হাত সেই শৈথিল্যপিণ্ডে গাঢ় হয়ে নেমে যেত। আবার পিসিমার অস্থিরতা—তুই এখন যা তো।—কিন্তু চলে যাবার বদলে আমি তাঁর বুক থেকে আর-একটু নীচে নেমে যেতাম। পিসীমা আরো বেগে পাখা নাড়তে শুরু করতেন। আমি আরও নীচে নেমে গিয়ে বিস্ময়ের ভাব রাখতাম—কী অবস্থা হয়েছে! বিরাট ঢুটো হাড় ছাড়া কোনরে কিছু নেই।—এইবার পিসিমার মুখে নিজস্ব এক ব্রীড়ার উপস্থিতি টের পেতাম। টের পেতাম পিসিমা এবার সতর্ক আমি যাতে আরও নিম্নাভিমুখী না হতে পারি।—তুই এখন ওঠ তো, একটু বাইরে থেকে বেড়িয়ে আয়।—এবার আমার না উঠে আর উপায় ছিল না। আমি চৌকি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে জলের প্রয়োজন অনুভব করতাম। জলই বহতা এবং জল পবিত্রতাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে আমার তখন যে স্নান ঘটত তারই মধ্যে আরোগ্যনিতেন ছিল। এর বহু বছর বাদে, এই তো সেদিন, খুব উজ্জ্বল ছাপার পৃষ্ঠায় পড়লাম, জেসুট শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে মাতা মেরীর মর্মরমূর্তির সামনে ছাত্রদের গোপনতম নিঃসরণ ঘটছে।

পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগেও পিসিমা আমাদের এই ঘরে তাঁর নিজস্ব ব্রীড়া রেখে গেছেন। তিনি বরাবরই মৃত্যু সম্পর্কে নিঃশঙ্ক ছিলেন। বরং তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থার আলোচনায় তাঁর উৎসাহ খুব বেশি ছিল। তাঁর সৎকার যেন বৈদ্যুতিক চুল্লিতে না হয় এমন একটি নির্দেশ উচ্চারণ করতে তাঁকে বহুবার দেখা গেছে। মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগে এই ঘরে সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি। অন্তিম কষ্টের শেষ প্রহর চলেছে। হঠাৎ কী যে খেয়াল হল, বলে ফেললাম—কেমন আছ, পিসিমা? সেই মৃত্যুক্লিষ্ট মুখে ধীরে-ধীরে বহুদূর থেকে আসা লজ্জাঘেরা যে হাসি ফুটে উঠল তা আমার অক্ষয় স্মৃতি হয়েছে।

শ্মশানেও ভেদ আছে, সেখানেও শ্রেণীযুদ্ধ চলে। শ্মশানে বিস্তীর্ণ সমভূমির এক কোণে উচ্চভূমি আছে। সমভূমিতে বেশ কয়েকটি গর্ত, বেশ কয়েকটি চিতাক্ষেত্র। আর উচ্চভূমি বা বেদিতে কেবলমাত্র দুটি চিতাক্ষেত্র। বেদিতে দাহ করতে গেলে কিছুটা প্রতিপত্তি চাই। বহু বছর ধরে শ্মশানের কাছাকাছি বাস করার সুবাদে আমরা পিসিমার জন্য বেদির চিতাক্ষেত্র নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলাম। সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে পিসিমা চলে গিয়েছিলেন। তখন রোদ্দুর খুব তাড়াতাড়ি সহিংস হচ্ছে। পিচগলা রাস্তায় খালিপায়ে চলার সাহস আমাদের পরিচিত কারও ছিল না। আমরা বেলাশেষের অপেক্ষা করেছিলাম। এই অপেক্ষার মধ্যে কোন বিচলন ছিল না। শুধু মেয়েরা পাউডারের গুঁড়ো আর সুগন্ধ ঢেলে-ঢেলে দেহটিকে অচ্যুত রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ঠিক বেলাশেষে সামান্য হরিধ্বনি আর ছোটো একটি স্বজনগোষ্ঠীর দৌলতে পিসিমা পথে নামলেন। বিদ্যুৎ-চুল্লির পাশ দিয়ে যাবার সময় কেউ-কেউ বলে উঠলেন—ইলেকট্রিকে পোড়ানো অনেক ভালো। ঝামেলা কম, খরচ কম। এখানেই নামাও।—কিন্তু তখনও আমার কানে বাজছিল সেই ছোট্ট বাক্য—আমাকে কাঠে দিবি। দিবি তো? ফলে আমরা কোনোদিকে না তাকিয়ে কাঠের শ্মশানে পৌঁছলাম।

এই কাঠের শ্মশানে একবার এক বুড়ি জেগে উঠেছিল। তাকে তার লোকজনেরা জানি না কিভাবে নিয়ে এসে চিতায় তুলে দিয়ে আগুন দিতে যাবে, সে হঠাৎ চোখ মেলে বলে উঠল—জল, জল খাব। চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। বুড়িকে দেখার জন্য

শহরের লোক ভেঙে পড়েছিল। শ্মশানে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে সে আবার কী করে ঘরে ফিরে যাবে? তবে তো প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। তবে তো সৃষ্টি হয় বড়ো রকমের ভাবসংকট। এইসব যুক্তির সাহায্যে শ্মশানের পাশে এক বাঁধানো চাতালে বুড়ির জন্য ঘর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পিসিমা আমাকে নিয়ে এই বুড়িকে দর্শন করতে এসেছিলেন। আমার ভালো করে কিছুই মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে আছে, ভিড় ঠেলে বহুকষ্টে একটা গণ্ডির সামনে এসে দাঁড়িয়ে এক সাধারণ চেহারার বুড়িকে গণ্ডির মধ্যে খাটের ওপর বসে থাকতে দেখেছিলাম এবং তার মুখে লেগে ছিল সরু সুতোর মতো হাসি।

আমি জানতাম পিসিমার মৃত্যুর মধ্যে কোনো লুকোচুরি নেই। তিনি সবার মাঝখানে শুয়ে সবার মাঝখান দিয়ে ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেছেন। তবু ডোমেদের অপরিসীম সব অন্যায় আবদারের ভিতর দিয়ে গিয়ে যখন একসময় চিতা সজ্জিত করে পিসিমাকে ধীরে-ধীরে তুলে দিয়ে অগ্নিসংযোগের উপক্রম করা হচ্ছে আমি লহমার জন্য আশা করে-ছিলাম পিসিমা বুড়ির অনুগামী হবেন। কিন্তু কোনো বাধা নেই। সব স্থির, সব নির্বাক। মুখাগ্নি করার জন্য আমার অনুজ উঠে দাঁড়িয়েছে। পিসিমা তাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন। আগুন কত সহজেই পিসিমার সর্বত্র নেচে-নেচে ঢুকে যাচ্ছে। আমি তাঁর কোমর পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ পিসিমা সতর্ক হয়েছিলেন। এখন তো সতর্কতার কোনো প্রশ্ন নেই। এখন আছে আগুনের সর্বাত্মক আলিঙ্গন। এই প্রথম বিশ্বাস করতে চাইলাম পিসিমার বিবাহ হচ্ছে। অগ্নির মতো শতমুখ স্বামী পেয়ে তাঁর আর কোনো অভিযোগ নেই। তিনি নিবেদিতা।

চিতা ভালোভাবে ধরে গেলে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। আমাদের ছোটো দলটি নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কেউ-কেউ এদিক-ওদিক ঘুরতে চলে গেল। কেউ-কেউ ঘরে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল—আসি নালীক, বাড়ি খালি ফেলে রেখে চলে এসেছি। কাল-পরশু একবার আসব। আমরা কজন চিতার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। আমি, আমার ভাই, ভাইয়ের বন্ধু সুদিন। কেউ এসে একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ল। কে? তাকিয়ে দেখি দীপন। পদ্মাসনে বসে পড়েছে। চোখ বন্ধ। নাকে নস্যি লেগে আছে। দীপন আমাদের পাশের পাড়ার ছেলে। ওর বাবা তিনবার এম. এ. হয়েছেন। অধ্যাপক। অধ্যাপনার খ্যাতি আছে। কিন্তু দীপনকে তিনি স্কুলের সীমানা পার করাতে পারেন নি। কিছুদিন হল দীপন বাড়িতে খুব কম থাকে। সে তার ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ায়। তাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে—কী করছ দীপন?—সে সঙ্গে-সঙ্গে একটিই উত্তর দিয়ে থাকে—আমি সুশিক্ষিত নই, আমি স্বশিক্ষিত।—তাকে পাগল বলার সাহস দেখেছি অনেকেরই আছে, কিন্তু আমার একটুও নেই। সেই ধুতিপরা, খোলাবুক, পৈতেধারী, খালি পায়ের যুবকটিকে আমি কোনো-কোনো সন্ধ্যায় গানের মধ্যে দেখেছি। তার গলায় এমন একটা সংস্কারমুক্ত বিস্তার আছে যা বন্দিত গলাগুলিতে আমি পাই নি। দীপন পাশে এসে বসায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম। সে প্রথমে ধরল—ভেবে ছাখ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম এই ভূমণ্ডলে। তাকে কোনো অনুরোধ করতে হল না। একটির পর একটি গান গেয়ে আমরা যারা নাভির অপেক্ষায় বসে আছি সে তাদের শান্ত করে দিয়ে উঠে গেল। আর তখনই লক্ষ করলাম অপর্ণা এসে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে তার বোন শোণিমা।

চিতায় জল ঢালার সময় হল। যারা এদিক-ওদিক ঘুরতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরে এসেছে। কাদার মধ্যে নেমে কলসী ভরে জল এনে কয়েকবার চিতায় ঢালার কাজটা কিন্তু খুব একটা সহজ নয়, খুব একটা সুখেরও নয়। আমার ভাই কলসী নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গার দিকে; এটা বুবুনের প্রেরণার

কাজ। কিন্তু সে সুদিনের কাছ থেকে বাধা পেল। তার হাত থেকে কলসী প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সুদিন ছুটল। সেদিন তারই আনা জলে চিতার সর্বশেষ অংশ বারে-বারে ভিজে উঠেছে।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে দেখি এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সংকটের চিহ্ন প্রবল। কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর ডাইনে-বাঁয়ে কারও না কারও বাড়ি এসে যায়। সবার আগে অপর্ণাদের বাড়ি। তারা দলচ্যুত হল। তারপর সুদিনের কাকার বাড়ি। ডানদিকের পুরোনো দোতলায় সুদিন সংকোচে ঢুকে গেল। তারপর ডাইনে-বাঁয়ে আরও কয়েকজন। শেষ পর্যন্ত শ্মশান-প্রত্যাগত দলের সদস্য বলতে রইল দুজন—আমি আর বুবুন। আমাদের বাড়ির সদর দরজা মা ইচ্ছে করেই বন্ধ করে রেখেছে। গলি পার হয়ে পেছন দিক দিয়ে ঢুকতে হবে। অত্যন্ত অন্ধকার। মা লোহা আগুন নিয়ে কলতলায় দাঁড়িয়ে। বাবা বারান্দায়, হাতে মিষ্টি। আমরা শেষ পর্যন্ত দুজন ফিরেছি। আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে দুজন—জামাকাপড় সব উঠোনে ছেড়ে রাখ।—একটিমাত্র উত্তোলিত হ্যারিকেনের আলোর পাশে মায়ের এই শান্ত নির্দেশ অন্ধকারকে কিভাবে যেন নতুন অবয়বে পৌঁছে দিয়েছিল। আমরা সেই অবয়ব ছুঁয়ে-ছুঁয়ে স্নান করে নিলাম।

স্নানের পর পিসিমার ঘরে যাই। ঘরের মাঝখানে জলচৌকির ওপর প্রদীপ জ্বলছে। ঘর মুণ্ডিত হয়েছে। একটি বেশ বড়ো রকমের শূন্যতাকে বিরাজ করার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আমি জানি এই কৃতিত্বের অংশমাত্র মায়ের, আর বাকিটাই বলতে গেলে শোভার। পাশের বস্তির উদ্বাস্ত মেয়েটি সারাদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সন্ধেবেলায় চলে যেত। দৈনন্দিন কাজকর্মে তাকে যে খুব একটা পটু বলা যেত তা নয়। বরং বাসনমাজার পর মা অনেক সময় বাসনের কোণে ভুক্তাবশেষ খুঁজে পেতেন। ঘর কুড়িয়ে যাবার পর ঘরে আমিও অনেক দিন ময়লা অনুভব করেছি। একটু অন্যমনস্ক শোভা প্রাত্যহিক কাজে যতটা গাফিলতি দেখাত, গতানুগতিকে যতটা ম্লান ছিল, ঠিক ততটাই নিপুণ, ঠিক ততটাই উজ্জ্বল ছিল স্বতন্ত্র সব কর্মে। তাকে বদি বলা হত—শোভা, আজ তুমি দাদাবাবুর বইয়ের আলমারি গোছাতে পারবে? তোমাকে আজ অন্য কোনো কাজ করতে হবে না।—সে একগাল হেসে সম্মতি জানাত।

—নালীক, তুই শুধু একটু দেখিয়ে দে কী করে গোছাতে হবে। মায়ের ইঙ্গিতে আমি শোভাকে বইয়ের সেই স্তম্ভের সামনে ডাকি। ছটা তাকের মধ্যে আমি হয়তো ছ রকমের বই রাখতে চাই। আমি "মাদাম বোভারী"র পাশে "পথের পাঁচালী"কে রাখব। ব্লেকের কবিতার পাশে জয়েসের গল্প রাখব না। "সাবিত্রী"-কে রাখব রামায়ণ-মহাভারতের পাশেই। "দিবারাত্রির কাব্য"-কে ঠিক উপন্যাসের তাকে না রেখে হয়তো "ছিন্নপত্র" যেখানে আছে তার গা ঘেঁষে রাখতে চাইব। বইয়ের আলমারিতে যে বিন্যাস রয়েছে তাকে ভেঙে নতুন বিন্যাসের যে ভাবনা তা শোভার পাশে দাঁড়িয়ে আরও একবার ভেবে নিয়ে আমি ওকে সবকিছু দেখিয়ে দিলাম। আর শোভা সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পরম মমতায় প্রতিটি বই ঝেড়েমুছে সংস্থাপিত করে গেল।

বাড়ি ফিরে দিনের শেষে দেখলাম যা চেয়েছি আলমারির স্তরে-স্তরে সেটাই পাওয়া যাচ্ছে। এখন "মহাস্থবির জাতক" খুঁজতে আমি আর উপন্যাসের তাকে ঝুঁকে পড়ব না। "আত্মচরিত" কিংবা "আমার জীবন", না হলে বড়ো জোর "ওয়ার্ডস"-এর পাশেই তার দেখা পেয়ে যাব। যথাস্থানে বই না পেলে সত্যিই অসহায় লাগে। যথাস্থানে বই পেয়ে যাওয়ার ঘটনা কারো জীবনেই খুব একটা ঘটে না। এমনিতেই বই এমন একটা জিনিস যার অঙ্গে মহাকালের তাপ এবং ছাপ বেশ ভালোভাবেই ফুটে ওঠে। এমন অনেকদিন গেছে গ্রন্থনিবাসের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। এ কী, তাক থেকে প্রিয় বই

তুলে নিয়ে দেখি তার শরীরের গোপন সব পর্বে পোকার কীর্তি। খুব যে অযত্ন করেছি তা তো নয়। স্বাভাবিক যত্নের তেমন কোনো অভাব ছিল বলে মনে তো পড়ে না। কেউ বলেছে নিমের পাতা ছড়িয়ে দাও। দিয়েছি। কেউ বলেছে ন্যাপথালিনে কাজ হয়। প্যাকেট থেকে ধবলতম সব গুলি বের করে বইয়ের অনেক অলিগলিতে ছুঁড়ে দিয়েছি। তবু দেখেছি বিবর্ণতা এবং বিদীর্ণতা এক-একটি উজ্জ্বল মলাটের মধ্য দিয়ে বয়ে-বয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত চলে গেছে। তখনই তো প্রশ্ন জাগে এত যে সব বই লেখা হচ্ছে, এত যে সব বই বেরোচ্ছে, এত যে সব বই পাওয়া যাচ্ছে, এত যে সব বই কেনা হচ্ছে প্রত্যেকেরই কপালে জরাজীর্ণ হবার প্রবল সব যোগ? তারই মাঝে যখন একটা দৃশ্যের প্রয়োজনে একটা বইয়ের খোঁজ পড়ে, একটা স্মৃতির সমর্থনে একটা কবিতাকে দেখে না নিলে চলে না, একটা অভিমানের প্রসারে একটা শব্দের সাহায্য পরমাত্মীয়ের মতো হতে চায়, তখন বই খুঁজতে গিয়ে যথাস্থানে না পাওয়া গেলে যে গ্লানি জন্মায় অন্তত কিছুদিনের জন্য শোভা তার কবল থেকে আমাকে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। অন্যরকম কাজ বলতে যদি এক মাইল দূরের আত্মীয়ার বাড়ি থেকে বড়ো গঙ্গার স্বচ্ছ জল নিয়ে আসাকে বোঝানো হয় তবে সেই কাজেও শোভার মতো সমৃদ্ধ আর কে ছিল? শোভা যাবার সময় ট্রামে যেত। গঙ্গাজল দুটি বোতলে ভরে নিয়ে আসার সময় সে আর ট্রামে উঠত না। এই কাজটার মধ্যে সে একটা পবিত্রতার স্পর্শ পেত। দুহাতে দুটি বোতল নিয়ে তাকে হেঁটে-হেঁটে আমাদের বাড়ির দিকে চলে যেতে আমিও দু-একবার ট্রামের জানলা দিয়ে দেখেছি। শোভা কেন চলে গেল তার অর্থ আমি আজও বুঝতে পারি না। তার দৈনন্দিন কর্ম পরিষ্কার না হলেও মা তার প্রতি সদয় ছিলেন। কখনও-কখনও তার জন্য মায়ের যে অপেক্ষা তার মধ্য থেকে ফুটে বেরোত অপত্যস্নেহ। মাঝে-মাঝে আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না কে কার সেবা করছে। কারণ শোভার সেবার পাশাপাশি মায়েরও এমন সব উদার, অদ্ভুত প্রশ্রয় ধরা পড়ত যাতে মনে হত মা শুধু কৃতজ্ঞ নন, মাও সেবার মধ্যে রয়েছেন। পিসিমার ঘরের সমস্ত জিনিস-পত্র সরিয়ে ঘর ভালো করে ধুয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে যাবার পর শোভা আর বেশিদিন আমাদের বাড়িতে ছিল না। মার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে যা কথা হয়েছে তার থেকে কিছু বোঝা যায় না। মা বলেছিলেন—তোরা বিয়ে না করলে শোভা আর কাজ করবে না।

জয়কে নিয়ে সমস্ত বাড়ি অস্থির। অস্থিরতা সামলাতে গিয়ে অপর্ণা যা-যা করে তা যে-কোনো আধুনিক মহিলাই করে থাকে। তাকে নানাভাবে ভোলানো, তাকে বকাঝকা, তার ঘড়ি ধরে সেবা করা এবং তাকে নিয়ে বিকেলে বাইরে বেরোনো এবং এর সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে তাকে স্কুলে দিয়ে আসা এবং নিয়ে আসা। তবে একটা বাঁচোয়া—স্কুলটা প্রতিবেশী দূরত্বে। সত্যিই বাড়ি থেকে ঢিল ছুঁড়লে স্কুলের ছাদে গিয়ে পড়বে।

কেন আপনি আমাদের স্কুল সম্পর্কে উৎসাহী? —জয়ের ইনটারভিউয়ের সময় আমাকে এই কথাটির উত্তর দিতে হয়েছিল। আমিও স্কুলের সব গুণাবলীর মধ্যে না গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে বলে ফেলেছিলাম—স্কুলটা যে বাড়ির খুবই কাছে।—চোখা-চোখা জবাব দেবার ক্ষমতা আমার কিন্তু কোনো দিনও নেই। এবারে যে ছিল সেটা আমার নিজস্ব নয়। একটা বড়ো বসার ঘরে রবিবারের সকালে বসে এক প্রভাবশালী সুন্দরী আমাকে বারবার শিখিয়ে দিয়ে-ছিলেন।—যা যা বললাম সেগুলো ছেলেকে একটু শেখাবেন। আর ভুলে যাবেন না যেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করুক বা না করুক, স্কুল যে আপনার পাড়ায় সে কথাটা কিন্তু ওদের শুনিয়ে দেবেন।—আমার ভাগ্য ভালো, কথাটা জিজ্ঞাসার উত্তরে শোনাতে পেরেছিলাম। না হলে নির্ঘাত একটা গুরুত্বকে মূল্য দিতে গিয়ে আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হত।

এমনিতে তো জয় দু-একটা গুরুচণ্ডালীর সৃষ্টি করে ফেলেছিল। একটি ফুল দেখিয়ে জয়ের কাছে ইংরেজিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল সেটা কী বস্তু। জয় সেদিনও অপর্ণার খোঁপায় ফুলটিকে দেখেছে, তার পরিচয় জেনেছে। তার মায়ের খোঁপায় দেখা ওই ফুলের অবস্থানটির কথাই তার নিশ্চয়ই মনে পড়েছিল; নিশ্চয়ই মনে পড়ে নি ছবির বইতে দেখা ওই ফুলের অবস্থান। তা না হলে সে কেন টেবিলের ওপারে তার মায়ের সমবয়সী দুজন শাণিত যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল—'গোলাপ'? জিজ্ঞাসিত না হয়ে আমি যদি গোলাপের পরেই তাদের জানিয়ে দিতাম—আমরা কিন্তু আপনাদের খুব কাছে থাকি—তবে সেটা কতদূর সভ্য হত জানি না। আজ শোভা থাকলে সুসজ্জিত জয়ের হাত ধরে স্কুলের দরজায় যাওয়া এবং বাড়ি ফিরে আসার কাজটাকে বইয়ের আলমারি সাজানো অথবা বোতল ভরে গঙ্গাজল নিয়ে আসার সমধর্মী একটি কাজ বলেই যে সে গ্রহণ করত এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। শোভা জয়ের জন্য কিছু সময় দিলে অপর্ণার তহবিলে যে সময় জমা পড়ত তার দ্বারা সে অন্তত তার দেয়ালে টাঙানো তানপুরার ধুলো ঝেড়ে আবার টাঙিয়ে রাখতে পারত। তার বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারত বহু দিন আগে নিয়ে যাওয়া তারই তবলার খোঁজ। কিংবা আমাকে অফিসে যাবার মুখে শুনিয়ে দিতে পারত জয়ের নতুন দেখা দু-একটা স্বপ্নদৃশ্য, দু-একটা শব্দবন্ধন। অপর্ণা আমাকে বলে নি, আমি সেদিন নিজেই শুনলাম দু-একটি কথা। অপর্ণা জয়কে স্নান করাচ্ছে। কখনও-কখনও শরীর বুঝে দিনের আবহাওয়া বুঝে জয়ের ঠাণ্ডা জলের সবুজ গামলার পাশে গরম জলের লাল গামলা রাখা হয়। সেদিনও তেমন কিছু ছিল। হয়তো অপর্ণা সবুজের মধ্যে ঢেলে দিতে চাইছিল লালের খানিকটা। তাদের কোনো সংলাপেই আমার কান ঠিক ছিল না। কিন্তু দু-একটা শব্দবন্ধন বেশ জোরে উচ্চারিত হচ্ছিল। আমি হঠাৎ শুনলাম জয়কে সমর্থন করে অপর্ণা বলছে—ঠিক বলেছ। ওটা ভালো গরম, আর এটা বিষাক্ত ঠাণ্ডা। —সত্যি বলছি বহু ঠাণ্ডার বর্ণনা পড়েছি, নিজেও ভেবেছি বহু ঠাণ্ডার কথা, কিন্তু 'বিষাক্ত ঠাণ্ডা' আমার কাছে নতুন। একদিন জয় নিজেই ঘুম থেকে উঠে বিছানা থেকে না উঠে আমাকে বলল—বাবা, আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি।

—কী স্বপ্ন দেখেছ? আমাকে বলবে না?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম তুমি মরে গেছ। আমি কাঁদছি, মা কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, দাদু কাঁদছে, দিদি কাঁদছে। তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

—খুব ভালো স্বপ্ন দেখেছো, খুব ভালো স্বপ্ন।

—অপর্ণা ছুটে এসেছিল।—কার স্বপ্নের কথা বলছ? কে স্বপ্ন দেখেছে?

—তোমার ছেলে স্বপ্ন দেখেছে আমি মরে গেছি। আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তুমি কাঁদছ, ও কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, সবাই কাঁদছে।

—বিচ্ছিরি বাজে স্বপ্ন। মা শোনো, তোমার নাতি স্বপ্ন দেখেছে।

মা উনুনের পাশ থেকে ছুটে এলেন।—কী স্বপ্ন? সোনা, কী স্বপ্ন দেখেছ?

মা স্বপ্নদৃশ্য শুনে নিজেকেই সব থেকে বেশি আশ্বস্ত করলেন।—খারাপ কোথায়! ভালো স্বপ্ন। নিজেরটা দেখলে পরের হয়।

বাবা পাশের ঘরে খবরের কাগজে আবদ্ধ। বুবুন বাড়ি আছে কিনা জানি না। জানি এই স্বপ্নদৃশ্য এবার বাবার চোখের সামনে ধরা হবে, বুবুনের চোখের সামনে ধরা হবে। জয়ের দেখা স্বপ্নদৃশ্যে প্লাবিত হয়ে যাবে এই বাড়ি। শোভা থাকলে স্বপ্নদৃশ্যে একটি নাম নির্ঘাত যোজিত হত। কারণ জয় কাউকে বাদ দিতে চায় না। সে সবাইকে রাখতে চায় বলে সে বলতই—আমি কাঁদছি, মা কাঁদছে, কাকা কাঁদছে, দাদু কাঁদছে, দিদি কাঁদছে, আর শোভাপিসি কাঁদছে।

শোভা চলে যাবার কয়েক মাস বাদে আমি

বুঝতে পারি একটা নীরব প্রস্তুতি চলছে। মামাদের রবিবারের বিকেলে মার ঘরে উপস্থিত হতে দেখা যাচ্ছে। দু-একজন মোটা-মোটা সাদা-সাদা বিধবা বাবা-মার সঙ্গে নীচু স্বরে কথা বলে উঠে যাচ্ছে। আমার কোনো-কোনো বন্ধুকে মা অসময়ে ডেকে পাঠাচ্ছেন। তাদের হাত থেকে আমি মাঝে-মাঝে ছবি পাচ্ছি। কেউ গাছে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। কেউ মুখে হাত রেখে অন্যমনস্ক। কেউ সকলের মাঝখানে বসে একা হবার চেষ্টা করেছে। আমি বন্ধুদের হাতে ছবি ফিরিয়ে দিয়ে চুপ থাকছি। একদিন মা সরাসরি আমার কাছে চলে এলেন—তোর কাউকে পছন্দ হল না?

এই প্রশ্নের একটিমাত্র জবাব আমার জানা ছিল। —তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সময়মতো আমি তোমাকে ঠিক জানাব।

মা কী বুঝলেন জানি না। কারণ আমার কথার মধ্যে কোনো সংকেত ছিল না। আমি শুধু অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম। এর পর থেকে মামাদের আনা-গোনা খুব কমে গেল। সক্রিয় বিধবাদের আমি আর দেখতেই পেলাম না। এক অভিমানশাসিত মৌনের মধ্যে মা যেন চলে যেতে চাইলেন। [ক্রমশ

বেলাশেষের তান

অমলেন্দু মিত্র

ছিরু ডোম। চেহারাটা তার বড়ো জমকালো ছিল। কুচকুচে কালো। মস্ত একজোড়া গোঁফ। বলিষ্ঠ শরীর। বাঁশ-বেতের কাজে তার জুড়ি ছিল না। কাজ করত যেমন তাড়াতাড়ি, তেমনি পরিচ্ছন্ন। কালের নিষ্ঠুর দাগ তার শরীরে আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। অমন তাগড়া যে শরীর, সেটা বাঁশের মতোই নুইয়ে গেছে। ছিল সিধে মেরুদণ্ড। সেটার অর্ধেকটা বেঁকে গেছে। চলনে বলনে স্ফূর্তি নেই। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে। নজর মাটি ছাড়িয়ে সহজে উপরে চলে না। সামনে কেউ দাঁড়ালে অনেক কষ্ট করে, ঝুঁকে-পড়া ঘাড়টা সোজা করতে হয়। পরনে তার শুধুই এক-খানা খাটো ধুতি। গায়ে গেনজি। আর জোটে না হয়তো। গোঁফজোড়া সাদা হয়ে গেছে। রোমশ বুক আর হাতগুলোও সাদা। পল্লীতে তার আর তেমন কদর নেই। সংসারী লোক যতদিন ছিল, যতদিন খাটতে পারত, রোজগার করত সবার চেয়ে বেশি। ততদিন সে ছিল বড়বাবা, মামু, দাদু, বাবা, পিসে, মেসো। কিন্তু আজ আর কেউ নেই। বউ চলে গেছে। যারা মামু, দাদু, বাবা বলত তারাও কে কোন্‌দিকে ছিটকে গেছে, যার ঠিকানা ছিরুর জানা নেই। বাবা ডাকও শুনতে ইচ্ছা করে না ছিরুর। ছেলে বাবা বলে ডাকত, মেয়ে ডাকত। তাদের বুকেপিঠে করে মানুষ করেছে—রোজগার করে পাড়ার সবার চেয়ে ভালো খাবার পেট পুরে খাইয়েছে। ছেলেটা পালাল সারকাস কোমপানির সঙ্গে। আর ফিরল না। মেয়েটা যদি-বা রেঁধে বেড়ে দিত দুটি, কিন্তু পাড়ার অন্য সব মেয়ের মতো পাজি হয়ে গেল। নষ্টি-ফষ্টি করতে-করতে একদিন কার সঙ্গে কোথায় চলে গেল ছিরু জানে না। জানার কোনো কৌতূহলও নেই তার। দু-চার-দিন কেউ-কেউ নানা উড়ো খবর শুনে এসে রসিয়ে-রসিয়ে শোনাতে এসেছিল ছিরুকে। ছিরু গ্রাহ্য করে নি। বলেছে, সারগাড়ায় যাকগো। গেইছে তো বেঁচেছি! খোওয়া বেগরে আর দুদিন পর যেতই। উ যদি থাকত কী খোয়াইতাম শুনি?

কেনে? তুমি এতু রোজকার করেছো?

সি-কি রইলো নাকিরে—উয়োদেরই প্যাটের আগুনে ঢাললাম। বাবারে বাবা! কী লবর-চবর খোওয়া বেটে! মাছ খাইন্‌ছি, মাস খাইন্‌ছি, দো-বেলা পেট ভরে ভাত মুড়ি গিলিন্‌ছি। বেগনি, ঝাল-বড়া, ফুলুরি ছাড়া মুড়িই খেত না কেউ। বুল্‌, তুদের ডুমপাড়ায় এমুন খোওয়া কেউ খেয়েছেক?

আগন্তুক সমঝদারের মতো মাথা নাড়ে; সি যা বুলেছো—সত্তি তুমার পারা কে খোওয়াইতে পেরেছে হিথা! তুমি তো নেশাটেশাও তেমুন কর নাই।

কী লাভ হঁইছে বুলো! আজ গতরটো লটপট করছেক! সাঁঝবিলায় টুসটি মদ খেঁতে জিভটো লালায়, কিন্তুক পয়সা লাই!

তা তুর বেটাটো তো মেলাই টাকা কামাইছে, কুছু দিলে তে. পারত।

হাঁ দিছে! মাগিবাজি করবেক কে তাইলে!

চোখ কুঁচকে গেল। মুখে দারুণ একটা বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল ছিরুর। তেতো, সব তেতো! কতগুলো বছর পার হয়ে গেছে, তার কোনো হিসাব নাই। সামনের তালগাছটা কতটুকু ছিল। ছোটো একটা লগি দিয়ে বাবুদের পাঁচিরে চাপলেই নাগাল পাওয়া যেত। কাঁচা তাল পাড়ত ছেলেবেলায়। আজ সেই গাছটার মাথা কত উঁচুতে উঠে গেছে। কিন্তু কই ওটা তো বুড়ো হয় নি। বেঁকে যায় নি। মাথার পাতাগুলো আজও বর্ষার পর সবুজ রঙ ছড়ায়। নিমগাছটারও কত বয়স হয়েছে। শীতে বুড়ো বুড়ো লাগে। আবার শীত গেলেই কচি-কচি পাতায় জোয়ান হয়ে ওঠে। কিন্তু ছিরু আর জোয়ান হবে না। দিন-দিন সে মিইয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ছিরু। আর এই পল্লীটা! কী-রকম সরগরম ছিল। সস্তার বাজার। যা রোজগার করত তাতে ফেলে ছড়িয়ে খাওয়া চলত। নতুন খড় দিয়ে চাল ছাওয়া হত প্রতিটি বাড়ির। আজ আক্রাগণ্ডার বাজারে কোনো রোজগারেই পেট ভরে না। ফি-বছর চালে নতুন খড় চাপাতে পারে না কেউই। সবারই ঘরে জল পড়ে। ছিরুরও পড়ে। ও জানে আর কোনোদিন ঘর ছাইবার দরকার পড়বে না। ঘরটা আস্তে-আস্তে বৃষ্টির দাপটে বসে যাবে মাটিতে। ছিরুও বসে যাবে চিরদিনের মতো। কী লাভ হল বেঁচে থেকে! কী লাভ হল সংসার পেতে! কেউ তো আপনার হল না!

হঠাৎ খিদেটা চনমন করে উঠল। ট্যাঁকে হাত দিলে অভ্যাসমতো। একটা পোড়া বিড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। হাঁড়িকুড়ি হাটকালে। একদানা চালও পাওয়া গেল না। কী খাবে আজ! ধ্যুৎ, বিরক্তি এসে গেল মনে। বেজার হয়ে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। অভ্যস্ত পথে হেঁটে চলে বাজারের দিকে—যদি কেউ ধার-টার দেয়! কেই-বা দেবে। সবাই জানে ধার শোধ করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু পেটের দাবি সবার আগে।

পাড়া থেকে বেরিয়ে বাজারের পথে পড়ল। গোরুছাগলের পাইকার, রঞ্জু মিঞার সঙ্গে দেখা। তার হাতে দড়িতে বাঁধা দুটো খাসি। অনেক দিনের পরিচয় ওর সঙ্গে। ছিরুর সমবয়সী হবে, কিন্তু এখনও শক্তসমর্থ আছে। ছিরুর মতো শরীরটা ভেঙে পড়ে নি।

কী মিঞা?

আরে ছিরু যে! এ কী চেহারা হয়েছে তোমার ভাই?

চেহারার দুষ কী বুলো। বুড়ো হঁয়ে গেলাম!

বুড়ো কেনে হলে ইয়ের মধ্যে। এখুনও বহুত দিন বাঁচবে তুমি, যদি আমার মতু রোজ গোস খাও!

হে·· হে···বেশ বললে তুমি! তুমাদের সস্তায় মাংস মেলে। তুমরা বড় খাও। পাঁঠী খাও। আমি পাবো কুথা! তা এই খাসি দুটো কি বিচতে চললে লাকি হে?

বিচতেই তো এসেছি, কিন্তুক বড়া দরকার আছে হে ডাগদরের ঠিঁয়ে। কাল থেকে বিবি খালি ঘাটে যেছে—এখন ছাগল বিচি না ডাগদরের ঠিঁয়ে যাই! তা তুমি এক কাম কুরবে ছিরুভাই?

বুলো কেনে!

ছাগল দুটো তুমি বিচে দাওগা আজকের পারা। বাজারেই বসবে টুগ্‌চি। বসতে তো হবেই। শালারা দরাদরি করে কিনবেক—কাটবে, কুটবে, বিচবে, তবে দাম দিবেক। কার অতু সুময় আছে বুলো?

হাতে যেন চাঁদ পেল ছিরু। বলে, কীরুকম দাম হাঁকাইব বুলো?

জোড়ার দাম লেবে সাড়ে তিনশো টাকা। চৌদ্দ কেজি মাংস হবে হে। তাছাড়া চামড়া, লাড়িভুঁড়ি আছে। আর দেখো ইয়ের চেয়ে বেশি যদি আদায় কুরতে পারো সিটো তুমার হবে!

দাও কেনে হে! আমি তুমার লেগে বসে রইব। যাও, যাও খাতির-জমা রইল। বিবির ওষুধটো আগু লেওয়া দরকার বেটে। বিবির কুছু হলে ঘর আঁধার হঁয়ে যাবেক ই বয়সে।

হক কুথা গাইছ—লাও তাইলে—দেখো কত্‌কে বিচতে পারো! খপ করে যাবু আর আসবু! অ্যাঁ।

ছিরু ছাগল দুটোকে টানতে-টানতে কশাইখানায় নিয়ে যায়। পথেই দৌড়ে এসে ধরে দু-একজন—কত লিবে হে?

ছিরু গম্ভীর হয়ে বলে, চারশো টাকা জোড়া।

হেঃ, কী যে বুলো!

ঠিক বুলছি। চৌদ্দ কেজি মাস তু হবেই। কুড়ি টাকা কেজি হলে কত হয়? কিন্তুক তুমরা বিচ্‌বে দুকুড়ি টাকা কেজি!

তর্কাতর্কি! শেষে একজন বললে, ঠিক আছে, চলো, কেটে-কুটে, ওজন করে দাম দোব।

তাইলে কিন্তুক এককুড়ি দশটাকা কুরে কেজি লাগবেক! চামড়া দুটো, আরু দশটাকা।

দেখো হে, এককুড়ি পাঁচটাকা কেজি দোব, আর দুটো চামের লেগে পাঁচটাকা। এসো···এসো!

ছিরু নিমরাজি হয়ে ছেড়ে দেয় খাসি দুটো। খানিকক্ষণের মধ্যে ছাগলদুটো মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়ে ওজন হল—ঝাড়া সাড়ে চৌদ্দ কেজি। মানে, তিনশো সাড়ে সাতষট্টি টাকা। ছিরুর সাড়ে সতেরো টাকা লাভ।

টাকাটা পেতে দেরি হল না। ছাগলের অভাব চলছিল। ঝড়ের বেগে চল্লিশ টাকা দরে বিক্রি হয়ে গেল। টাকা গুনে নিয়ে তেলেভাজা, মুড়ি আর মণ্ডা পেট পুরে খেয়ে নিল ছিরু, তারপর বসে-বসে বিড়ি টানতে লাগল। আর তখনই মাথায় পরিকল্পনাটা এল। রোজ যদি এমনি খাসি বেচে দিয়ে আসে, বেশ টাকা হয় অল্প পরিশ্রমে। দশটাকা লাভ রাখলেও মাসে তিনশোর মতো লাভ হতে পারে। এত টাকা? বিদ্যুৎ-চমকের মতো মনটা ঝলসে ওঠে একবার, তারপর অন্ধকার হয়ে আসে। খেয়েপরে স্ফূর্তি করার বয়স তার নেই। টাকা রাখবে কোথায়? ভাঙা ঘর, ফুটো হাঁড়িকলসী। ছেঁড়া কাঁথা। মরুক গে! আজকে ভালো করে ডুব দিয়ে চান করবে তারপর একটা দোকানে ঢুকে ভাত খেয়ে নেবে পেট ভরে। খেয়ে নিয়েই বেরুতে হবে ছাগলের সন্ধানে।

কী ছিরু, হয়েছে? হাতে ওষুধের বোতল নিয়ে রঞ্জুমিঞা এল এতক্ষণ পর।

হাঁ ভাই! এই লাউ সাড়ে তিনশো—বাকিটাকি নাই।

বেশ, বেশ! টাকাগুলো দ্রুত অভ্যস্ত হাতে গুনতে থাকে রঞ্জুমিঞা। গোনা শেষ করে নীলরঙা শার্টের ভিতর পুরে বলে, তুমি কতু লাভ করলে হে?

শালারা চামারের একশেষ। গোটা পাঁচেক হইছে!

তুমি তাইলে আরু পাঁচটাকা রাখো; বলে রঞ্জুমিঞা পাঁচটাকা বের করে দেয়। মনে-মনে খুশি হয় ছিরু। সাড়ে বাইশ টাকা লাভ, না খেটেই।

রঞ্জুমিঞা বললে, আসি ভাই—বিবিটো পড়ে রইছে—জানটোতে সুখ লাই!

আচ্ছা ভাই, আমি তো বসেই রইছি! তুমাদের গাঁয়ে গেলে ছাগল জোগাড় করে দিতে পারবে—

এই বেওসাটা না হয় লাগিন দি !

তা এসো কেনে এসো—সাঁঝবিলায় সকুলে ঘরে থাকবেক, সিই সুময় এসো—দু-একটো করে মিলবেক বৈকি ! আমিই তুমাকে দিতে পারব। রোজ-রোজ শহরে আসা পুষায় না ভাই ! হাট থিকে বেটাটো একপাল আজকেই লিয়ে আসার কুথা আছে।

রঞ্জুমিঞা তাড়াতাড়ি চলে গেল। ওর বাড়ি শহর থেকে মাইল দেড়-দুই দূরে, গ্রামে। ছিরুর পেটে চাট্টি ভাত পড়লে ওইটুকু পথ সে আজও যাওয়া-আসা করতে পারে।

বাড়ির দিকে চলল ছিরু। ডুব দিয়ে চান করতে হবে। গায়ের চামড়া জ্বালা করছে। খড়ি ফুটেছে সর্বাঙ্গে। তেল পড়ে নি কতদিন। তেল মাখবে, চান করবে, পেট ভরে ভাত খাবে। রাত্রে আর খাওয়ার দরকার হবে না। সন্ধেবেলায় পচুইয়ের দোকানে গিয়ে পেটটা ঠাণ্ডা করবে কতদিন পর। পরদিন সকালে উঠে চায়ের দোকানে একমগ চা আর একটা বড়ো পাঁউরুটি গোটাটাই খেয়ে নেবে।

রাস্তার ধারে ওষুধের দোকানটা পড়ল। ছিরুকে ওরা সবাই চেনে। ছিরু ঢুকল : বাবু একটো পুরোনো ছোট শিশি দেবেন। দাম দিছি !

কী করবে হে ?

আজ্ঞেন তেল লোব !

নিয়ে যাও, দাম দিতে হবে না—ওই দেখো—একটা প্যাকিং বাক্সে ভাঙা শিশি বোতল জড়ো করা ছিল। প্যাঁচ-খোলা একটা মোটা মুখের শিশি পেয়ে গেল ছিরু। বললে, ইয়েতেই হবেক।

বেশ, নিয়ে যাও !

পঞ্চাশ গ্রাম সরষের তেল কিনলে ছিরু মুদি-খানায়। তারপর বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল। বাঁকানো মাথাটা সে যেন আজ অনেকটা সোজা করতে পারছে। বেশ ভালো লাগছে। পুরানো দুনিয়াটাকে তত খারাপ মনে হচ্ছে না আজ।

জুত করে তেল মেখে চান করে ছিরু চলল ভাতের দোকানে। ভাবলে—না, কাল থেকে রেঁধে খাবে—ওতে অনেক সস্তা হয়। তবে সব জোগাড় চাই। কোনো কিছুই যে নাই। রান্নার পাট চুকে গেছে কতকাল। কদিন ছাগল বেচাকেনা না করলে সম্ভব নয়। আঃ, কেউ যদি রেঁধে দিত। ঝাঁটপাট দিয়ে ঘরটা সাফসুতরো রাখত। কিন্তু সেসব হবার বয়স তার নাই। আর কেউ আসবে না। নিজের শরীরটার কথা ভাবল। সব ঠাণ্ডা হয়ে নিঝুম হয়ে গেছে। কোনোদিন যে তার শক্তিসামর্থ্য ছিল তা যেন মনে পড়ে না। পথ হেঁটেই চলেছে ছিরু। তার নজর শুধু রাস্তার আশেপাশে চরে বেড়ানো ছাগলের দিকে। মনে-মনে হিসাব কষছে, এটার পাঁচ কেজি মাংস, এটা বুড়ো হয়ে গেছে, এটা নেহাতই বাচ্চা ! দূর, সে এসব কী ভাবছে। এগুলো সব পাঁঠা। খাসি বা পাঁঠা কেউ ছেড়ে রাখে না। কশাইগুলো খাসি বা পাঁঠাই চায়।

ভাবতে-ভাবতে শহরের শেষে এসে পড়ল ছিরু। তখন তার হুঁশ হল। কাছেই বাস-স্ট্যানডটা। ভিড়ে-ভিড়ে ছয়লাপ। এখানে অনেক চালাঘরে হোটেল খোলা রয়েছে। দাম সস্তা। একটা দোকানে ঢুকে পড়ল ছিরু। কাঠের তক্তা পিটিয়ে টেবিলের মতো করেছে। পায়াগুলো বাঁশের। বসার জন্য শিমুল-কাঠের নড়বড়ে বেনচি।

জোড়া শালপাতায় ভাত দেয় এরা। বাটি দেয় না। তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল দেয় অবশ্য। কলাইয়ের ডাল, আলুপোস্ত, বাঁধাকপির ঘ্যাঁট আর ডিমের ঝোল নিলে ছিরু। তিনবার ভাত নিল। গ্লাস দুয়েক জল। সব পেটে চালান করে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। উঠে হাত ধোবার জন্য চালার বাইরে নালাটার ধারে দাঁড়াতেই চমকে উঠল ছিরু। তার মেয়ে মতি একটা বড়ো বালতি করে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে জল টেনে আনছে কোত্থেকে। পাথরের মতো জমাট হয়ে গেল ছিরু তার পলাতকা মেয়েকে দেখে। ইস ! চেহারার কী হাল হয়েছে মেয়েটার। ছিরুর থেকেও বেশি বুড়িয়ে গেছে। জলটা কাছে নিয়ে এসে ঢালতে হবে মস্ত একটা জালায়। কিন্তু তুলতে পারে না বড়ো বালতিটা। মগে করে ঢালবে। তাকিয়ে দেখল মগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বাবা। বাড়ানো হাতটা ছবির মতো স্থির হয়ে গেল। বললে, বাবা তু ?

তুর ইরকম হাল কেনে রে ?

বেয়রাম হলছিল।

বিয়া কুরেছিলি, তার কী হলছে ?

সি কথা গেয়ে কী হবেক বুলো।

কবে থিকে ইখানে আলছিস ?

সি তুমাস হবেক !

বুড়ো বাবাটোর কুথা ভুলে গেইছিলি বুজি ?

কুন পেরানে যাই বুলো ! তুমার লিজেরই খোওয়া জোটে না।

তু আমার ঠিঁয়ে চল—তুর আবার আমি বিয়া দোব ! শরীলটো সাঁরাই লিবি চল্ !

কি খোওয়াইবে ?

যেমুনটি আগে খেতিস, তেমুনটি খোয়াইব ! আমি মরি লাই—বুড়ো হাড়ে এখুনও ডুগডুগি বাজছেক।

বেটে। বালতিটা মাটিতে রেখে মুখের উপর উড়ে পড়া চুলগুলোকে বাঁহাতে ঠেলে দেয় মতি। ওর মরা মুখে বিষণ্ণ গোধূলির আভা খেলতে থাকে। বলে, বেশ চলো।

দোকানীর নজরে পড়ে ওদের এতক্ষণ পর। সে তেড়ে আসে—বানচোত ! আমার কাজের লোক ভাঙ্গাইছিস !

আমার বাপ বেটে যি ! মতি হাসি-হাসিমুখে বলে দোকানীর দিকে চেয়ে।

বেটে তো বেটে ! বাপের সঙ্গে ঘরে যেঁয়ে কুথা বুলবি—ইখানে কী বেটে ! ওই তু কাজের ছিরি ! দু বালতি জল তুলতেই সারা সুকালটো খাপিন্ দিলি ! না পুষায় তু বিদেয় হ !

ছিরু বললে, বিদেয় হবে ! বুলো কতু হইছে তুমার ?

চার টাকা।

ছিরু চার টাকা নামিয়ে দেয়। বলে, বিটির কতু পাওনা হইছে দিয়ে দাও !

একটা টাকা ছুঁড়ে দেয় দোকানী।

চো। বলে ছিরু। টাকাটা কুড়িয়ে নেয় মতি। একটা রিকশা ধরে ছিরু। বলে মতিকে—আয় !

মতি অবাক হয়। ই কী বাবা ! এইটুকুন রাস্তা রিশকায় যাবু ?

ছিরু জবাব দেয় না কথাটার। মতি নীরবে এসে রিকশায় ওঠে। রিকশা চলতে থাকে। ছিরু বলল, চল্ ভাঙ্গা ঘর-দুয়োর আবার ঠিক করে লোব ! তু ঘরটো সামুলাবি আমি রোজকার কুরব। বিয়া করবি কর, না করবি না কর, যাকে মুন হয় ঘরে লিবি—তবে ভিটেটো ছাড়বি না—উটো তুরই বেটে ! আমি আর কদিন আছি রে ' !

হিঁ বাবা যা বুলেছো—একবার মাথাটো খারাপ হইছিল বুলে কি আবার কথুনো হয় ! দিখবে তুমি, তিন-চার বাড়ি পাট কুরব—রাঁধাবাড়াও কুরব !

করিস ! নিস্পৃহভাবে বলে ছিরু। তার আগু শরীলটো সারাঁই লে ! রুগ রইলে কাজ কুরবি কী কুরে ! কাজ কুরলেই জানে সুখ থাকবেক—লইলে অসুময়ে বুড়িন যাবিন।

উপন্যাসে আইডিয়া : বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস

সন্তোষ চকদার

ঔপন্যাসিক হিসাবে বুদ্ধদেব বসু আত্মমগ্ন এবং রোমানটিক প্রেমের শিল্পী হলেও বেশ কিছু উপন্যাসে বুদ্ধিপ্রধান জীবনসমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। বিশেষত প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি রচনা এবং শেষ বয়সের দু-একটি উপন্যাসের (যেমন "বিপন্ন বিস্ময়") অবলম্বন—আলাপ-আলোচনা, যুক্তিজালবিস্তার, তর্ক-বিতর্ক। সুডৌল কাহিনীবিন্যাস বা চরিত্রসৃষ্টির বদলে বিশেষ-বিশেষ বক্তব্য বা আইডিয়া প্রতিপাদন করাই এই উপন্যাসগুলির লক্ষ্য। এইসব উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র লেখকের আত্মপ্রতিকৃতি এবং এক-একটি চরিত্র লেখকের এক-একটি আইডিয়ার মুখপাত্র। এই আইডিয়া আধুনিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে উঠে এসেছে। চালু সমাজব্যবস্থা, স্থবির ধর্মনীতি আর গতানুগতিক সংস্কার ইত্যাদির সঙ্গে চ্যালেনজের মনোভাব থেকে চিন্তাচেতনা দেখা দেয়। কখনো আলোচ্য বিষয় হয়—রাজনীতি, শিক্ষানীতি, প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি মানসিক সম্পর্কের মূল্যবোধ।

আধুনিক জীবনে, নানাদিক দিয়ে সংকট আর সমস্যা ঘনিয়ে এসেছে। ধর্ম-সমাজ এবং মানবসম্পর্ক-গুলো সম্বন্ধে প্রথানুগ ধারণা খান-খান হয়ে ভেঙে গেছে। এক সংশয়পীড়িত জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে মানুষ। ফলে বুদ্ধি দিয়ে ভালোমন্দ বিচার করে, সব-কিছু বুঝবার আগ্রহ আর চেষ্টা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন 'তার (আধুনিক মানুষের) জীবনে চিন্তার বিষয় সর্বদা উদ্‌গত হয়ে উঠবেই। অতএব, আধুনিক উপন্যাস চিন্তাপ্রবণ হয়ে দেখা দেবে আধুনিক কালের তাগিদেই।'[১]

আধুনিক "চিন্তাপ্রবণ" উপন্যাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে আঁদ্রে জিদ এবং অল্‌ডাস হাক্‌স্‌লির প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। জিদের "কাউনটার ফিটার্স"—১৯১৯, হাক্‌স্‌লির "পয়েনট কাউনটার পয়েনট"—১৯২৮, এবং বুদ্ধদেব বসুর "রডোডেনড্রন-গুচ্ছ"—১৯৩২ সালে লেখা। এই তিনটি উপন্যাসের

মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। তিনটি উপন্যাসেরই প্রধান চরিত্র ঔপন্যাসিক। অর্থাৎ ঔপ-ন্যাসিক নিজেই প্রধান চরিত্রের মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র উপন্যাস রচনার উপকরণ, রূপকল্প এবং প্রযুক্তি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে। আঁদ্রে জিদের "কাউনটার ফিটার্স" উপন্যাসের পোলিশ ডকটরেস ওই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ঔপন্যাসিক এডওয়ার্ডকে নভেল অব আইডিয়াজ সম্পর্কে বলেছে : 'make a novel not of living creatures but of ideas'।[২] এবং এই শ্রেণীর উপন্যাসকে সে problem novel বলে অভিহিত করেছে। অল্‌ডাস্ হাক্‌স্‌লির "পয়েনট কাউনটার পয়েনট" উপন্যাসে ফিলিপ কোয়ারলেস তার নোটবুকে নভেল অব আইডিয়াজ সম্পর্কে লিখেছে : novel of Ideas. The character of each personage must be implied, as far as possible, in the ideas of which he is the mouthpiece. In so far as theories are rationalizations of sentiments, instincts, dispositions of soul, this is feasible. The chief defect of the novel of ideas is that you must write about people who have ideas to express—which excludes all but about ·01 per cent of the human race. Hence the real, the congenital novelists don't write such books. But then I never pretended to be a congenital novelist.[৩]

বুদ্ধদেব বসুর "রডোডেনড্রনগুচ্ছ" উপন্যাসের পুরন্দর একজন আধুনিক ঔপন্যাসিক। তার উপন্যাস পড়ে নটরাজ নাগ ব্যঙ্গের সুরে যা বলেছে তা অনেকটা জিদ আর হাক্‌স্‌লির কথার অনুরূপ। 'উপযুক্ত বিনয়ের সঙ্গে পুরন্দর জিজ্ঞেস করলে, 'কোন বইখানার কথা বলছেন ?' 'সেই—যে যেটাতে একদল প্রেমিক-প্রেমিকার কথা বলেছো,.....পাতার পর পাতা এরা শুধু কথাই কইলো—কথা, কথা কথা—সেসব কথা এতই জটিল আর সূক্ষ্ম যে আমার বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে তার অর্দ্ধেক বুঝতে পারলুম না। আমার অবিশ্যি মনে হয়েছে—কেন এই তর্কাতর্কি ? ভালোবাসার উপায় তো একই। প্রেম ইস্‌থেটিক না ইমোশনাল এ-বিষয়ে যতক্ষণ তর্ক করা হলো, তার অর্দ্ধেকেরও কম সময়ে প্রত্যক্ষ বোঝা যায়, ব্যাপারটা কিরকম। কিন্তু কথা কওয়া ছাড়া আর কিছু করতে যেন তারা অপারগ।'[৪]

প্রায় সমকালের তিনজন ভিন্‌দেশি লেখকের একই দিকে ঝোঁক—আইডিয়ার দিকে। ফ্রান্স-ইল্যানড বাঙলাদেশ সর্বত্র—আধুনিক চিন্তাচেতনা, জীবন-সমস্যা লোকদের মনে সমানভাবে তরঙ্গ তুলেছে। ইতিহাস ইশারা দিচ্ছে ফলত উপন্যাস চালু চরিত্র-প্রধান বা আখ্যানরীতি থেকে আইডিয়ার দিকে মোড় নিচ্ছে।

জনপ্রিয় হৃদয়বেদ্য গল্প লেখা খুব সহজ এবং এটা সেকেলে বলেই নতুন কিছু করার জেদবশত ফিলিপ কোয়ারলেস জটিল আইডিয়া নিয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছে, এমন নয়। কেন সে এ ধরনের উপন্যাস লিখছে, তা স্ত্রীর এক পরামর্শের উত্তরে ফিলিপ বলেছে সে-কথা : তার স্ত্রী একদিন ফিলিপকে একটা গল্প লিখে ফেলতে বলল—থীম হবে a simple straightforward story about a young man and a young woman who fall in love and get married. ফিলিপ বলল এধরনের গল্প সে লেখেনি এতাবৎ, কারণ সম্ভবত তা সে লিখতেই পারবে না। বিশেষ করে আবেগ-অনুভূতির আর সহানুভূতির ক্ষেত্রে সে দক্ষতার অভাব বোধ করে। বোধির চেয়ে বুদ্ধি, আবেগের বদলে বিচার, অনুভূতির বদলে চুলচেরা বিশ্লেষণ, হৃদয়ের স্থলে মস্তিষ্ক তার খেলে ভালো। তার স্বাভাবিক মানস-প্রবণতা অনুযায়ী ফিলিপ নভেল অব আইডিয়া বা প্রবলেম নভেল

লিখবে। ফিলিপের স্ত্রী বলেছে, সেটা হবে অনাসৃষ্টি, উপন্যাস হিসাবে দুর্বল শিল্প। ফিলিপ ভিন্নমত পোষণ করেছে, বলেছে—এই রীতিতেই রচিত হবে আরো বেশি লাইফ-লাইক উপন্যাস।

কেন উপন্যাস লাইফ-লাইক হবে সেকথা বুঝাতে গিয়ে ফিলিপ বলেছে যে অকাট্য সত্য (অ্যাবসলিউট ট্রুথ) বলে কোনো জিনিস নেই। সত্য মাত্রই আপেক্ষিক। সত্য নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের মেজাজ আর মানসিকতার উপর। প্রত্যেক মানুষের মনে এক-একটি পোষিত ধারণা থাকে; সেই ধারণার জানালা দিয়ে তিনি বস্তু এবং ভাববিশ্বকে দেখেন, ভাবেন, বিচার করেন। এইজন্য সত্য একেক ব্যক্তির কাছে একেক রকম। এটা হল পর্যবেক্ষণ এবং অনুভবগত তারতম্যের ফল।

ফলত কোনো বস্তুবিশেষ বা আইডিয়া সম্পর্কে মোটামুটি সম্যক ধারণা করতে হলে নানা দিক থেকে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বহুগঠনিক জটিল আধুনিক বিশ্বে সত্য সম্পর্কে ধারণার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। ফিলিপের ভাষায়, ···the essence of the new way of looking is multiplicity of aspects seen. For instance, one person interprets events in terms of Bishops; another in terms of flannel camisoles; another like that young Lady from Gulmerg,···thinks of it in terms of good times. And then there's the biologist, the chemist, the physicist, the historian. Each sees, professionally a different aspect of the event, a different layer of reality. What I want to do is to look with all those eyes at once.*

এটা আসলে হাক্স্‌লিরই মত। এই মতকে উপন্যাসে হাক্স্‌লি কিভাবে রূপায়িত করেন, সেই শিল্প-প্রকল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জে. ব্রু. বীচ চমৎকার বলেছেন : Huxley makes a point of alternating groups of characters with the deliberate intentions of ironic contrast, so as to give a sharp impression of the disparateness and incommunicablity of these various worlds. He seems to suggest the inexistence of absolute truth, its complete relativity to the temperament, the point of view.[৬]

অর্থাৎ হাক্স্‌লি চালু উপন্যাসরীতির রৈখিক বিবৃতি ত্যাগ করেছেন। গ্রহণ করেছেন আড়াআড়ি ভঙ্গিতে বিষয়কে দেখবার পদ্ধতি, বিচার করার বিশ্লেষণী প্রযুক্তি (ইনটারপ্রিটেটিভ অ্যানড ক্রিটিক্যাল মেথড)। এই পদ্ধতিকে উপন্যাসে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ মতামতওয়ালা কয়েকটি চরিত্রের একটি করে গ্রুপ সৃষ্টি করেছেন। সব চরিত্রই বুদ্ধিবাদী, যে-কোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ এবং সুচিন্তিত বিবেচনা করার ক্ষমতা এদের আছে। বিরুদ্ধমতামতধারী পাত্রপাত্রীগুলিকে তর্কের আসরে উপস্থিত করেছেন তিনি। এদের আলোচনা, মতবিনিময় আর কথাকাটাকাটির মধ্য দিয়ে বিরুদ্ধ-ধারণাপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় বস্তু আর ভাববিশ্ব সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষভাবে "পয়েনট কাউনটার পয়েনট" সমস্যাপ্রধান তর্ককেন্দ্রিক উপন্যাস হিসাবে বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা। তাই নাম পয়েনট—কাউনটার—পয়েনট।

বুদ্ধদেব বসু এই উপন্যাস পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকতে পারেন—সে কথা পরে। কিন্তু একমাত্র প্রেরণাস্থল হাক্স্‌লি নন। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বালোচনাধর্মী বেশ কটি উপন্যাস লিখেছিলেন। "গোরা" (১৯১০) থেকেই বিতর্কমূলক উপন্যাসের সূচনা। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা ব্রাহ্ম এবং হিন্দু

ধর্মের মধ্যেকার ভালোমন্দ দিকগুলি নিয়ে তর্কবিতর্কে লিপ্ত। "ঘরে বাইরে" (১৯১৫) উপন্যাসে—দেশপ্রেম, জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ এবং নরনারীর উগ্রলালসা সম্পর্কিত দীর্ঘ-দীর্ঘ বক্তৃতা, বাগ্‌বিতণ্ডা এবং আদর্শগত আলোচনা আছে।

বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন "ঘরে বাইরে", "শেষের কবিতা" এসব বই বীজের মতো কাজ করেছে বাঙলা সাহিত্যে, তা থেকে অন্য বই জন্ম নিয়েছে।[৭]

এবার দেখা যাক, বুদ্ধদেব বসু আইডিয়াকে কিভাবে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। হাক্স্‌লির মতো বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রিয় থীম হল বিরুদ্ধমতামতধারী পাত্রপাত্রীদের রেস্টুরেনটে, কফিহাউসে, বৈঠকখানায় বা আলোচনাসভায় একত্র করে আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া। পাত্রপাত্রীরা সবাই শিক্ষিত; নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনার অবাধ দক্ষতা তাদের। অলডাস হাক্স্‌লির কুশীলবের মতো বুদ্ধদেব বসুর চরিত্ররাও 'unearned incomes'-ভোগী। প্রচুর অবসর তাদের।

"পয়েনট কাউনটার পয়েনট" উপন্যাসে ওয়ালটার, লুসি টেনটামাউনট, স্পেনড্রেল, ম্যারী, মার্ক-র‍্যামপিয়েন 'Mayfair Socialities'-এর লোক, সোহোর Sbisa রেস্টুরেনটে আড্ডা দিতে অভ্যস্ত। এখানে সবাই মিলে নানা বিষয়ে আলোচনা করে। বুদ্ধদেব বসুর চরিত্ররাও নবনির্মিত বালিগঞ্জ সংস্কৃতির কুশীলব। নতুন-গড়ে-ওঠা বালিগঞ্জ সংস্কৃতির 'বৈঠকি-বিলাস' এদের জীবনচর্চার অঙ্গ। বুদ্ধদেব বসুর নিজের জীবনাভিজ্ঞতায় ছিল আড্ডা-প্রীতি ও-রীতি। 'সপ্তাহে একবার বা দুবার করে সান্ধ্য-বৈঠক বসে কবিতাভবনে: দুশো দুইয়ের ছোটো বারান্দা উপচে পড়ে এক একদিন।'[৮]

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের চরিত্ররা প্রায় সবাই সাহিত্যিক নতুবা সাহিত্যপ্রেমী, নিদেনপক্ষে সাহিত্য-ঘেঁষা মানুষ। এদের বৈঠকের আলোচনার বিষয় পুরনো সমাজ এবং পরিবারের প্রথা-সংস্কার, নরনারীর সম্পর্ক এবং সাহিত্যশিল্পের গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে যেমন, তেমনি বালিগঞ্জের যে-কোনো সাহিত্যপরিমণ্ডলে সাহিত্য-আলোচনায় চ্যালেনজ ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তরুণতর সাহিত্যিকদের আলোচনার ধাঁচ আঁচ করতে পেরেছিলেন। "শেষের কবিতা" উপন্যাসে বালিগঞ্জের সাহিত্যবিতর্কের চিত্র অক্ষয় করে রেখেছেন। উপন্যাসটির শুরুতেই আছে: 'বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায়, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। সেখানে অমিত রায় সভাপতি। সে গিয়েছিল যুদ্ধসাজ পরে'···ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের মধ্যে "মনদেয়ানেয়া", "যবনিকাপতন", "রডোডেনড্রনগুচ্ছ", "সানন্দা" ইত্যাদিতে তার্কিকতা, চিন্তামনন একটু বেশি। কিন্তু "যেদিন ফুটলো কমল", "হে বিজয়ী বীর", "বাসরঘর", "ধূসর গোধূলি" ইত্যাদিতে কাব্যময়তার প্রাধান্য। আবার শেষপর্বে "বিপন্ন বিস্ময়ের" মতো তর্ককেন্দ্রিক সমস্যাপ্রধান উপন্যাসও তিনি লিখেছেন।

আসলে বুদ্ধদেব বসু হাড়ে-হাড়ে ভাবুক প্রকৃতির। ইনটেলেক্‌টের চাইতে ইনট্যুইশন তাঁর মধ্যে বেশি। আধুনিক জীবনের জটিল পট-পরিবেশ, সমকালীন কল্লোলীয় সাহিত্যবিতর্ক থেকে সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসে বহুকোনা দৃষ্টি, মালটিপ্লিসিটি অব ভিউজ ও বিশ্লেষণী প্রবণতা। এই মানসিকতা ইংরেজি-উপন্যাস-পাঠজাতও বটে। বিশেষত তাঁর প্রিয় লেখক অলডাস হাক্স্‌লির প্রভাব তো আছেই। এক চিঠিতে নরেশ গুহকে তিনি লিখেছিলেন,

'অলডাস হাক্স্‌লির বইখানা আমার খুব ভালো লেগেছে। তাঁর লেখার বরাবরই আমি অনুরক্ত: অসাধারণ তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা, অসামান্য তাঁর নৈপুণ্য।' এ প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'বক্তৃতা, তর্ক, আলোচনা—এই হলো ইংরেজি

* G. S. Frasar : Modern Writer and His World, Page 88.

সাহিত্যের কাল।'[৯]

বুদ্ধিবাদী উপন্যাস রচনার প্রেরণা হাক্‌স্‌লির কাছ থেকে পেয়েছিলেন বলেই উভয়ের প্রকরণগত মিল অনেকখানি। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের চরিত্ররা কোনো কাজই করে নি, শুধু ভাবনা-চিন্তা, তর্ক-বিতর্ক করেছে, কথা বলেছে। যে-কোনো প্রশ্নের সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে এরা এতই মত্ত থাকে যে মাথা ঘুরে যায়, আর প্রায় সব সময়ই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে। যে-কোনো বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণে এরা এমন স্তরে পৌঁছে যায়, যার সঙ্গে হয়তো জীবনের কোনো যোগ থাকে না। পৃথিবী রসাতলে গেলেও কথাকাটাকাটি থেকে এরা বিরত হয় না। হাক্‌স্‌লির র‍্যামপিয়েন সম্পর্কে ডি. এইচ. লরেন্স এক চিঠিতে হাক্‌স্‌লিকে জানিয়েছিলেন 'Your Rampion is the most boring character in the novel'।[১০] কেননা র‍্যামপিয়েন উপন্যাসে কোনো কাজ করে নি, একমাত্র কথা বলা ছাড়া। সোহোর রেস্তোরাঁয় বসে কাটিয়েছে সারাক্ষণ। বুদ্ধদেব বসু প্রথম পর্বের উপন্যাসে এ ধরনের বোরিং ক্যারেক্টার তৈরি করেছেন। চালু-আখ্যানরীতির উপন্যাস রচনার বাঁধা পথ তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। মানুষের জীবনের নানা সমস্যার আর প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই তিনি উপন্যাস শিল্পমাধ্যমটি ব্যবহার করেছেন।

তাঁর উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রী পঁচিশ-উত্তীর্ণ পাকাপোক্ত যুবকযুবতী। এবং এই যুবকযুবতীদের পরস্পর সম্পর্কের সমস্যাই উপন্যাসগুলোর মধ্যবিন্দু হয়ে উঠেছে। তবে এই প্রেমসমস্যার সঙ্গে আগের-আগের প্রেমের গল্পের অনেক তফাত। প্রেম এখানে মননস্বন্দ্ব। প্রেম যে যুবকযুবতীর গভীর হৃদয়ধর্মের উৎসার নয়, তার সঙ্গে যুক্ত নানা মানসিকতা, প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তির গাঁটছড়া—সেটাই তাঁর বিশ্লেষণ করে দেখাবার বিষয়। প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোত বহুতর দীর্ঘজটিল সমস্যা, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা—যা-কিনা আধুনিক মননশীল মানুষের মনে নানানভাবে সাড়া জাগায়; তা তাঁর নায়কনায়িকার বিদগ্ধজটিল তর্কবিতর্কের মাধ্যমে আলোচিত। প্রেম ঈসথেটিক না ইমোশনাল, প্রেমের সঙ্গে বিবাহসম্পর্ক, প্রেম ও নীতিবোধ, প্রেমের ব্যাপারে প্রথা ও সংস্কারানুগত্য ব্যক্তি-বিকাশের ক্ষেত্রে ভালো কি মন্দ, প্রেমের সঙ্গে দেহকামনা বা যৌনতার সম্পর্ক কতখানি, রুচির মিলই বা কতখানি, সভ্যতার সঙ্গে মোনোগেমি ও পলিগেমির সম্বন্ধ, বহুকামিতা বৈজ্ঞানিক কি অ-বৈজ্ঞানিক—এত সব নানা সমস্যার সূক্ষ্ম বিচার-ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস ভরপুর। প্রেম-সমস্যার সুতো ধরে নায়কনায়িকার অধীত ও অর্জিত সাহিত্য, বিদ্যা, শিল্পকলা বিষয়ে আলোচনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

আধুনিক যুবকদের সম্পর্কে "মনদেয়ানেয়া" উপন্যাসে ঈশান বলেছে 'আজকালকার বাঙালি ছেলেরা আধময়লা জামাকাপড় পরে এইচ. জি. ওয়েলস আর বার্ট্রাণ্ড রাসেল আর কাউন্টাকাই জার্লিঙ্ আলোচনা করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। বড় বড় গাল-ভরা, প্রাণকাড়া আইডিয়া পেলে এরা আর কিছু চায়না,…। "মনদেয়ানেয়া" উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। ইন্দ্রজিৎ সেন কবি। সে বহু মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করেছে এবং বহু মেয়েই তার প্রেমে পড়েছে। মনদেয়ানেয়ার খেলায় সে নিয়ত নিযুক্ত। অন্তত এক ডজন মেয়ে তার হাতফেরতা হয়েছে। বর্তমানে যার সঙ্গে মনদেয়ানেয়া চলছে, সে ইস্কুল মাস্টারনী সুলতা দত্ত। অথচ সেইসব আপ-টু-ডেট শিক্ষিতা মেয়েদের বিয়ে না করে সে তার বন্ধু দ্বিজেনের কাকাতো বোন লেখাপড়া-না-জানা ঠাণ্ডা মেয়ে মীরাকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে।

ইন্দ্রজিতের বন্ধু ঈশান-সিতাংশু-দ্বিজেন এ-কথা জানতে পারল। তারা এই মানসরহস্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হল। শুরু হল চুলচেরা বিচারবিশ্লেষণ, তর্কবিতর্ক। যে ইন্দ্রজিৎ বহু চৌকোশ মেয়েদের ঘাঁটাঘাঁটি করে

করে অভ্যস্ত, সে কী করে মীরার মতো একটি জুথবু অসম্পূর্ণ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে? এ তার কোন্ মনোবৃত্তির ফল? শুরু হল পুরুষের প্রবৃত্তি ও মানসিকতা নিয়ে তদন্ত (ক্রিটিকাল সারভে)। এ-সব বিষয় আমরা চার বন্ধুর কথাবার্তা থেকে জানতে পারি। চার বন্ধুর কথা হচ্ছিল গঙ্গার ঘাটে-বাঁধা নৌকায় বসে। ঈশান আর সিতাংশুর আলোচনা 'ওয়াইলেস' রেস্টুরেন্টে! ইন্দ্রজিৎ যে মীরার মতো মৃদুলা-ললিত-কোমলা মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তার কারণ কি তার ভোগক্লান্ত মনের নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁজা? না তার শারীরিক উপভোগ-অক্ষমতা?

এমন বিশ্লেষণ করে-করে লেখক (এখানে সর্বজ্ঞ) আবিষ্কার করলেন ইন্দ্রজিৎ জন্ম-অসুস্থ: ক্রনিক অ্যানিমিয়া। শরীরের রক্তে লাল-কণিকার সংখ্যা কম বলেই তার স্বভাব হয়েছে নিস্তেজ, নির্জীব, মুখের চেহারাও হয়েছে জমাট, হঠাৎ করে যাকে মনে হয় বৌদ্ধগাম্ভীর্য। চেহারার সঙ্গে আচরণও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, কথাবার্তায় ক্ষিপ্রতা নেই। 'ও জীবনে বহু নারীসঙ্গ পেয়েছে, কিন্তু তেমন একান্ত উপভোগ ওকে দিয়ে হয় নি।' ইন্দ্রজিৎকে জরিপের পরে লেখক একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন 'এই রকম অস্বাস্থ্যের সঙ্গে বাইরের অবস্থার প্রতিকূলতা একত্র হয়েই মানুষকে মর্বিড করে ছাড়ে।'

শেষ পর্যন্ত শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যে সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে এই তত্ত্বে উপনীত হলেন তিনি। ইন্দ্রজিৎ কবিতা লেখে। তার কবিতায় কোনো প্যাশন নেই। কেননা জীবনে কোনো প্রবল প্যাশন শারীরিকভাবে অনুভব করতে সে অসমর্থ। কিন্তু যৌনজীবনের বহুমুখিতার ফলে তার কবিতা হতে পারত উদাস, বিতৃষ্ণ, তা হয় নি। কারণ তার মধ্যে এমন একটি ভাবুকতা আর কল্পনাপ্রবণতা রয়েছে, যা দিয়ে সে এমন একটি পরিবেশকে ভালোবাসে যার পিছনে ঘরোয়া ব্যাক-গ্রাউনড। সে জন্যেই এমন একটি মেয়েকে সে

ভালোবেসেছে যার মধ্যে প্যাশন না থাকলেও মাধুর্য আছে। কবিতাকল্পনা ও দাম্পত্যজীবন রচনার মূল উৎস এই আন্তরিকতা থেকে। এই জন্যেই বহুমুখী যৌন-জীবন যাপন করলেও সে আন্তরিক প্রেমের মধুর কবিতা লেখে, আর মীরার মতো মিষ্টি-মধুর মেয়েকে বিয়ে করার জন্য কৃতনিশ্চয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঈশান আর সিতাংশু—'অশিক্ষিত' এবং 'গ্রাম্য' তথা 'মৃদুললিত' মেয়ে ও 'শিক্ষিতা' 'কায়দাদুরস্ত' 'আলোকপ্রাপ্তা' মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছে। এসেছে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ: সৌন্দর্য ব্যাপারটা আবয়বিক অর্থাৎ শরীরের কাঠামোর না মুখশ্রীর—এ-বিষয়ে তর্ক-বিচার। তর্ক হয়েছে নরনারীর আকর্ষণের মূল উপাদান নিয়ে। হিন্দুবিবাহপদ্ধতির আলোচনা করতে-করতে ঈশান আর ইন্দ্রজিৎ আদর্শ হিন্দু দম্পতির সম্পর্কের গূঢ়-তত্ত্ব উন্মোচন করেছে। অবিবাহিত অবস্থায় যারা খুব উচ্ছৃঙ্খল হয় বিয়ে করে তারাই হয় শান্তশিষ্ট পত্নী-নিষ্ঠ স্বামী। আর হিন্দু-স্ত্রীর পাতিব্রত্যের কারণ, তাদের প্রেম তো আইডিয়ালাইজড। হিন্দুবিবাহের মাহাত্ম্যই তো এখানে। হিন্দু মেয়েরা তো আর একটি মানুষকে বিয়ে করে না, তারা বিয়ে করে স্বামী নামে একটা আইডিয়াকে।

উপন্যাসটিতে এই তত্ত্বালোচনা একেবারে আরোপিত নয়। ইন্দ্রজিৎ আর মীরার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য-জীবন কল্পনা করে, তাদের সম্পর্ক আলোচনার সূত্রে এই আইডিয়াগুলো এসেছে।

হাক্‌স্‌লির মতো বুদ্ধদেব বসুও বলতে চান অ্যাবস-লিউট ট্রুথ বলে কিছু নেই। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সত্যের ধারণা স্বতন্ত্র, তেমনি আবার সত্য নির্ভর করে মুডের উপর এবং স্থানকালের উপরও। পূর্বপ্রণয়ী মালিনীর সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিজেনের পাঁচ বছর পরে। সাধারণত আমরা বাঙলা উপন্যাসে এরকম ক্ষেত্রে সেনটিমেনটাল প্রেমের আবেগের আতিশয্য লক্ষ করি। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এখানে একদা-প্রণয়ী-যুগল-

কে নিযুক্ত করেছেন মনের স্বভাব নিয়ে আলোচনায়। দ্বিজেনের ভাষায়, 'আমাদের মনের নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই; এক-এক সময় এক-একটা মুড এসে মনকে দখল করে; নানা রকমের অনেকগুলো মুড নিয়ে আমাদের মন। একটার সঙ্গে একটা মেলে না; কিন্তু তখনকার মতো প্রত্যেকটা মুডই সত্যি।' দ্বিজেন একটু থামতেই মালিনী বলতে লাগল, 'একমাত্র সত্যি মানে, তখনকার মতো। বলা যায় আমাদের নানা রঙের নানা রকমের অনেকগুলো মন; একজন মানুষ আসলে অনেক; এই অনেকের প্রত্যেকটিই সে নিজে: প্রত্যেকটি সমান সত্য।' স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মধ্যেও বিরোধের অন্ত নেই; তার মন আর মত ক্ষণে-ক্ষণে বদলাচ্ছে। 'আমার মত এই' বলা মানেই এখন আমার মত এই; কারণ ছঘণ্টা পরে যে সে মত বদলাবে না, তার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নেই। যেমন দিনের বেলায় একঘর লোকের মধ্যে বসে আমরা ভূতের ভয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি; কিন্তু অমাবস্যার রাতে বটগাছের নিচে দিয়ে যেতে যেতে কম্পিত কলেবর। মালিনীর মতে ভূত, ভগবান, ভালোবাসা তিনই মুডের ব্যাপার। 'ভালোবাসা বলতে technically যা বোঝায়, তাও মনের অসংখ্য মুডের একটিমাত্র। সবসময় কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারে না।'

দ্বিজেন মালিনীর কথার প্রতিবাদ করলে, বায়োলজির এম. এ. মালিনী আলোচনার গভীরে প্রবেশ করে বিয়ের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রয়োজন বিষয়ে যে দীর্ঘ বক্তৃতাটা দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বিষয় হতে পারত। বক্তৃতা শেষ করে মালিনীর নিজেরও তাই মনে হয়েছে।

"যবনিকাপতন" উপন্যাসে মৃগাঙ্ক আর অমিয় দুই বন্ধু। কিন্তু দুজন বিপরীত স্বভাবের আর বিরুদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসী। মৃগাঙ্ক অন্তর্মুখী আর অমিয় বহির্মুখী। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই দুটি চরিত্রকে লেখক একত্র করেছেন। শুরু হল বাঁচার মানে নিয়ে বাক্-যুদ্ধ। 'ফাসটলাইফ' বা 'কুইক্‌টিজমে' আস্থাশীল অমিয়র ধারণা বাঁচার মানে 'উপভোগ ···জীবনের পিছে পাগলের মতো ছুটে বেড়ানো—যাতে কোনো দিক থেকে এক কণাও না হারাতে হয়?' আর মৃগাঙ্কর মতবাদ—জীবনের আনন্দ উপভোগের উপকরণের পরিমাণ দিয়ে নয়, অভিজ্ঞতার নিবিড়তার পরিমাপে।

এ প্রসঙ্গে মৃগাঙ্কর ভাবুক মনে আধুনিক সুখবাদের উৎস আর স্বরূপ সম্পর্কে ধারণার উদয়। বন্ধু অমিয়র জীবনচর্চার কথা ভাবতে-ভাবতে তার মনে হয়েছে—বহির্মুখী ইন্দ্রিয়নির্ভর জীবন বণিকসভ্যতার দান। একা অমিয় নয়, 'পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই আজ অমিয়র মতো; বর্তমান সভ্যতা এই নবসম্ভোগধর্মে দীক্ষা দিচ্ছে মানুষকে; কারণ সম্ভোগের জন্য যত বেশি মানুষ যত বেশি করে বাইরেরটাকে অবলম্বন করবে, ততই ব্যবসার লাভ; এবং ব্যবসাই বর্তমান সভ্যতার প্রাণ। যার যত বেশি খরচ করবার ক্ষমতা আজকের দিনে তারই আসন তত উপরে। ফোর্ডের দেশ আমেরিকায় এই অর্থপূজার সূত্রপাত, কিন্তু আস্তে-আস্তে তা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াচ্ছে; ইংরেজ বণিকের কৃপায় ভারতবর্ষে এই আধুনিকতম দেবতার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হল।'

বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে যে সময়ে বেনিয়া ইংরেজ শিক্ষা-সংস্কৃতি ভারতে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়েই বুদ্ধদেব বসু কল্পনা করেছিলেন ভোগসর্বস্ব বেনিয়া সভ্যতার সংকটের দিক। অমিয় সেই ভোগী উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রতিনিধি, আর মৃগাঙ্ক ত্যাগমৌন ভারতীয় শান্তজীবনের প্রতিভূ।

"রডোডেনড্রনগুচ্ছ" উপন্যাসে রডোডেনড্রন ফুলের মতো ঝকঝকে তকতকে আপাত-উজ্জ্বল একগুচ্ছ নারীপুরুষ একত্র হয়ে শুধু আলাপ-আলোচনা করেছে। নিজেদের ঘিরে প্রায়-অর্থহীন কথার জাল বিস্তার করেছে। এসেছে আধুনিক মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, নারীস্বাধীনতা আর বিয়ের সমস্যা নিয়ে আলোচনা।

প্রথমে সুমিত্রা-নীলিমা আর শীলা এই তিনজনে প্রেমে পড়ার অবস্থা ও প্রেমানুভূতির রকমসকম নিয়ে বাক্-বিনিময় করেছে। এই আলোচনার মধ্যে তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থিত হলেন নীলিমার মামা নটরাজ নাগ। তিনি মডার্ন মহিলাদের বিরোধী, বিরোধী তাদের শিক্ষাদীক্ষার কেননা আধুনিক শিক্ষার ঘোড়-দৌড়ের পিছনে ঘুরে-ঘুরে হয়রান হয়ে মেয়েরা নিস্তেজ হচ্ছে, প্রাণশক্তি মরে যাচ্ছে। যে লাবণ্য আর মাধুর্য মেয়েদের অলংকার তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে এরা চারজন নারীস্বাধীনতা, সমানাধিকার, আত্মনির্ভরতা আর আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক নিয়ে তর্কবিতর্ক করেছে।

"যবনিকাপতন-রডোডেনড্রনগুচ্ছ-সানন্দা" — এই তিনটি উপন্যাস বুদ্ধদেব বসুর আত্মভাবনাসূত্রে গাঁথা। সমকালে নিজের পাঠক, সমালোচক ও প্রকাশকের কাছ থেকে যেসব বিরুদ্ধ বচন তাঁকে শুনতে হয়েছিল, সেসবের আলোচনা, জবাব এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ওকালতি এ রচনাগুলিতে বড়ো বেশি। প্রতিটি উপন্যাসে একজন করে কবি-সাহিত্যিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। আর অন্যান্য চরিত্ররা হয় সেই কবি-লেখকের ভক্ত অথবা বিরোধী সমালোচক। "যবনিকাপতনে"র মৃগাঙ্ক, "রডোডেনড্রনগুচ্ছে"র পুরন্দর, "সানন্দা"র সঞ্জয় বুদ্ধদেব বসুরই আত্মপ্রতিকৃতি। কখনো এই লেখক ভক্তের দ্বারা উৎপীড়িত, কখনো সমালোচনায় ব্যঙ্গবিদ্ধ, কখনো অভিযুক্ত। সমকালের সাহিত্য-পরিবেশের একটা ধারণা করা যায় এই উপন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে।

"সানন্দা"র গ্রন্থপরিচয়ে জানানো হয়েছে 'এই উপন্যাসে বুদ্ধদেবের লেখক-জীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ে কল্লোল-প্রগতি যুগ যদিও শেষ হয়েছে তবুও তার রেশ রয়ে গেছে। সাহিত্যিক মহলকে তখন প্রধানত তিনটি দলে বিভক্ত করা যায়। রক্ষণশীল দলের মুখপত্র হিসেবে ধরা যায় প্রবাসী, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকা গোষ্ঠীকে। 'কল্লোল-প্রগতি' গোষ্ঠীকে তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় 'শনিবারের চিঠি' গোষ্ঠীর কাছে। এরা রবীন্দ্র বিদ্বেষী বলে যেসব লেখকদের চিহ্নিত তাদের মধ্যে প্রধান বুদ্ধদেব বসু।'[১১] এই মতের অসারতা প্রতিপাদন করার জন্য সঞ্জয়ের মুখ দিয়ে যা বলিয়েছেন তা বিশেষ মনোযোগের বিষয়।

সানন্দা অভিযোগ করেছে সঞ্জয়কে—'আসল কথা তোমরা আজকাল রবীন্দ্রবিরোধী হয়েছো, তাঁকে আর সম্মান করতে চাও না।' উত্তরে সঞ্জয় বলেছে: 'অভিযোগটা পুরনো। রবীন্দ্রনাথকে আমরা সম্মান করিনে; মানে গোড়া থেকে আমরা তাঁর পেশাদার ভক্ত হতে অস্বীকার করেছি।···সমস্ত মন দিয়ে তাঁর কাব্যের রসাস্বাদ করেছি, তাঁর প্রসাদে এর বেশি কোনো দাবী আমাদের নেই।···তাঁর মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে যত বড় সম্মানেরই হোক, নিজের নিজত্বকে সেখানে হত্যা করতে হয়, এবং সেখানেই আমাদের আপত্তি।···রবীন্দ্রনাথকে যতদিন পূজা করেছি, একটা লাইন লিখতে পারিনি, যা আমার লেখা বলা যায়, যেদিন তাঁকে আমারই মত একজন মনে করতে পারলুম সেদিন থেকে যা লিখেছি, তা খারাপ হ'লেও তার খারাপত্বটা আমারই নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথকে অপছন্দ করতে শিখে আমি বেঁচে গেলুম।'

"রডোডেনড্রনগুচ্ছ" উপন্যাসে তিন শ্রেণীর সাহিত্যিকের পরিচয় পাচ্ছি। এই সাহিত্যগোষ্ঠীর পরিচয়প্রকাশ অনেকটাই শ্লেষাত্মক। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাসের মধ্য দিয়েই মনের ঝাল ঝেড়েছেন। শ্রীমতী চন্দ্রিকাদেবী বাঙলা উপন্যাসের ট্রাডিশনাল লেখিকা। রক্ষণশীলদের তিনি মুখপাত্র। সেনটিমেনটাল কাহিনী প্রথানুগ উপমায় সাজিয়ে ভারিক্কি ভাষায় বলা চন্দ্রিকার উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। 'দূরের বাঁশী' বইখানা লিখে সে খুব খুশি হয়েছে; খুব প্রশংসা হয়েছে কাগজে আর সমালোচক মহলে। সবাই উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাক্য বর্ষণ করেছে অজস্র। একটি দৈনিক ইংরেজি কাগজ তাকে 'the leading novelist

of Bengal' বলে আখ্যাত করেছে। ধীরাজপ্রসন্ন মহলানবীশ হলেন লিরিক কবি। তিনি কবিতা রচনায় ইনসপিরেশনে গভীর আস্থাশীল। তাঁর মুখে-মুখে রবীন্দ্রস্তুতির অসমাপ্ত বাক্য। তিনি রবীন্দ্র অনুকরণে ছন্দমিলের যে জোলো কবিতা লেখেন, সে জন্যে আত্মশ্লাঘা বোধ করেন। আর নটরাজ নাগ পুরন্দরের উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় উল্লেখ করেছে, তা বলাই বাহুল্য বুদ্ধদেব সম্পর্কে বহু উত্থাপিত। নটরাজ নাগের মত প্রবন্ধের প্রথমেই লিপিবদ্ধ করেছি।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে তর্কবিতর্কের বদলে কাব্যের আমেজ এসেছে। তৃতীয় পর্যায়ে আবার কোনো-কোনো উপন্যাসে পাওয়া যায় বাক্-যুদ্ধের লঘুস্পর্শ। এই তর্কধর্ম জীবনপরিবেশ থেকে সঞ্চারিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট নৃশংস বর্বরতা, প্রগতি লেখকশিল্পীদের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন-জোট—এইসব বিশ্বব্যাপী আলোড়ন অনুভূতিশীল শিল্পীর মানসপটে সাড়া জাগিয়েছিল। মার্কসবাদ তখন প্রসারলাভ করেছে বাঙলাদেশে। বিশুদ্ধ শিল্পরীতিকে বরবাদ করে, মার্কসবাদী শিল্পীরা সাহিত্যকে সমাজবিপ্লবের হাতিয়ার করে তোলার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর আত্মমগ্ন শিল্পকে তাঁরা বিরুদ্ধ-সমালোচনায় জর্জরিত করলেন। বুদ্ধদেব বসু স্বরচিত নিভৃত কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রগতি আন্দোলনের কবিশিল্পীর সরণিতে। এই পটভূমিকায় লেখা তাঁর "তিথিডোর" (১৯৪৯) ও অনেক পরে লেখা "বিপন্ন বিস্ময়" (১৯৬৯) উপন্যাস দুটিতে বিশ্বপরিস্থিতি, মার্কসবাদ ও বিশ্বসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তর্ক-বিচার আর আলোচনা আছে। "তিথিডোরে"র হারীত উগ্র-কমিউনিস্ট উৎসাহী যুবক। হারীতের মাধ্যমে তিনি রাজনৈতিক চিন্তা উপন্যাসে এনেছেন। বিশ্বপরিস্থিতির সংকটের কথা, যুদ্ধের কথা, রাশিয়ায় ইংরেজদের পশ্চাদপসরণের কথা, হিটলার আর স্টালিনের কূটকৌশলের কথা, কলকাতায় ব্ল্যাক আউট, বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে গ্রামেগঞ্জে পালিয়ে যাবার কথা—সবই তিনি শুনিয়েছেন হারীতের মুখ দিয়ে। কিন্তু এ উপন্যাসে তর্ক তেমন জমে ওঠে নি উপযুক্ত প্রতিপক্ষের অভাবে। এখানে হারীত যেন খাপছাড়া, বেমানান। কমিউনিস্ট হিসেবেও হারীত চরিত্র সার্থক নয়। সে যেন লড়াই-পাগল, ছিটগ্রস্ত, মাথার-ক্রু-আলগা, স্নানকালপাত্র-জ্ঞানহীন, যত্রতত্র যাকে তাকে ধরে যুদ্ধের কথা শোনাতে ব্যস্ত, অতিহিংসেবী কঞ্জুস। যেন যুদ্ধের মজা দেখবার জন্য সে ওত পেতে অপেক্ষা করছে। প্রগতি সংঘ ও প্রতিরোধ সংঘের কথা ছাড়া আর কোনো কার্যপ্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায় না। হারীত বুদ্ধদেব বসুর বাঙালি কমিউনিস্ট সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবের স্মারক হয়ে আছে মাত্র।

মার্কসবাদী সাহিত্য-সেবকদের বিরূপ সমালোচনায় উদ্যক্ত হয়ে বুদ্ধদেব বসু জবাব দিয়েছিলেন বড়ো দেরিতে "বিপন্ন বিস্ময়" উপন্যাসে। যেমন রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধ-বচনে ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিয়েছিলেন "শেষের কবিতা"য়। 'সপ্তর্ষি সাহিত্য গোষ্ঠী' আয়োজিত সাহিত্য-আলোচনাসভায় বাগ-বিতণ্ডা হচ্ছিল : বিষয় বাঙলা সাহিত্য। প্রথম বক্তা রথীন্দ্রনাথ রায় বিশ শতকের বস্তুবাদী সাহিত্যের প্রবক্তা। আর তার অভিযোগ না বললেও চলে অক্ষরে-অক্ষরে বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধে। রথীন্দ্রনাথের পরে মঞ্চে উঠল শ্রীপতি। সে একটা আস্ত প্রবন্ধের বিষয় হতে পারত। বলাই বাহুল্য এ বক্তব্য বুদ্ধদেব বসুর আত্মপক্ষসমর্থনের ওকালতি।

আইডিয়া-নভেলের অনেক ত্রুটি আছে। উপন্যাসে আমরা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত চাই, চরিত্রচিত্রণ চাই, চাই চরিত্রের বিকাশ-বিবর্তন। উপন্যাসের চরিত্ররা হবে ব্যক্তিবিশেষ; এপিক উপন্যাসে আমরা চরিত্রকে শ্রেণীর বা জাতির প্রতিনিধি হিসেবেও পাই। তথাপি উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, সংঘাত, বিশ্লেষ-সংশ্লেষ দেখানো একান্ত জরুরি। এইজন্যেই সফল

উপন্যাসে চরিত্ররা নিজের স্বভাবের ন্যায় অনুসারে চলে। ঔপন্যাসিকের কলম তাদের সেই পথে চলতে দেয়। চরিত্ররা স্বভাবানুযায়ী বিকশিত হয়ে ওঠে—জীবন্ত মানুষের মতোই, লেখক তাদের বিকাশ-বিবর্তনে সাহায্য করেন, কিন্তু খবরদারি করেন না।

কিন্তু আইডিয়া-নভেলের চরিত্রগুলিকে আইডিয়ার জগৎ থেকে আহরণ করতে হয়। এই আইডিয়ার জগৎ হল লেখকের মন। ফলে উপন্যাসের চরিত্রগুলি এগিয়ে যায় স্রষ্টার চিন্তার ধাক্কায়-ধাক্কায়। লেখকের মনের চিন্তার ক্রমানুসরণে তাদের পদক্ষেপ। লেখকের বিশেষ ভাব বা আইডিয়া বা সমস্যার সমাধান এবং বক্তব্য শেষ হলেই চরিত্রকে তিনি থামিয়ে দেন। এইজন্য অনেক সময়ই দেখা যায়—আইডিয়া-নভেলের চরিত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে; ভাবুক লেখক তাঁর অধীত অর্জিত বিদ্যা, চিন্তাচেতনা, অভিজ্ঞতা, তত্ত্বসমস্যা এবং মনোবিকলনের ফলকে তর্কপ্রতর্কের রূপে উপন্যাসে পাতার পর পাতা প্রকাশ করতে থাকেন। এসব জ্ঞানগর্ভ বিষয়-বক্তব্য লেখক প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করতে পারতেন—কিন্তু তা না-করে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বক্তব্যকে জীবনঘনিষ্ঠতা দান করে, সরস করে প্রকাশের চেষ্টা করেন।

ফলত, এ ধরনের উপন্যাস সম্পর্কে প্রধান আপত্তি হল চরিত্রগুলি স্ব-ছন্দ হারিয়ে যান্ত্রিক আর কৃত্রিম হয়ে পড়ে। তাদের স্বাভাবিক বিকাশ-বিবর্তন রুদ্ধ হয়। আদ্রে জিদ সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, আইডিয়া-নভেলে চরিত্ররা স্বসমুখ (emergent) না হয়ে লেখকের মনগড়া হয়ে যায়।[১২]

জিদ এবং হাক্স্‌লি উভয়েই আইডিয়া-নভেল বা প্রবলেম-নভেলের সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। রূপকল্প এবং প্রযুক্তি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু জিদ নিজে এই ধরনের উপন্যাস রচনা করেন নি। তিনি এ ধরনের উপন্যাসের অপঘাতের আশঙ্কা বিবেচনা করে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এডওয়ার্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আইডিয়া-নভেল লেখার ভার। তিনি নিজে মানুষ নিয়েই উপন্যাস (novel about man) লিখেছিলেন। হাক্স্‌লি নিজে আইডিয়া-নভেলের টেকনিক ব্যবহার করেছেন "পয়েন্ট কাউনটার পয়েন্ট" উপন্যাসে।

দুর্বল লেখকের হাতে প্রবলেম-নভেল মাঠে মারা যায়; শক্তিমান লেখক প্রবলেম-নভেল রচনায়ও উতরে যেতে পারেন। আসল কথা হল, প্রবলেম-নভেলের সাফল্য নির্ভর করে প্রবলেমের ব্যবহারের ওপর। যদি সমস্যার জ্ঞানগর্ভ গুরুভার আলোচনা পাত্রপাত্রীদের মরণবাঁচন সমস্যার সঙ্গে, তাদের মানস-বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত না হয়ে, আলগাভাবে জলের ওপর তেলের মতো ভেসে থাকে, যদি কথার ফুলঝুরি তাদের আঁতের কথা না-হয়ে লেখকের চাপিয়ে দেওয়া বোঝা হয়, তবে উপন্যাস ব্যর্থ হতে বাধ্য। তত্ত্ব আর বুলির ঠেকা দিয়ে চরিত্রকে দাঁড় করিয়ে রাখা যায় না, যদি না ভিতর থেকে অনিবার্যভাবে তত্ত্ব উদ্‌গত হয়।

বিশ শতকের প্রথম দিকেই অনেক বাঙালি লেখক উপন্যাসে এনেছিলেন মননের নকশা। তাঁদের মধ্যে অন্নদাশংকর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং গোপাল হালদারের নাম করতে হয়। অন্নদাশংকর-ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদারের সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর তুলনা ঠিক মানায় না। ধূর্জটিপ্রসাদ এবং গোপাল হালদার নিজেদের মার্কসবাদী বলে দাবি করেছেন। 'আমার জীবনে মার্কসবাদের প্রভাব বেশী।···সমাজ-তত্ত্বের ইতিহাসে মার্কসিজম চলে, তাই এখনও লিখি। আমার নভেলেও তাই আছে।'[১৩]

অন্নদাশংকর মার্কসবাদী না হলেও, তিনি মনে করেন ব্যক্তিসর্বস্বতা বলে কিছু নেই, দেশকালের বৃহৎ জনজীবনের সঙ্গে মিলিত হয়েই ব্যক্তির বাঁচার অর্থ। বুদ্ধদেব বসু সেখানে অন্তর্মুখীন, "আত্মার সৌরভে"র পূজারী। মধ্যবিত্ত এনটেলেকচ্যুয়েল মানুষের পারসোনালিটি সন্ধান চারজনেরই লক্ষ্য। চারজনেরই উপন্যাসে কুশীলবেরা ব্যক্তিত্বের চরিতার্থতা

এবং সমগ্রতা সন্ধান করেছে। এই সন্ধানের প্রক্রিয়া আর অভিপ্রায়ের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে এঁদের তফাত ধরা পড়ে।

প্রখর বুদ্ধির চর্চায় "সত্যাসত্যে"র বাদল সমস্ত বিশ্বাসকে খুঁড়ে-খুঁড়ে অবিশ্বাসের অন্ধকার জগতে পৌঁছল। সেই নেতিবাদ বাদলের মতো ইনটেলেকট-সর্বস্ব মানুষকে অর্থহীন জীবনের নিশ্চিত পরিণাম মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিল।

গোপাল হালদারের "একদা"র কাহিনীবৃত্ত ১৯৩০ সালের ডিসেমবর মাসের একদিন। নায়ক অমিত সমকালের জটিল জীবনাবর্তের মধ্যে পড়ে বুদ্ধিবাদী মননের মধ্য দিয়ে বোধ-বিশ্বাসের তীরে এসে পৌঁছল —এটাই উপন্যাসের বিষয়। সমকালীন ঘটনাবর্ত বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিক্ষোভ এবং আন্দোলনকে। অমিত অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী সশস্ত্র বিপ্লব এবং মার্কসবাদী কর্মপদ্ধতি সবগুলোর সঙ্গে জড়িত। সবকটি প্রত্যয়ই তার মননশীল চেতনায় সাড়া জাগিয়েছে, জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের প্রেরণায় আত্মসমীক্ষার পথে চলে সে আবিষ্কার করল 'সে আত্মসর্বস্ব নয়—তাহার সত্তা নিজেকে চিনিয়াছে বলিয়াই তো সে নিজেকে কালের সহিত, কাজের সহিত মিলাইয়া লইতে চায়।' তার খণ্ডীভবনের যন্ত্রণা এই বিচ্ছিন্নতার অনন্বয়ের। সে উপলব্ধি করেছে দেশের বিপুল জনগণের সঙ্গে মিলনেই ব্যক্তির পূর্ণতা। শুধু মিলন সম্ভব কর্মের মধ্য দিয়ে। অমিতের জীবনের মানে খোঁজার, তার যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে মধ্যবিত্তের বৃত্ত-পরিবেশ থেকে বেরিয়ে বৃহৎ শ্রমজীবীর সংগ্রামের অংশিদার হয়ে।

ধূর্জটিপ্রসাদের "অন্তঃশীলা"র খগেনবাবুর অংশীভবনের যন্ত্রণাও, দেশের বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে যোগহীনতার যন্ত্রণা। "মোহনা"য় এসে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যেই সে লাভ করেছে বৃহতের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে আত্মিক যোগ। অতএব দেখা যাচ্ছ, এঁদের উপন্যাসে মননের সোপান আদতে জীবনেরই সোপান, যা বেয়ে চরিত্ররা উঠে গেছে জীবনের বোধ আর বোধির সিনথে সসে।

বন্ধদেব বসুর উপন্যাসে সব চরিত্রই অন্তর্মুখী, আত্মসর্বস্ব। অপূর্ণতার, অচরিতার্থতার, অসার্থকতার যন্ত্রণা তারাও ভোগ করে, কিন্তু এই অপূর্ণতার যন্ত্রণা —সমষ্টির সঙ্গে ব্যক্তির অনন্বয়ের যন্ত্রণা নয়। এই বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রেমের, হৃদয়ে হৃদয় যোগ করতে না পারার। ব্যক্তিক জীবনে শত্রুক-সংকীর্ণ বৃত্তপরিবেশেই এরা বাঁচে, শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। কখনো-বা আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধের অমোঘ যন্ত্রণা-তাড়িত হয়ে অজ্ঞাতপূর্ব বিচলন অনুভব করে কেউ-কেউ।

প্রতিকারহীন আত্মবিশ্লেষণের মননের নকশা বুনে-বুনে "লালমেঘ" উপন্যাসের নায়ক অবিনাশ বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে। মধ্যবিত্ত মনের দোলাচলতা তার মনে। একদিকে অসুস্থ স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধ, অথচ স্ত্রীর সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয় নি, হবার নয়, উপায় নেই। অন্যদিকে সন্ধ্যামণির প্রতি সে অনুরক্ত। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করতে পারছে না। বাধা তার মনে। একদিকে রুগ্না স্ত্রীর প্রতি মানস-কর্তব্য ও বিবেকদংশ, অন্যদিকে প্রাণময়ী প্রেমকে চেতনার গভীরে গ্রহণ না-করতে পারার আত্মপীড়ন—এই দোটানায় মথিত অবিনাশ। হৃদয়ের সঙ্গে তার মস্তিষ্কের জটিল দ্বন্দ্ব। কিন্তু সে উত্তীর্ণ হতে পারে নি বুদ্ধি থেকে বোধিতে। লেখক সমস্যার সহজ সমাধান করেছেন, সন্ধ্যার মৃত্যু ঘটিয়ে, স্ত্রীকে সুস্থ করে দিয়ে।

বুদ্ধদেব বসুর বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের মধ্যে সবচেয়ে চতুর আর জটিল "বিপন্ন বিস্ময়"। শ্রীপতি-আরতির অস্তিবাদ সদাশঙ্কিত স্বাধীনতাবোধের আলোছায়ার টানাপোড়েনের বুননে তৈরি উপন্যাসের অবয়ব। শ্রীপতির স্বাধীনতাবোধ কোনো-কিছুর বিনিময়েই খোয়াবার নয়, এমনকি প্রেমের কাছেও না। আরতি

একদিন গুরু শ্রীপতির কাছেই স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। সেই আরতি ভালোবেসেও শ্রীপতির কাছে বঞ্চিত হয়েছে। জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, দেশবিদেশ ঘুরে একদিন কলকাতায় ফিরে সংকল্প করল শ্রীপতির কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। কেননা ভালোবাসার বন্ধন—স্বাধীনতা হারানোর ভয়, সে স্বাধীন থাকতে চায়, অন্যের ইচ্ছার লঘু স্পর্শও নিজের ব্যক্তিজীবনে পড়তে দিতে নারাজ। তাই আমেরিকায় রডম্যানকে বিয়ে করেও, আবার সেই রডম্যান থেকে মুক্তি। উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্সে শ্রীপতির যক্ষ্মারোগের সূত্রে আরতির সান্নিধ্যলাভ—মুহূর্তেই শ্রীপতির মন পলায়নপর, স্বাধীনতা হারানোর ভয়। এক যন্ত্রণাময় অস্তিত্ব যা প্রতিমুহূর্তে কুরে-কুরে খায়, এক অদ্ভুত ভালোবাসা যা 'ছেলেমানুষি বোকামিপূর্ণ', স্বাধীনতার সংকট-প্রেমের টানাপোড়েনেই সন্ধানযোগ্য হয়ে ওঠেছে। শেষে আরতি-শ্রীপতির স্বাধীনতাবোধ শূন্যতাবাদের আশ্রয় নিয়েছে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। এই বিচ্ছেদ করুণ এবং নির্মম, কেননা যন্ত্রণায় আকণ্ঠ ডুবে রক্ষা করতে হল স্বাধীনতা—যার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল 'শরীরের যন্ত্রণা, মনের জ্বালা, আত্মার গ্লানি, হতাশা, বিতৃষ্ণা' এমনকি 'আত্মহত্যার সংকল্প।'

বুদ্ধদেব বসুর কোনো চরিত্রই আত্মনির্মোক থেকে মুক্ত হতে পারে না। আত্মার যন্ত্রণা বৃহৎ জগৎ-ব্যাপারে ব্যাপ্ত করে দিয়ে দিতে পারেন নি বুদ্ধদেব তাদের আত্মচরিতার্থতার পাশমার্ক। তাঁর প্রিয় ঔপন্যাসিক হাক্‌স্‌লিও বুদ্ধি থেকে বোধিতে উঠে যান। উত্তীর্ণ করেছেন তাঁর অনুকম্পায়ী চরিত্র র‍্যামপিয়নেকে বুদ্ধির বর্ম থেকে বোধির স্তরে। অম্লদাশংকরের চেতনা ইনটেলেকট-এর পথ বেয়ে বোধির সোপানে উঠে যায়। বাদলের ব্যর্থতা পূর্ণ হয় সুধীর মধ্যে।

বুদ্ধদেব বসুর "যবনিকাপতন-মনদেয়ানেয়া--রডোডেনড্রনগুচ্ছ-সানন্দা" উপন্যাসগুলো পড়লে মনে হয়—লেখকের পাণ্ডিত্য আছে, সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, রসবোধ আছে, ভূয়োদর্শন না থাকলেও ভূয়শ্চিন্তা আছে; —তবে ইমারত গড়তে পেরেছেন কিনা সন্দেহ আছে।

"যবনিকাপতন" উপন্যাসে বলা হয়েছে মৃগাঙ্কর শ্রমিক-মৌমাছির মতো পরিশ্রমের কথা। রাত জেগে প্রুফ দেখে, কলেজে টিউটরিয়েল ক্লাশের জন্য নোট লেখে। কাগজ চালায়, মাসিকপত্রে কিস্তি লেখে, আবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে বরাবর, প্রকাশকের কাছে পাওনার জন্য ধরনা দেয়—এসব গালভরা কথা মৃগাঙ্কর জীবনের বিকাশ-বিবর্তনে কোনো কাজে লাগে নি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর মননের সোপান জীবনের সোপান হয়ে উঠতে পারে নি। যেন এসব শোনাবার জন্যই শোনানো হয়েছে।

আসলে বুদ্ধদেব বসুর এমন কতগুলি বিষয় আছে যেগুলো তিনি পাঠককে শোনাবেন, শোনাবেনই। এইজন্য বহু বিষয় তাঁর উপন্যাসে ঘুরেফিরে এসেছে। "আমার ছেলেবেলা", "আমার যৌবন"-এর অনেক অংশ উপন্যাসের পাতা থেকে মিলিয়ে নেওয়া যায়। উপন্যাস লেখার মধ্যেও আত্মগত ভঙ্গিই তাঁর অনেক বাতিক চালিয়ে দিয়েছে উপন্যাসে। সংলাপকে সংবাদ বলা চলে। নানা চিন্তামূলক বিষয়ে পরিকীর্ণ তাঁর রচনা। এইগুলো পাঠককে বোঝাতে আগ্রহ তাঁর কম নয়। অল্পশিক্ষিত সাধারণ গল্প-খাদক পাঠক আর চটুল অগভীর মহিলা-পড়ুনিদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ এবং ধূর্জটিপ্রসাদের মতোই। জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আর নিজের অন্তঃস্থল খুঁড়তে-খুঁড়তে চরিত্ররা সমতলের থেকে এমন চড়াইয়ে উঠে যায়, যেখানটা সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। তখন তাঁর উপন্যাস প্রাক্-চল্লিশ ডেলিপ্যাসেনজার আর উত্তর-তিরিশ প্রৌঢ় স্ত্রীর পাঠযোগ্য থাকে না।

বুদ্ধদেব বসুর মতোই তাঁর পাত্রপাত্রী স্বেচ্ছানির্বাসিত, স্থান তাদের ধ্যানের উপযোগী। একাএকা জলের মতো ঘুরে-ঘুরে কথা বলতে তাদের ভালো লাগে। অন্যের বুদ্ধিতে শান দিয়ে নিজের চিন্তার ধারকে পরখ করে নেবার পক্ষপাতী এরা। সেইজন্য তাঁর তর্কের টেবিলে ঝড় ওঠে না বেশি। প্রতিপক্ষ

যেন নিজের অজ্ঞতা আর অসম্পূর্ণতার সম্পূরণ মাত্র। নিজেরই অন্য সত্তার সঙ্গে কথা বলা। যেমন "সানন্দা" উপন্যাসে সঞ্জয় যখন লেখকের জীবনে ভক্তের উৎপাত নিয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলে তখন তাতে নাটকীয় স্বগতভাষণের আমেজ পাওয়া যায়।

মূল কথা, বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে সমালোচনা, মূল্যায়ন, পুনরমূল্যায়ন, ব্যঙ্গের ঝালমশলার আধিক্য। সেই সমালোচনা জীবনবিন্যাসের ইমারজেন্ট ব্যাপার নয়। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সব মিলিয়ে কল্লোল যুগের সাহিত্যকীর্তির সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু সন্দেহেও সেই কথা।[১৪] অর্থাৎ তাঁর উপন্যাস রচনার পিছনে সমালোচনা করব—এরকমের কোমরবাঁধা পালোয়ানি যতখানি ছিল, জীবনের রূপাঙ্কন আর মানে খোঁজার আন্তর-প্রেরণা ছিল তার চেয়ে অনেক কম।

উল্লেখসূচী :

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যে আধুনিকতা, সাহিত্যের স্বরূপ, পৃ. ২১।

২। J. W. Beach : The Twentieth Century Novel, Studies in Jechnique, p. 463.

৩। Aldous Huxley : Point Counter Point, p. 299.

৪। বুদ্ধদেব বসু রচনাসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৫। Aldous Huxley : Point Counter Point, p. 196.

৬। J. W. Beach : The Twentieth Century Novel, Studies in Technique, p. 46[৫].

৭। বুদ্ধদেব বসু : রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য, পৃ. ১৭।

৮। বুদ্ধদেব বসু : আমাদের কবিতাভবন (আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ), দেশ, শারদীয় ১৩৮১, পৃ. ২১।

৯। ৬ই চৈত্র ১৩৫২ সালে নরেশ গুহকে লেখা বুদ্ধদেব বসুর চিঠি। কলকাতা : বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, ডিসেমবর ১৯৬৮—জানুয়ারি ১৯৬৯, পৃ. ৮৫।

১০। Arnold Kettle : An Introduction to th English Novel, p. 167.

১১। বুদ্ধদেব বসু রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃ. ৬৬৯।

১২। J. W. Beach : The Twentieth Century Novel, Studies in Jechnique, p. 466.

১৩। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : ঝিলিমিলি (ডায়েরি), ২২।৫।'৫৮ তারিখে লেখা, পৃ. ১।

১৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ২৮৩।

অগস্ট সংখ্যায় সমালোচিত **"দ্বন্দ্ব"** গ্রন্থটির লেখক অধ্যাপক শঙ্কর ভট্টাচার্য বিহার বাঙালি সমিতির উত্তর বিহার অঞ্চলের সম্পাদক ; ভুল করে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে বিহার বাংলা আকাদেমির সম্পাদক বলে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ (আওয়ারা মসীহা)—বিষ্ণু প্রভাকর, অনুবাদ দেবলীনা ব্যানার্জি কেজরিওয়াল। ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা-৭২। পঁচাত্তর টাকা।

বাঙলায় শরৎচন্দ্রের কোনো প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ নেই। একবার রবীন্দ্রনাথ নাকি তাঁকে আত্মজীবনী লিখতে বলেন। শুনে তিনি বলেন, 'গুরুদেব! যদি জানতাম আমি এত বড় হব, তাহলে অন্যরকমভাবে জীবন কাটাতাম।' এই একই অনুরোধের জবাবে তিনি নাকি অবিনাশ ঘোষালকেও শুনিয়েছিলেন, 'দেখ! লেখকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়ার কি প্রয়োজন? লেখক বলে কি তাঁকে নিজের জীবনের সব কথা সবাইকে বলতে হ'বে?···লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর লেখক-জীবন এক নয়। কোন কারণেই এ দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আমার লেখায় যেটুকু নিজেকে ব্যক্ত করেছি, সেইটুকুই আমার পরিচয়।'

লেখক হয়তো এসব কথা শুনিয়ে তখনকার মতো নিষ্কৃতি পেতে পারেন। কিন্তু তাঁর অনুরাগী পাঠকদের কৌতূহল তাতে নিরস্ত হয় না, বরং বেড়ে যায় আরও। জানতে চায় এমন কী আছে তাদের প্রিয় লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে যা তিনি এমন সযত্নে আড়াল রাখতে চান? জানতে চাইলেও জানাটা কিন্তু আদৌ সহজ নয়। স্বয়ং লেখক আত্মগোপনপ্রিয়। তাঁর ভবঘুরে জীবনের পথপরিক্রমাটাও বেশ দীর্ঘ এবং জটিল। তাঁকে ঘিরে নিন্দা, ঘৃণা আর কুৎসার হাজারো কাহিনী। জীবদ্দশাতে তিনি নিজে এর কোনো প্রতিবাদ করেন নি; সম্ভব-অসম্ভব মুগরোচক নানান গল্পে আরও পল্লবিত করে নিজের চারদিকে উলটে নিজেই একটা কুহেলিকা সৃষ্টি করেছেন। এসব বাধা পেরিয়ে তাঁর সত্যিকারের জীবনকথা উদ্ধার ভীষণ কঠিন। এতে যে-পরিমাণ শ্রম, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠা দরকার তা আমাদের অনেকেরই নেই। এই অবস্থায় যখন আমাদের ভিন্ন-ভাষাভাষী এক লেখক এসে শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ প্রামাণিক জীবনচরিতের দাবিদার একখানা বই আমাদের হাতে তুলে দেন, তখন খুব সংগত কারণেই মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে বসতে হয়।

গ্রন্থসমালোচনা

মূল বইটি লেখা হিন্দিতে—নাম "আওয়ারা মসীহা"। লেখক অবশ্যই হিন্দিভাষী—নাম বিষ্ণু প্রভাকর। বর্তমান আলোচনার ভিত্তি ওই বইটির বাঙলা অনুবাদ—'ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ', অনুবাদিকা দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল। অনুবাদিকার কথায় তিনি অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, বইটি এমন একজন সাহিত্যিকের জীবনকাহিনী যিনি মানুষের মনথেকে আজও বিস্মৃত হয়ে যান নি, যাঁর সমসাময়িক লেখক, বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা আজও বিরল নয়। এমন অবস্থায় শুধুমাত্র অনুবাদের কথা ভাবা যায় না···আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে বইখানি অনূদিত বই না হয়ে মূল গ্রন্থ হিসাবে বাঙালী পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় [পৃ vi-vii]।' অনুবাদিকার এই প্রয়াস মূলের কোনোরকম গৌরবহানি না ঘটিয়েই অনুবাদগ্রন্থটির মর্যাদা বেশ কিছুটা বাড়িয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই।

মূল গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৩—দীর্ঘ চোদ্দ বছর তিনি ব্যয় করেছেন এ কাজে। বাঙলা, বিহার, অন্ধ্রদেশ—সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেই-সমস্ত ব্যক্তির যাঁদের সঙ্গে কোনো-না-কোনো ভাবে শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ ছিল। তথ্য খুঁজেছেন তাঁর সমসাময়িক লেখক আর বন্ধুবর্গের স্মৃতিকথা এবং প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে, সবশেষে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন শরৎচন্দ্রের নিজের রচনার ভিতর থেকে। সমগ্র কাজটা যেমন ব্যাপক তেমনি জটিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সবচেয়ে কঠিন বোধহয় এই শেষের কাজটি। লেখক তাঁর লেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেন ঠিকই; কিন্তু তাঁর জীবন আর মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম না হলে অন্য কারও পক্ষে তাঁকে খুঁজে বার করা সত্যিই অসম্ভব। শ্রীপ্রভাকর সেই অসম্ভবকে অবিশ্বাস্যভাবে সম্ভব করেছেন। আগাগোড়া গল্পের সুরে শোনানো এক দীর্ঘ জটিল জীবনকথা যার তথ্যাবলী লেখকের দীর্ঘ অনুসন্ধানে আহরিত এবং যার পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং চরিত্রাবলী উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের ভিতর থেকে, তাদের মুখের কথা নিয়েই।

শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবনকালকে লেখক ভাগ করে নিয়েছেন মোট তিনটি পর্ব বা অধ্যায়ে। প্রথম পর্বের নাম "দিশাহারা"। দুষ্টশিরোমণি বালক শরতের বাল্যকীর্তি, তার সহপাঠী আর গৃহচরদের প্রকৃতি-পরিচয়, তার কৈশোরপ্রেম এবং পাশাপাশি তাদের

সাংসারিক জীবনের দুঃখদারিদ্র্যের চিত্রকল্প, প্রথমে মা এবং পরে বাবার মৃত্যু—সমস্ত কিছু সাজানো এই পর্বে। অসহায় তিন ভাইবোনকে নিয়ে ছন্নছাড়া শরৎ এই পর্বের শেষে আক্ষরিক অর্থেই দিশাহারা। তবুও এরই মধ্যে শোনা যায় "দেবদাস"-এর পার্বতী, "শ্রীকান্ত"-র রাজলক্ষ্মীর অস্পষ্ট পদধ্বনি এবং অবশ্যই দেখা হয় আমাদের পরিচিত সেই 'রায়েদের ইঙ্গ' ওরফে রাজুর সঙ্গে। ব্যক্তিগতভাবে শরৎচন্দ্রের ওপর কিছু পাঠকের কিছুটা ক্ষোভ আছে—এই ইন্দ্রনাথকে নিয়েই। তার সম্পর্কে শ্রীকান্তর মন্তব্য—'কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদনদী, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দু'টো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর দেখিতে পাই নাই।' সেই মহাপ্রাণকে লেখক শরৎচন্দ্র কিন্তু গাছের শুকনো পাতা ঝরানোর মতো প্রায় নিঃশব্দে পাঠকের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন একটিমাত্র বাক্যে—'বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না।' শ্রীপ্রভাকরও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি; তবে তার অন্তর্ধানরহস্য এবং পরবর্তী জীবনের ওপর সম্ভাব্য আলোকপাত করতে সক্ষম হয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্বের নাম "দিশান্বেষণ"। এই পর্বের শুরুতে ভবঘুরে শরৎচন্দ্র ভাগ্য-অন্বেষণে পাড়ি জমাচ্ছেন বর্মায়। অতঃপর সেখানে চাকরি, মিস্ত্রীপল্লীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, শান্তিদেবীর সঙ্গে বিয়ে, এক বছরের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য-জীবন অন্তে স্ত্রী আর পুত্রের মৃত্যু, আবার ভবঘুরে জীবন, এবং শেষে মোক্ষদা বা হিরণ্ময়ী দেবীর সঙ্গে আবার বিয়ে। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল চিত্রকল্প শরৎচন্দ্রের সামগ্রিক পরিচয়। লেখার অভ্যাস তাঁর আগে থেকেই ছিল। দিদিমা কুসুমকামিনী দেবীর পাঠশালায় "বঙ্গদর্শন"-এর মাধ্যমে এবং প্রকৃতি-বিলাসী পিতা মতিলালের অসমাপ্ত বহু গল্পকাহিনীর মাধ্যমে কিভাবে কিশোর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং নিরুপমা দেবী· মণিমামা, অতুলচন্দ্র মুন্সীর সান্নিধ্য আর প্রেরণায় কিভাবে তাঁর লেখা শুরু হয় "দিশাহারা" পর্বেই তার আভাস দেওয়া হয়ে গেছে। এবার লেখক শরৎচন্দ্রের ক্রম-আত্ম-প্রকাশ এবং পরিশেষে প্রতিষ্ঠায় এ পর্বের সমাপ্তি।

তৃতীয় বা শেষ পর্বের নাম "দিশান্ত"। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে শরৎচন্দ্র পাড়ি জমিয়েছিলেন বর্মায় আর এই পর্বের শুরুতে বর্মা ছেড়ে তিনি কলকাতায় ফিরছেন পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করার জন্যে। এখন তিনি লেখক হিসাবে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত—এটাই তাঁর জীবনের সৃজন-কর্মের স্বর্ণযুগ। পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে তাঁর স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক জীবন—মহাত্মাজী, দেশবন্ধু, সুভাষ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, মতবিনিময়, মতপার্থক্য—সমস্ত কিছু তথ্যনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণে যেন বা এক ঐতিহাসিক দলিল। যাত্রা-নাটকে তাঁর উপস্থিতি আমরা আগেই দেখেছি। এই পর্বে দেখা যায় নাট্যকার শরৎচন্দ্রকে এবং তাঁর কাছাকাছি শিশির ভাদুড়ী, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ নাট্যজগতের প্রবাদপুরুষদের। তাঁর বিভিন্ন কাহিনীর মঞ্চ-উপস্থাপনা ও চলচ্চিত্রায়ণের প্রেক্ষাপটে শোনা যায় নাটক ও জীবন সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। সবশেষে দরদি কথাশিল্পীর মহাপ্রয়াণে শেষ হয়েছে এই পর্বের তথা তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতের।

এ বইয়ের সবচেয়ে কৌতূহল-উদ্দীপক বিষয় হল শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তব উৎস সন্ধান। এখানে তার দু-একটি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যায়।

সমগ্র শরৎসাহিত্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা বিশিষ্ট জায়গা দখল করে আছে রাজলক্ষ্মী-চরিত্রটি। তার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় পাটনার বিখ্যাত পিয়ারী বাঈজী হিসাবে। শ্রীকান্তর সঙ্গে কৈশোরে তার পাঠশালায় পড়া, বৈচিকলের মালা দিয়ে বরণ—এসব আমরা চোখে দেখি না, তার কাছে গল্প শুনি। কিন্তু তার এই গল্পকথাকে আমাদের চোখের সামনে রূপ দেয় "দেবদাস"-এর পার্বতী। অনেকের ধারণা, এই পার্বতী এবং রাজলক্ষ্মী একই ব্যক্তি। অনেকে শরৎচন্দ্রের এই বাল্যসঙ্গিনীর পরিচয় উদ্ধার করেছেন এই বলে যে সে ছিল এক যাজক ব্রাহ্মণের ভাগী কালিদাসী ওরফে রাজলক্ষ্মী। বর্তমান লেখক কিন্তু সেই বালিকার পরিচয় উদ্ধার করে জানিয়েছেন যে সে ছিল দেবানন্দপুরের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই প্যারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে কাশীনাথের এক বন্ধুর বোন। তার আসল নাম জানা যায় নি, তবে সবাই তাকে ডাকত খাঁদু বলে। কিন্তু "দেবদাস"-এর পার্বতীর ছবি আর রাজলক্ষ্মীর ছবি এক নয়। প্রশ্ন ওঠে, খাঁদু বা কালিদাসী কি তার বাস্তব জীবনে পিয়ারী বাঈজীর মতো জন্মান্তর পেয়েছিল? আলোচ্য গ্রন্থটিতে তার কোনো সদুত্তর মেলে না। এখানে লেখক উদ্ধার করেছেন অন্য একটি বাস্তব চরিত্র—লেখিকা নিরুপমা দেবীকে। প্রমাণাদি উপস্থাপনের পরে তাঁর মন্তব্য: 'একথা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করে নেওয়া যেতে পারে যে শরৎচন্দ্র শুরু থেকেই নিরুপমা দেবীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন (পৃ ২৮৯)। শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মী কি নিরুপমা দেবীর মতোই জপতপ ব্রতব্রত ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকত না? হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামির দরুনই বিধবা রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বরণ করতে পারে নি··· বিধবা হওয়ার জন্যেই নিরুপমা দেবীকে তিনি [শরৎচন্দ্র] জীবনে পান নি (পৃ ২৮৭)···এই অপূর্ণতাই তাঁর মনের গোপন ব্যথা ও তাঁর অপূর্ব সৃজনী-শক্তির উৎস (পৃ ২৮৯)।' অবশ্য লেখকের এই মন্তব্যই তাঁর সিদ্ধান্ত নয়। সিদ্ধান্তে বসে তিনি শোনান: 'অনেকের বিশ্বাস "শ্রীকান্ত"-র শ্রীকান্ত স্বয়ং শরৎ আর রাজলক্ষ্মী তার প্রেয়সী। এই রাজলক্ষ্মীর খোঁজ করার জন্যে কত লোকই ফেপে উঠেছিল, কিন্তু কেউই তার খোঁজ পায় নি। কি করেই বা পাবে? রাজলক্ষ্মী লেখকের কল্পনার অতৃপ্ত কামনার সঙ্গী (পৃ ১২১)।' বাস্তবিক, কোনো লেখকেরই কোনো বিখ্যাত চরিত্র কারও কারবনকপি হতে পারে না। কেউ হয়তো তার কাঠামো হতে পারে। কিন্তু কল্পনা যখন সেই কাঠামোয় মাটি চাপায়, রঙ দিয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তখন আর বাস্তবে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

শরৎচন্দ্রের আর-একটি বিতর্কিত চরিত্র সব্যসাচী। তার সম্পর্কে শ্রী প্রভাকরের অভিমত: 'অনেক দিন আগে পিনাং-এর কোন এক বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁর [শরৎচন্দ্রের] আলাপ হয়। সম্ভবতঃ তার সামগ্রিক গুণাবলী লক্ষ্য করে তিনি সব্যসাচীকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার মধ্যে কোনো একজন ব্যক্তিকে খোঁজা বৃথা (পৃ ২০৩)।' কানাইলাল ঘোষ তাঁর "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে কিন্তু এই চরিত্রটি সৃষ্টির ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের মুখ দিয়ে অন্য কথা শুনিয়েছেন। সব্যসাচী প্রসঙ্গে আলোচনা-কালে দেশবন্ধু এবং সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে তিনি জানান যে লেখার শুরুতে এ কাহিনীর নায়ক ছিলেন তিনজন—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং রাসবিহারী বসু। কিন্তু লেখা শেষ করে তিনি দেখলেন 'যে-চরিত্র অঙ্কন করেছি সে-চরিত্র আমাদের মধ্যেরই একজনের—যার উপর আমরা সবাই আশা ভরসা ও নির্ভর করে বসে আছি।'

ইঙ্গিতটা স্পষ্টতই সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্র ক্ষণেক মুহূর্তের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। শরৎচন্দ্র অকারণে হাসিতে ফেটে পড়লেন। বললেন—ভয় নেই সব্যসাচী। উপন্যাস আর জীবন দুটো কোনদিন এক হতে পারে না। এটা হলো রূঢ় বাস্তব—আর ওটা কল্পনা, সুতরাং একটু আধটু পার্থক্য থাবেই থাবে।' [শরৎচন্দ্র: কানাইলাল ঘোষ: পৃ ১৮৯-১৯০]

জানি না এ কাহিনীর সত্যি-মিথ্যে কতখানি। তবে সব্যসাচীর দৈহিক গঠনের যে বর্ণনা কিংবা তার সব্যসাচী নামকরণের যে-ইতিহাস সে ভারতীকে শুনিয়েছে তাতে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন।

সবশেষে এ-বইয়ের সামান্য কিছু তথ্যগত অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন মনে করি। এক জায়গায় (পৃ ৩৮) লেখক উল্লেখ করেছেন যে শরৎচন্দ্রের গ্রামের পৈতৃক বাড়িটি বিক্রি হয় ১৮৯৯ সালের নভেম্বরে—তখন শরৎচন্দ্র একুশ বছরের পূর্ণ যুবক। শরৎচন্দ্রের জন্ম ১৮৭৬-এর সেপ্টেম্বরে। তাহলে ১৮৯৬-এর নভেম্বরে তাঁকে কুড়ি বছরের বলে হিসেব করাটাই বোধ হয় সঙ্গত। অন্যত্র (পৃ ৮৯) তিনি উল্লেখ করেছেন যে শরৎচন্দ্রের বর্মার বাড়িতে আগুন লাগে ১২১২-র ফেব্রুয়ারিতে। শ্রী প্রভাকরের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়িতে আগুন লেগেছে জানতে পেরে শরৎচন্দ্র 'সবার আগে হিরণ্ময়ী দেবী, কুকুর ভেলী ও পাখিকে নিরাপদ জায়গায় পৌছে দেন।' এই পাখি কে? সে কি শরৎচন্দ্রের সেই নুবী পাখি বাটুবাবা? তাই যদি হয় তাহলে তার মৃত্যুর কথা বাড়িতে আগুন লাগার আগেই লেখক আমাদের শুনিয়েছেন (পৃ ৮৮)। বাড়িতে আগুন লাগার আগেই যে তার মৃত্যু হয়েছিল সেটা আরও বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয় এই কারণে যে, ওই বছরের অকটোবরে শরৎচন্দ্র যখন সপার্ষদ কোলকাতায় আসেন তখন তাঁর সঙ্গে শুধু হিরণ্ময়ী দেবী এবং কুকুর ভেলী, পাখির কোনো উল্লেখ নেই। সুতরাং আগুন লাগার সময় পাখিকে সরানোর ব্যাপারটা একটা জিজ্ঞাস্য হয়ে থাকে।

তবুও স্বীকার করতে হয় শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনায় এ-রকম সামান্য কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি খুবই স্বাভাবিক। কোন্

ঘটনা কবে ঘটেছে, কবে কোথায় ছিলেন, কোন্ প্রসঙ্গে কাকে কী বলেছিলেন—এসব ব্যাপারে কোনো লিখিত প্রমাণাদি একেবারেই বিরল। তাছাড়া শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর নিজের ব্যাপারে অসংখ্য স্ব-বিরোধ সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'আত্মকথা আমি লিখতে পারব না কারণ আমি সে পরিমাণে সাহসী বা সত্যবাদী নই (পৃ xv)'। আবার অন্যত্র তিনি লিখছেন (শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে : ২৪শে অগস্ট, ১৯১৯) 'আমার জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি, শুধু ছোট কাজ কখনো করিনি। যখন মরব—ফরসা খাতা রেখে যাব যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গায়ও থাকবে না (পৃ ৩৩০)।' এই স্ববিরোধী উক্তির কারণ হয়তো তাঁর ব্যক্তিসত্তা বা লেখক-সত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার সংঘাত। লেখক হিসেবে হয়তো তিনি তার সমীকরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তাই "পথের দাবী"-র সব্যসাচীর মুখ দিয়ে কবি ও ওস্তাদ বেহালা-বাজিয়ে শশীপদ ভৌমিক সম্পর্কে তাঁকে মন্তব্য করাতে শুনি 'তাছাড়া ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভালমন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভালমন্দের আইন ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে (শরৎরচনাবলী : জন্মশতবর্ষ সংস্করণ : ৫ম খণ্ড : পৃ ১৩২)।' একথা জানতেন বলেই তাঁর নিজেকে আড়াল করার এই প্রবণতা। সেই আড়াল ঘুচিয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে শ্রী প্রভাকরের চেষ্টায় কোনো ঘাটতি নেই। তিনি জানান, 'এইসব বিক্ষিপ্ত তথ্যের খোঁজে আমি বছরের পর বছর দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়েছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার দেখেছি, স্কুল-কলেজের রেজিস্টার হাতড়ে বেড়িয়েছি, পুরোনো চিঠিপত্রের গভীরে ডুবে তবেই একটা রূপ খাড়া করতে পেরেছি (পৃ x)।' স্বাভাবিক কারণেই কৌতূহল জাগে এই অদ্ভুত প্রয়াস এবং অপূর্ব সৃষ্টির পেছনে লেখকের প্রেরণার উৎস কোথায়? জবাবটা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক—'এর প্রধান কারণ ছিল শরৎচন্দ্রের প্রতি আমার অনুরাগ। তাঁর সাহিত্য পড়ে তাঁর জীবন সম্বন্ধে, বিশেষ করে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর বিষয়ে জানবার তীব্র ইচ্ছে আমার মনে কয়েকবারই হয়েছিল (পৃ xii)।' শরৎচন্দ্র বাঙালি লেখক। তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগও কিছু কম নয়। কিন্তু শ্রীপ্রভাকরের এই অনুরাগের শ্রদ্ধানিবেদন একাধারে বাঙালির গর্ব ও লজ্জার কারণ, ঈর্ষা ও গৌরবের হেতু। আর শ্রীমতী দেবলীনা ব্যানার্জী কেজরিওয়াল আমাদের ধন্যবাদার্হ এই কারণে যে সার্থক অনুবাদের মাধ্যমে তিনি শরৎচন্দ্রের সেই জীবনকাহিনী আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

জয়কৃষ্ণ কয়াল

বিপ্লবী সত্যেন সেনের সাহিত্যসৃষ্টি

সত্যেন সেন রচনাসমগ্র—হায়াৎ মামুদ মফিদুল হক সম্পাদিত। বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা। প্রথম খণ্ড নভেমবর ১৯৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭। প্রথম খণ্ড একশ টাকা, দ্বিতীয় খণ্ড একশ পনেরো টাকা।

১

'তাঁর হয়ে এখন তাঁর বইগুলি কথা বলবে।'

সব লেখকদের পক্ষেই পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য প্রযোজ্য, কিন্তু রণেশ দাশগুপ্ত যখন সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১) প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেন তখন তার একটি বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ করি। কমিউনিসট সত্যেন সেনের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিলো রাজনীতি, তিনি লেখক হয়েছিলেন দায়ে প'ড়ে—সে দায় তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসেরই অন্তর্গত। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী', ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের শতবর্ষ উপলক্ষে রচিত এবং বই হিশেবে বেরোয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন লেখকের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেছে। যৌবন এবং মধ্যজীবনের বহু মূল্যবান বছর তিনি জেলে কাটিয়েছেন। তারপর শরীরও বিদ্রোহ করতে শুরু করে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হ'তে হ'তে ক্রমে অন্ধ হ'য়ে যান। কিন্তু লেখা এবং পড়ায় কখনো ছেদ পড়ে নি। এই জীবনীশক্তি যে-কোনো দেশে যে-কোনো যুগে বিরল। ১৯৫৮ থেকে ৮১-র মধ্যে তিনি উনিশটি উপন্যাস লিখেছেন (বশীর আলহেলাল-এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী)। এ ছাড়া আছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি -বিষয়ক গ্রন্থ, জীবনী ইত্যাদি। বিজ্ঞান কোনোদিনই তাঁর কেতাবি চর্চার বিষয় ছিলো না। তা সত্ত্বেও অবাক লাগে ভাবতে যে সত্তর বছর বয়েসেও অসমর্থ শরীরে জে. ডি. বার্নাল-এর "সায়েন্স ইন হিসট্রি"-র অনুপ্রেরণায় লিখলেন "ইতিহাস ও বিজ্ঞান"-এর প্রথম খণ্ড। এর আগে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে 'এটমের কথা' এবং 'মানব-সভ্যতায় উষালগ্নে'।

বলা বাহুল্য, রাতারাতি কেউই লেখক হন না। অনেকের শিক্ষানবিশির পর্ব থাকে আড়ালে। আত্ম-প্রকাশ ঘটে অনেক পরে। সত্যেন সেনের প্রথম উপন্যাস "ভোরের বিহঙ্গী"র প্রকাশকাল ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হ'লেও লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জেলে ব'সে। "প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘে"-ও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো, গান রচনাতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। "উদীচী" (১৯৬৮) নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম তাঁরই উৎসাহে। এই সংগঠনের বর্তমান কর্মীদের উদ্যোগে "সত্যেন সেন রচনাসমগ্র" প্রকাশিত হচ্ছে।

সত্যেন সেন অসাধারণ লেখক ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর বিষয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, রাজনৈতিক সহকর্মীদের স্মৃতিচারণ প'ড়ে মনে হয় তিনি প্রধানত রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন, সাহিত্য নয়। সাহিত্যসৃষ্টি তাঁর রাজনৈতিক কর্মের অংশ। কী কারণে তিনি মাঠ-ময়দান ছেড়ে সাহিত্যের 'মায়াবী টেবিল'কে আশ্রয় করলেন তা অজয় রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে স্পষ্ট :

> সত্যেনদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—আচ্ছা এই পরিণত বয়সে এসে হঠাৎ কলম ধরলেন কেন?
>
> স্মিত হেসে সত্যেনদা জবাব দিয়েছিলেন,—মানুষের কাছে যে কথা বলতে চাই সে কথা অন্যভাবে বলতে পারবো না সেজন্যে। তাছাড়া অভিজ্ঞতা দিয়ে তো দেখলাম, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন করার উপযুক্ত আমি নই। কাজেই এই মাধ্যম বেছে নিয়েছি। (অজয় রায়, "সত্যেন সেন—এক অনন্য ব্যক্তি," 'মুক্তপ্রাণ সত্যেন সেন,' জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮০ খ্রী, পৃ ১৪।)

সত্যেন সেনের রাজনৈতিক জীবন-প্রসঙ্গে তাঁর এই ব্যর্থতাবোধ কতটা বেদনাসঞ্জাত অথবা বিনয়বশত সে বিচারের অধিকারী আমি নই। আমার বক্তব্য তাঁর সাহিত্যকর্ম তাঁর রাজনৈতিক জীবনেরই অংশ — এ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এই উপমহাদেশের খুব কঠিন সময়ে কমিউনিসট আন্দোলনের সংকটময় মুহূর্তে তিনি দেশের জন্য সবকিছু নিবেদন করেছেন—তাঁর জীবন, যৌবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা। তাঁর এই প্রচণ্ড আত্মত্যাগকে তিনি কখনো পুঁজি হিশেবে ব্যবহার করেন নি।

আর তাই পাক-ভারত উপমহাদেশের কমিউনিসট আন্দোলনে সত্যেন সেন অবিস্মরণীয় নাম। 'অবিস্মরণীয়' কথাটি লিখে থামতে হলো, ভারতে বিশেষ ক'রে পশ্চিমবঙ্গে তিনি কতটা পরিচিত? আর তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে দু-একজনের যদিও বা জানাশোনা থাকেও, লেখক সত্যেন সেন এ বঙ্গের পাঠককুলে প্রায় অজ্ঞাত। এটা ঠিক যে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর দু-একটি বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তার অভিঘাত খুব বেশি একটা নয়। অথচ তাঁর "পদচিহ্ন" (১৯৬৮), "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" (১৯৫৯) প্রভৃতি উপন্যাস-কে বাদ দিয়ে বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের আলোচনা সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসেরই পটভূমি বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান। ভারতবিভাগের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হ'লো লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ ক'রে ভারতে আগমন। উলটো দিক থেকেও অনেক মুসলমান পরিবার বাস্তত্যাগী হলেন, যদিও আনুপাতিকভাবে কম। কিন্তু দুদেশেই রয়ে গেলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু পরিবার। পূর্ববঙ্গে তাদের সমস্যা, সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে ধর্মীয় স্তর থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পর্যায়ে সহযোগিতা অথবা অবিশ্বাস, শ্রেণীগত বোঝাপড়া (যেমন হিন্দু চাষীর সঙ্গে মুসলমান চাষীর), বাঙলা ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের দমননীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে একজন কমিউনিসটের অভিজ্ঞতার কাহিনী সত্যেন সেনের এই উপন্যাসগুলির বিষয়।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চল্লিশ বছর পরে দেশবিভাগের জটিল পরিস্থিতি আজ ইতিহাস। কংগ্রেসি এবং মুসলিম লীগের নেতারা ক্ষমতাপ্রাপ্তির আগ্রহে সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে একবার দেশ ভাগ হ'য়ে গেলে সাম্প্রদায়িকতার অবসান হবে। মহাত্মা গান্ধী অনুরোধ করেছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো নেতাই যেন দেশত্যাগ না করেন। খুব কম নেতাই তাঁর কথা শুনেছিলেন। ভারতবিভাগের পর কমিউনিসট পার্টির মধ্যেও নানা সংকট এল। মধ্যে অন্যতম হ'লো একদিকে সরকারি দমননীতির প্রতিরোধ, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই। দুটোই ছিলো প্রবল শক্তি। দেশভাগের কিছু-

দিন পরে দুই দেশের কমিউনিসট পার্টিও আলাদা হ'লো। কমিউনিসট কর্মীদের অনেকেই দেশত্যাগ করলেন। এই সময়ের অবস্থার চিত্রণ পাওয়া যাবে মণি সিংহের স্মৃতিকথা "জীবনসংগ্রাম" (১৯৮৩) গ্রন্থে। প্রচণ্ড সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের যুগ ছিলো তখন। মণি সিংহের ভাষায়,

> শুধু হাসনাবাদ ও ঢাকা নয়, দেশের বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিস্টরা জীবনের নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে দাঙ্গা প্রতিরোধ করেছে। এজন্য কমিউনিস্ট কর্মীরা হিন্দুদের কাছে মুসলমানের দালাল, এবং মুসলমানদের কাছে হিন্দুর দালাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে কমিউনিস্টরা পার্টির জন্ম থেকেই সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। (ওই, পৃ ১৫১)

তৎকালীন পাকিস্তানি সরকার ভাষা আন্দোলনকেও সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। মণি সিংহ আরো লিখেছেন:

> তিনি (পূর্ববঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন) বলেন, কমিউনিসটরা সাপ, তারা গর্তে থাকে, রাত্রিবেলায় বের হয়, (কমিউনিসট পার্টি তখন গোপন ছিল)। তিনি আরও বলেন যে, ভারত থেকে পায়জামা পরে হিন্দুরা এসে এই আন্দোলন করছে (ওই, পৃ ১৮৮)।

এদেশে কমিউনিসট আন্দোলনের বড়ো ব্যর্থতা সেদিন দলের মধ্যেও দেশত্যাগের উন্মাদনা ঠেকানো যায় নি। বিরল ব্যতিক্রমদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন সেন। যুগান্তর দলের কর্মীরূপে রাজনৈতিক জীবনের শুরু, তারপর জেলে ব'সে সাম্যবাদে দীক্ষা। কারাগার থেকে বেরিয়ে শান্তিনিকেতনে গবেষণার সুযোগ পেয়েও পূর্ববঙ্গে প্রত্যাবর্তন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে শারীরিকভাবে নিতান্ত অসমর্থ হ'য়ে পশ্চিমবঙ্গে চ'লে আসেন। সরদার ফজলুর করিম সত্যেন সেন প্রসঙ্গে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন:

> ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের হিন্দু মধ্যবিত্ত কেরানী, কর্মচারী, শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কর্মীকে পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করতে হয়েছে। নানা আর্থিক এবং মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক বাস্তত্যাগীকে তার বাস্তভিটা এবং কর্মক্ষেত্রকে ত্যাগ করতে হয়েছে। মার্কসবাদী কমিউনিসট কর্মী পরিবার এবং সমাজ বহির্ভূত কোন প্রাণী নয়। পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দু মধ্যবিত্ত মার্কসবাদী রাজনৈতিক কর্মীকে জেলে আটক থাকা অবস্থায় কিংবা জেলের বাইরে থেকেও দেশত্যাগ করতে হয়েছে। যাঁরা এরূপে দেশত্যাগ করেছেন তাঁরা এটা অবস্থার চাপে বাধ্য হয়েই করেছেন। এটা আদর্শচ্যুতি বা রাজনীতিক কোন অপরাধের ব্যাপার ছিল না। তবু কর্মীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের সমগ্র আত্মীয়-স্বজন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করা সত্বেও নিজেরা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ না করার আপ্রাণ এবং অনেকে আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন তাঁরা তাঁদের আদর্শ এবং কর্মক্ষেত্রকে ভালবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
>
> সত্যেন সেনের মধ্যেও তাঁর প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রকে, সেই কর্মক্ষেত্রের কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তকে আত্মীয়ের অধিক ভালবাসার এক আবেগের প্রকাশ দেখা যায়। সত্যেন সেন আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজ কর্মক্ষেত্র ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গকে শক্তির শেষ অবধি পরিত্যাগ না করতে। ("সত্যেন সেন রচনাসমগ্র", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৫)

সত্যেন সেনের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে তাঁর উপন্যাসে, বিশেষ ক'রে "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ" এবং "পদচিহ্ন"তে। এগুলিকে শুধু আত্মজৈবনিক আখ্যা দিলে কম বলা হয়, এই গ্রন্থগুলি হ'লো তাঁর সারূপ্যের সন্ধান, স্বদেশকে আবিষ্কার। "পদচিহ্ন" উপন্যাসের গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে হায়াৎ মামুদ এবং মফিদুল হক একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছেন:

> একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন এজন্যে যে লেখকের অন্তর্লোকে তা আলো ফেলে। কাহিনীর মূল ঘটনাস্থল যে-গ্রাম তার নাম পাণ্ডুলিপিতে প্রথম ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক 'স্বর্ণগ্রাম' লিখেছেন, তার পরে সম্ভবত তাঁর অজ্ঞাতেই স্বর্ণগ্রাম হয়ে গেছে 'সোনারং'। মনে পড়ে যায়, সোনারং ছিল তাঁর জন্মস্থান, স্বগ্রাম। আরো কিছু পৃষ্ঠা অতিক্রম করে দেখতে পাই স্বর্ণগ্রাম বা সোনারং গ্রামের জায়গা দখল করেছে 'শ্রীপুর'। ("সত্যেন সেন রচনাসমগ্র", দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৫৫)

স্মৃতি, ইতিহাস, অভিজ্ঞতা একাকার হ'য়ে গেছে সত্যেন সেনের উপন্যাসে।

"সত্যেন সেন রচনাসমগ্র"-র এ পর্যন্ত তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের হাতে এসেছে দুটি খণ্ড। প্রথমটিতে আছে "রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ", আর "মহাবিদ্রোহের কাহিনী" এবং "মসলার যুদ্ধ"। মসলার বাণিজ্য উপলক্ষ ক'রে কালিকট বন্দরে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ বণিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই হ'লো শেষোক্ত গ্রন্থের বিষয়।

"রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ"-এর ঘটনাস্থল পূর্ব পাকিস্তানের একটি কারাগার। এবং এই জেলখানাটি হ'লো সমগ্র দেশের অণুবিশ্ব। এখানে নানা জাতের নানা স্বভাবের নানা পেশার নানা বয়েসের মানুষের হামেশাই আনাগোনা চলছে। তাদের মধ্যে সমাজবিরোধীরাও আছে, আবার রুনুর মতো রাজনৈতিক কর্মীরাও আছে। উপন্যাসটি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আখ্যানের সমষ্টি যার কেন্দ্রে আছে রুনু। মানুষের সমস্যাও এখানে ব্যক্তিভেদে কত ভিন্ন। মহর্ষির কথাই ধরা যাক। সে চাইছে বইয়ের জগৎ ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হ'য়ে বাঁচতে। কিন্তু তার বৌ সালেহা চায় সে পণ্ডিত হোক, অসাধারণ হোক—দেশের দশের মধ্যে তার নাম ছড়িয়ে পড়ুক। মহর্ষির কাছে এই ভালোবাসাই প্রচণ্ড বন্ধন ব'লে মনে হয়। সে চায় মুক্তি। সে তাই বলে

> দেখুন রুনুবাবু, সেদিন মাও সে তুঙ-এর লেখায় একটা কথা পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। তিনি বলেছেন, সংসারে যত কাজ আছে, তার মধ্যে লেখাপড়া করাটা সব চেয়ে সহজ কাজ। (পৃ ৯৫)

অন্যদিকে রুনুর প্রেমের সমস্যা অন্যরকম। সে যে রাজনৈতিক কর্মধারা বেছে নিয়েছে তাকে সারাজীবন পূর্ববঙ্গেই থাকতে হবে। কিন্তু তার প্রেমিকা বিভা পশ্চিমবঙ্গে থাকে এবং তারও পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার উপায় নেই। তার আত্মীয়স্বজন দেশত্যাগী এবং রুনুরও তাকে আশ্রয় দেবার কোনো সামর্থ্য নেই। রুনু অবশ্য বহু আগেই তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে কারো দায়িত্ব নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু রুনু যেমন দেশের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, তেমনি বিভাও রুনুর প্রতি। রুদ্ধকারার দিনগুলি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে বিভার চিঠিগুলি পেয়ে। এরকম একটা চিঠিতেই বিভা জানায় তার বড়দির সঙ্গে কথোপকথন:

> কোন ভূমিকা নয়, কোন কুশল প্রশ্ন নয়, বড়দি সোজা প্রশ্ন করে বসল, রুনু পাকিস্তানে পড়ে আছে কেন?
>
> আমি হেসে বললাম, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব কি করে? আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। প্রশ্নটা করতে হ'লে তোমার যথাস্থানেই করা উচিত।
>
> তা তো উচিত। কিন্তু তাকে আমি পাচ্ছি কোথায়? তাই তো তার অবর্তমানে তার প্রতিনিধিকেই জিজ্ঞাসা করছি।
>
> আমি কারু প্রতিনিধি নই বড়দি। একমাত্র নিজের কাজ ছাড়া আর কারুর কাজের জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ চেও না। (পৃ ১৫)

একদিন দিদি স্বয়ং রুনুকে লেখেন:

> আমি শুনেছি, তোমরা নাকি ইচ্ছা করলেই চলে আসতে পার। কেন যে তুমি আপনজন সবাইকে ছেড়ে ওখানে পড়ে আছ, বুঝতে পারি না। বুঝতেও চাই না। ওসব বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢোকে না। মিমির কাছে শুনেছি, তোমার কর্তব্যবোধই নাকি তোমাকে ওখানে আটকে রেখেছে। কিন্তু আমার একটা ছোট্ট কথা—মিমির সম্পর্কে কি তোমার কোনই কর্তব্য বা দায়িত্ব নেই? এমন একটা দুঃসময়েও কি তুমি ওকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না? (পৃ ৬৬)

কিন্তু সময় স্থির হ'য়ে ব'সে থাকে না। একদিন সব সমস্যার সমাধান হয়। বিভা নয়, দিদির চিঠিতে রুনু জানতে পারে যে বিভার ক্যানসার ধরা পড়েছে। একেবারে শেষ অবস্থা। রুনু জেলেই থাকে। এতোদিন সে ভাবতো রুদ্ধদ্বার মুক্তপ্রাণ। বিভা যেভাবে তাকে মুক্তি দিতে চলেছে তা কি তার কোনোদিনই কাম্য ছিলো?

"সত্যেন সেন রচনাসমগ্র"-র দ্বিতীয় খণ্ডে আছে "অভিশপ্ত নগরী" (১৯৬৭) এবং "পদচিহ্ন"। শেষোক্ত উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্ব অসম্পূর্ণ। "অভিশপ্ত নগরী"র অনুপ্রেরণা বাইবেলের "বুক অব দ্য প্রফেট"। জেরুজালেমের পতন এর প্রধান উপজীব্য। রাজার সঙ্গে পুরোহিতের লড়াই আর সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের জেগে ওঠার কাহিনী হলো এই উপন্যাস। "অভিশপ্ত নগরী"র উপসংহার "পাপের সন্তান"।

"পদচিহ্ন" প্রসঙ্গে আগেই কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। সুবিনয় তার বন্ধু আনিসকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে

এসেছে। সুবিনয় যে জোর করে এনেছে তা নয়, বরং ঠিক উলটো। সে জানে যে মুসলমান বিষয়ে তার মা-বাবা কীরকম রক্ষণশীল। কিন্তু আনিস হিন্দু পরিবারকে কাছে থেকে জানতে চায়। হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক বিষয়ে এই অজ্ঞতা এবং ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগও বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনতে পারে নি। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান, ভদ্রলোক-ছোটোলোক, চাষী-মধ্যবিত্তর সম্পর্কে এসে আনিসের খুবই শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়। সে বুঝতে পারে শহরে লোকেরা কতটা বিচ্ছিন্ন। অপরিচয়ের ব্যবধান কাটার সঙ্গে সঙ্গে সুবিনয়দের সংসারেও বিরাট আলোড়ন শুরু হয়। ধর্মের পার্থক্য সত্ত্বেও আনিস তো বাদলের (সুবিনয়ের) মতোই :

> প্রমীলা ভাবছিলেন, ছেলেটা একেবারে পাগল। ঠিক বাদলেরই মত। সেই জন্যই তো দু'জনে এমন মিল। কথাটা ভাবতেই স্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তাঁর মন। কি আশ্চর্য এইটুকু সময়ের মধ্যেই কেমন আপন হয়ে উঠেছে। কেমন সহজ আর সরল ব্যবহার! কোন কথাই ওর মুখে বাধে না। কে বলবে মুসলমান, একেবারে অবিকল হিন্দু ছেলের মত। কোন দিক দিয়ে মুসলমানের চিহ্নমাত্র নেই। আর বাপ-মায়ের কথা যেমন করে বলল, সেও তো ঠিক হিন্দু বাড়ীর মতই। মুসলমান বাপ-মায়েরাও কি হিন্দুদের মতই হয়? (পৃ ৩৭)

যে অবিশ্বাস বা বিদ্বেষ অজ্ঞতাপ্রসূত একমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার অবসান হতে পারে। অনেক সমালোচকের মতে "পদচিহ্ন" উপন্যাসে কথার বড়ো প্রাধান্য। হ'তে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় উপন্যাসটি পাঠকের মস্তিষ্ক এবং হৃদয় উভয় জায়গাতেই আঘাত করে।

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যেন সেনের গ্রন্থাবলি সম্পাদনা করছেন সম্পাদনা-পরিষদ বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ী সম্পাদক হায়াৎ মামুদ এবং মফিদুল হক। কাইয়ুম চৌধুরীর প্রচ্ছদ বইটির আকর্ষণ আরো বাড়িয়েছে। সুন্দর ছাপা এবং প্রায় নির্ভুল মুদ্রণ। গ্রন্থ-পরিচয়ও তথ্যসমৃদ্ধ। পরিশেষে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল আলম সংকলিত 'জীবনকথা' প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। মৃত্যুকালে সত্যেন সেনের বয়েস হওয়া উচিত ৭৩ বছর ৭ মাস ৭ দিন, ৭২ বছর নয়। কিন্তু এহ বাহ্য।

আশা করি পশ্চিমবঙ্গের পাঠক-কুলেও সহজলভ্য হবেন সত্যেন সেন। আমি আপাতত আমার পাঠের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করলাম।

সুবীর রায়চৌধুরী

বাংলাদেশের গল্প

ধস—আবদুশ শাকুর। মিনার্ভা বুকস, ঢাকা-১। তিরিশ টাকা।
একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প—সৈয়দ ইকবাল। মুক্তধারা, ঢাকা-১। বাইশ টাকা।
বাজ—আবুল হাসানত। মুক্তধারা, ঢাকা-১। কুড়ি টাকা।
পরজন্ম—সেলিনা হোসেন। অক্ষর, ঢাকা-১। একত্রিশ টাকা।
প্রেমের গল্প—মাফরুহা চৌধুরী। নসাস, ঢাকা-১। বত্রিশ টাকা।
একাত্তরের গল্প—এহসান চৌধুরী। মুক্তধারা, ঢাকা-১। সাতাশ টাকা।

'গল্প লেখার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমরা একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পর বেড়িয়ে বেড়াবে।' রবীন্দ্রনাথের এই সুখ-বৈভবেই বাঙলা ছোটোগল্পের মুক্তি। অতঃপর নানা অভিপ্রায়, বিবিধ সংকল্প, ব্যাপক অভিনিবেশ বহন করে শতক অতিক্রমণের পথে বাঙলা ছোটোগল্প অগ্রসরমান। সূচনাপর্ব থেকে বর্তমান কালে, পরিক্রমাপথে, নবীন প্রবণতার বিক্ষেপে ছোটোগল্পের ধারায় নিয়ত ভাঙাগড়া, অশেষ রদবদল। প্রবীণ এবং তরুণ, বিগত ও অধুনাতন সকল কালের মানবজীবনভাবনার সন্নিহিত গল্পরচয়িতাদের নতুন দৃষ্টি, নতুন চিন্তা, নতুন কলাকৌশলের সাহচর্যে উত্তরোত্তর বিচিত্র অভিমুখে প্রবহমান বাঙলা ছোটোগল্পের ধারা।

অভিজ্ঞতার স্বাদবাহী আবদুশ শাকুরের চারটি গল্পের সংকলন "ধস" প্রসঙ্গে এসব কথা এসে গেল। আবদুশ শাকুর দৃশ্যমান প্রতিবেশ আর জীবনের সঙ্গে সহমর্মিতা গড়ে তুলতে অবিচল, এবং সত্যকে প্রতিভাসিত করতে স্থির-প্রত্যয়ী। "ধস"-শীর্ষক গল্পে তার স্বাক্ষর রয়েছে। গল্পের বর্ণিত বিষয়—মুক্তি-

যোদ্ধা 'হাবু' স্বাধীনতা আনয়নের বিনিময়ে গ্রামে উচ্চবর্গের লোভে পৈতৃক ভিটে হারাল, বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরে আসার পর অপসৃত হল তার গোটা পরিবার। সমগ্র গল্পে বিলাপ-বিলাস ত্যাগ করে লেখক তাঁর সংকল্পকে সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন। এই গল্প পাঠের অবসানে তাই একটা সুর ভেসে ওঠে—'তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ-সম দহে।' তবে, গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে উপসংহারে লেখকের আবির্ভাব পাঠকের জ্ঞান-গরিমার প্রতি যেমন অনাস্থা সূচিত করেছে, তেমনি শিল্পরূপ আর সৌষ্ঠব রক্ষার শর্তকে অক্ষুণ্ণ রাখতে দেয় নি। "স্বস্তি" গল্পটি "ধসে"র অনুগামী। উদ্ঘাটিত হয়েছে নবোদ্ভূত ধনিক, একদা পাকিস্তানের আজ্ঞাবহ, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার সহায়ক, দেশ-বৈরী, হীনপ্রাণ শরীফুদ্দীনের চরিত্র। এই চরিত্র উদ্ঘাটনের আয়োজনেই শাকুরের লক্ষ্য নিঃশেষিত হয় নি। লক্ষ্যপথ আরও বিস্তৃত হয়েছে ধর্মের নামে বজ্জাতির স্বরূপ উন্মোচনে। কিন্তু লক্ষ্যপথের বিস্তৃতি প্রথম শ্রেণীর গল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বিঘ্নিত করেছে। যদি বদ্ধ 'এলিভেটরে', 'শরীফুদ্দীনের'র মনে গফুর হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ নিয়েই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটত, যদি মৌলভী-মোসল্লীদের নিয়ে ভিন্ন একটি গল্প গড়া যেত?—এরকম 'যদি'র আক্রমণে "স্বস্তি" আমাদের আফশোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ সংযোজন "জোৎস্না-জীবী"। 'জোৎস্নাজীবীর আপতন পিয়াসী জীবনের আপতিক মরণ দর্শন' সম্যকরূপে বাঙলা ছোটোগল্পে শাকুরের স্থানকে সুনির্দিষ্ট করে দিতে পারে—এরকম ভাবনা অবাস্তর নয়। লেখকের সতেজ সজীব শক্তির স্মারক "পুন-র্মূষিকো"। গদ্যের একান্ত বাহন সম্পর্কে গভীর মনোযোগ গল্পটির আস্বাদন স্বাদু করেছে। সকরুণ জীবনের সকৌতুক উপস্থাপনার কথাও এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। শাকুরের সিদ্ধি গদ্য-বাক্য গঠনে। আপাত নির্লিপ্ত প্রসন্নতা এবং ছদ্ম-গাম্ভীর্যের অনাস্বাদিত মেজাজ সৃষ্টিতে যে পটুতা তাতে শিল্পীর অধ্যবসায়ের শাসন অব্যাহত। তবে, অমিত-ভাষ অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যকে নিষ্প্রভ করেছে এমন ভাবনায় আবদুশ শাকুর মাঝে-মধ্যে আক্ষেপের কারণ হয়ে উঠেছেন।

সার্থক গল্পরচনার সাধনা যে কী, তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা। তবে তিনি উত্তম, যিনি একের বেদনাকে সহস্রের বেদনায় এবং সহস্রের বেদনার ভ্রূণ শুক্তির গর্ভে স্থান দিতে নিরলস এবং যত্নশীল। সৈয়দ ইকবালের ছয়টি গল্পের সংকলনগ্রন্থ "একদিন বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য গল্প" পাঠে এসব প্রসঙ্গ বিবেচনার অধীন হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী পর্বে সংগ্রামী যাত্রীদের মনে যে হিমশীতল স্তব্ধতা সেই স্তব্ধ পাতাল-পুরীতে প্রবেশ করে "একদিন বঙ্গবন্ধু"র মাস্তানের কর্ণে শ্রুত হয় : পাগলীর চিৎকার—'দেশে একটা বেটা নাই—একটা বেটা মানুষ নাই! সব চিকা! সব চিকা!' ইকবাল ক্রোধী, কিন্তু রস-রূপ দানের অধিকারে ইতিহাসের কালো অধ্যায়ের একটা ছবি তিনি প্রগাঢ়ভাবে আমাদের বুকে এঁটে দিতে পেরেছেন। একই ক্রোধের আস্বাদন "লজ্জা" গল্পে ভিন্নভাবে স্থান নিয়েছে। অভাব-অনটনের অধিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উচ্চবর্গীয়দের পুষ্ট মাস্তান ভেঙ্গুসর্দারের হস্তে নিগৃহীত ধলা, সন্তানের কাছ থেকে পঙ্গুত্ব ঢাকতে বুড়ি-গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করেছে। পঙ্গুত্বের বিরুদ্ধে, নির্বীর্যের বিরুদ্ধে, মূক পশুর মতো হীনশ্রী জীবনকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে "লজ্জা" প্রতিবাদের ভাষা। উগ্র স্বাজাত্যাভিমান আসুরিক শক্তিকে জাগ্রত করে, লুণ্ঠিত হয় মানব-মহিমা। সাজুহত্যার সেই বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়েছে "মার কাছে যাওয়া" গল্পটিতে। শিল্পীর অকৃত্রিম বোধে উপ-স্থাপনার চারুতায় "মার কাছে যাওয়া" গল্পটি বাঙলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত হওয়ার দাবি নিয়ে দাঁড়াত পারে। পৃথিবীর বাতাস গ্রহণের প্রাক্-মুহূর্তে সাজুর প্রার্থনা : 'একটু তোমার হাত বুলিয়ে দিও মা', যেন পরাভবকে ভ্রূকুটি হানার শক্তি অর্জনের জন্যে সকল কালের সকল মানুষেরই প্রার্থনাসংগীত। ইকবাল কল্যাণময়ী মঙ্গলময়ী জননীর শরণ নিয়েছেন "মার কাছে যাওয়া"য়। আর লক্ষ্মীকে হারানোর বেদনা প্রকাশ করেছেন "ভালোবাসা" গল্পের পট-ভূমিকায়। বাঙালির স্বার্থের নিবাত প্রকোষ্ঠে বাসা বেঁধেছে অলক্ষ্মী। এখন 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে' এই সুর খোঁজা বৃথা। বেদনাহত হৃদয়ে নায়কের জিজ্ঞাসা, 'কি সামান্য সুবিধার জন্য কলকাতা শহরে দুজন বাঙ্গালী পাঁচ-জন অবাঙ্গালীর পায়ে গড়িয়ে পড়ছে।' কলকাতায় হিমানী আর সুব্রতা আর ভিন্ন পটভূমিকায় ঢাকায় আইভি। "ভালোবাসা" গল্পে শৈথিল্য লক্ষণীয় বটে কিন্তু আকর্ষণীয়। এই গল্পে ইকবালের বাঙালির আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা-গর্ব রক্ষার দাবি মুগ্ধ করে। বহমান ভাগী-রথী আর পদ্মা গঙ্গারই তো দুই ধারা? ইকবাল শক্তিমান, আর সেই কারণেই

এই সংকলনে "অনেকদিন পর এক-দিনে"র স্থান কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিত মনে হল। "আবার সেই সেপ্টেম্বরে" আবেগের প্লাবন গল্পের শুকনো মাটিতে ভাবকে আশ্রয় দিতে পারে নি। মাতা-পিতার বিচ্ছেদের কারণে মাতৃ-ক্রোড়চ্যুত সন্তানের দীর্ঘশ্বাস, শিল্পীর প্রযত্নের অভাবে, ব্যক্তিগত দীর্ঘশ্বাসই হয়ে রইল। সকল গল্পেই শব্দবূ্যহ রচনায় ইকবালের সতেজ প্রাণের স্পর্শ রয়েছে এবং এই শক্তিতেই অভিপ্রায় আর সংকল্প প্রকাশে তাঁর গদ্য স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল।

আবুল হাসানতের সংগ্রামী চেতনায় পুষ্ট পাচটি গল্প সংকলিত হয়েছে "বাজ" গল্পগ্রন্থে। একটি বৃহৎ বিশ্বাসের ছবি অঙ্কিত করেছেন হাসানত। আক্রমণকারীর জন্যে পৃথিবী নয়। মৃত্যুঞ্জয়ী শপথ নিয়ে আক্রান্তদের এগুতেই হয়, "বাজ" গল্পে সেই চিহ্নের সঞ্চার। উপকথাধর্মী গল্প। উপকথা তো শুধু কিশোরদের জন্যে নয়; বয়স্ক-দের পক্ষেও আস্বাদনীয়। কিন্তু অভি-প্রেত সামর্থ্যের অভাবে গল্পটি সুখপাঠ্য হতে পারে নি। রূপকের অনুষঙ্গ, শব্দ এবং উপমা ব্যবহারের দারিদ্র্যহেতু সীমা অতিক্রমণে বাধা পেয়েছে। "পাখি" গল্পের পটভূমিকাটি সুন্দর, কিন্তু অভিনব নয়। ওই গল্পে শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় আক্রান্ত হাসানত তাই বৃহৎ কোনো সত্যের আস্বাদন দিতে পারেন নি। জাহিদের চোখে সাবিদের স্ত্রী রিজিয়াকে মৃত 'বালিহাঁসের মতো একটা পাখী' রূপে প্রতিভাত হওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কোনো সার্থক বৃত্ত গড়ে তোলা হয় নি। ফলে, "পাখি" অন্তঃসারশূন্য নিছকই গল্প হয়ে রইল। গঠন সুন্দর এবং সচলতার বেগে পুষ্ট। "নেপথ্যে"র মীনা অমৃতসাধনায় মনকে প্রস্তুত করে নি। তাই দীর্ঘকারাবাসের পর কমিউ-নিসট নেতা স্বামী আশরাফ ফিরে এলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠল। বিচ্ছেদ অপরিহার্য। আশরাফের সান্ত্বনা—তার শিশুপুত্র পিতার আদর্শের জয়গৌরব ঘোষণা করেছে, সে লিখেছে—'বাবা বড়ো হয়ে আমি তোমার মত হবো'। গঠনের অপটুতা সত্ত্বেও রসপরিণতির চমৎকৃতিতে সার্থক গল্পের আস্বাদন পাওয়া যায়। "ফেরা" রাজনৈতিক বৃত্তে আবর্তিত। দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌছুনোর তাগিদে গল্পটি স্বাদু হয়ে উঠতে পারে নি। "ঢিল" গল্পের উপসংহারে গেছ রায়তখাদক 'আজি-জের টিনের বাড়ি লক্ষ্য করে প্রচণ্ড বেগে' ঢিল ছুঁড়ে দিলেও লেখকের লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হয়েছে। রায়তখাদক আজিজের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের ব্যর্থতার কারণটি হল অতিকথন। মূল বিষয় থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লেখক শুধু ঘটনার মালা গেঁথেছেন।

সাধ আর সাধ্যের সার্থক মিলনেই শিল্পীর সৃষ্টি সচলতার বেগ লাভ করে। সেলিনা হোসেনের ক্ষেত্রে এই মিলনের অভাব দেখা গেল। আসলে, সেলিনার দুর্বলতা গল্প বলার দুর্জয় লোভ। "পরজন্মে"র সাতটি গল্পেই এমন স্বাক্ষর রয়েছে। লক্ষ্য চাষী কাসেম আলীর চার ছেলে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কিন্তু পত্নীবিয়োগের পর আটষট্টি বছরের কাসেম যখন বিয়ের সংকল্প নেয় তখন তো, পুত্রের জন্যে ভার্যা,—সেই পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক ভাবনাই জয়ী হয়ে ওঠে। অথচ লেখিকার অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। "ভিটেমাটি"তে জগলুহত্যা নিছকই ব্যক্তিগত আক্রোশ হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধার মহৎ স্বদেশভাবনা সু-মহান হয়ে ওঠে নি। মুক্তিযুদ্ধে আহত বিকলাঙ্গ মামুদের ক্ষোভের কারণ কি নারীসঙ্গলাভে বঞ্চিত জীবন?—এর উত্তর "যুদ্ধজয়ে" পাওয়া যায় নি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধাও অক্ষুণ্ণ থাকে নি। 'স্বাধীনতা দাঁতল শুয়োর ...ইত্যাদি'—ভাবাবেগে এরকম উপমার ব্যবহারে বিপদের পিচ্ছিল পথই উদাহৃত হয়। "ঋণশোধে" অভাব-অনটনে নিষ্পীড়িত মেহের আলীর পেনসনের টাকার প্রত্যাশা কিংবা পোসটাফিসের মনি অর্ডার-এর টাকা আত্মসাৎ করে নেওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কত সুন্দর গল্পই না গড়ে তোলা যেত। কিন্তু গল্পের প্রবল বর্ষণে চার-দিকই সব ঝাপসা হয়ে গেছে। সেলিনার প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, "মীর আজিমের দুর্দিন" গল্পে। যখন উপকরণ হৃদয়ে গান জাগায় তখনই উপকরণ গল্পকে মূল্যবান করে তোলে। আবার উপকরণহীন গল্পেও সংগীতের সুর ওঠে গভীরতম অনুভূতি আর উপলব্ধির সংযোগে। উপকরণহীন "মীর আজিমের দুর্দিনে" সেলিনা সংগীতের সুর তুলেছেন। "জলের রেখায়" শ্যামশ্রী বাংলাদেশের আলিঙ্গনে নিবিড় সুখের ঐশ্বর্য। 'স্রোতে' পিতা-কর্তৃক পলাতকা কন্যার নৃশংস হত্যা-কাণ্ড মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। আধুনিক কালেও এমন ঘটনা যে ঘটে না, এমন নয়, কিন্তু জীজীবেষু রসের প্রবাহে গল্পের ধারা পরিবর্তন করলে পরিতৃপ্তি পাওয়া যেত।

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে লেখক-লেখিকাকে 'অধিকতর সত্যে'র প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতেই হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থানভূমি থেকে মুখ ফিরিয়ে মাফরুহা চৌধুরী দৃষ্টি দিয়েছেন প্রেমের গল্পের দিকে। "প্রেমের গল্পে" সংকলিত হয়েছে তেরোটি গল্প। যথার্থ প্রেমের গল্পে যে গভীরতম মন্ময় উপলব্ধির অধিকার আবশ্যক তার অভাবে প্রেমের গল্প নরনারীর দেহগত আকর্ষণবিকর্ষণের মামুলি কাহিনীতে পর্যবসিত হয়। বইটির পশ্চাৎ-প্রচ্ছদে লেখিকার দৃষ্টি বোঝাতে লেখা হয়েছে, —'পরাবাস্তবের সুরা তৈরি,' 'মন্ময় মত্ততা নয় তন্ময় আর্তি' ইত্যাদি। এসব যদি কথার কথা না হয়ে থাকে, তবে তো প্রেমের গল্পে দেহসর্বস্বতার ঝোঁক অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে। প্রেমের গল্পে মনস্তত্ত্বের যেমন স্থান তেমনি শরীরতত্ত্বের অনুপ্রবেশ বাধাহীন। তন্ময় বা মন্ময় কি আলাদা-আলাদা বিচ্ছিন্ন গণ্ডি? বহির্দেশ আর অন্তর্-দেশ, সেও তো, এক বিশেষ সীমা-রেখায় পরিভ্রমণ। আমাদের শান্ত ভদ্র বাঙালি জীবনে প্রেম এখনো দেহের ভৃত্য নয়, অন্তরের আর্তি! মাফরুহার চোদ্দটি গল্পে তাই 'কখন দিলে পরায়ে স্বপন বরন ব্যথার মালা'র স্পর্শ না পেয়ে কিঞ্চিৎ নিরাশ হতে হল। তবে আশার আলো সঞ্চার করেছে, "চন্দন", "শরবত", "কেউ হয়", "দক্ষিণের বারান্দা" এবং "শূন্যক্লান্তি"। "অরণ্য-গাথা", "চীৎকার" এবং "রূপান্তর" মাধুরী এবং লাবণ্যের স্পর্শে ধন্য। "ব্লিডিং হার্টের ঝোপ", "নদী", "পরপর সন্ধ্যা", "কোথাও ঝড়" প্রভৃতি গল্পে নবীনতম প্রয়াস নেই, শুধু আধুনিকতম রূপ পরিচিতি লাভের জন্যে অনুবৃত্তির অধীন হওয়া মাত্র। মাফরুহা রোমান-টিক-পথগামী। গল্প বলার ভঙ্গি তাঁর আয়ত্তে। তাই রোমানটিক আবর্তনায় তাঁর গল্পগুলিতে আস্বাদনের আনন্দ জেগে ওঠে।

সাতটি গল্প নিয়ে এহসান চৌধুরীর "একাত্তরের গল্প"। এহসান পারি-পার্শ্বিক অবস্থানভূমির দিকেই দৃষ্টি রেখেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থান-ভূমি তাঁকে আগামী ভবিষ্যতের পথ খোঁজায় মনোনিবেশী হতে সাহায্য করে নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকা তাঁর সকল গল্পেরই আশ্রয়। কিন্তু তিনি নিরাশ্রয় করেছেন প্রত্যাশিত সংগ্রামী শপথকে। স্বাধী-নতার জন্যে যুদ্ধে অভিগ্রস্ত হয় স্বদেশ-ভূমি। আতাস্তর, ক্ষয়-ক্ষতি তো রয়েছেই কিন্তু মানুষ তাকে গ্রহণ করে আশীর্বাদরূপে, অভিশাপরূপে কখনই নয়। "রিলিফ" ও "ভবিষ্যৎ ভূমিকা"য় অন্ধকারের দ্বার মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু প্রতিশ্রুতি নেই। "মৃত সৈনিকের ডায়েরী", "গণমিছিল", "পরাজিত পদক্ষেপ" এবং "ঘুম নেই" গল্পে শুধু বিলাপের কোলাহল। "হাড়" গল্পটিকে 'রিপোর্টাজ'ভুক্ত করলে ভালো হয়। গল্প বলার জন্যে গদ্যের সহ-যোগিতা আবশ্যক। এই সহযোগিতা লাভের জন্য কবিকল্পনাই আরাধ্য। এহসান গল্প তৈরি করেছেন। কিন্তু ভালো কবিতার মতো গল্পও তো তৈরি করা নয়, হয়ে ওঠা। "একাত্তরের গল্প" পাঠে, বারবার, এসব কথাই ঘুরেফিরে উদয় হয়। গল্পকার তো শুধু গল্প রচনা করেন না, তিনি অকৃত্রিম শিল্পমন নিয়ে বিষয়কে দেশকালপাত্রের উপর ক্রিয়াবান করে তুলে অনন্তস্ফূর্তি দান করেন। এবং এই প্রযত্নেই কালের বুকে গল্পকারের শ্রেষ্ঠ আসন।

কান্তি গুপ্ত

চলচ্চিত্রের মহান ত্রয়ী

চার্লি দি কিড—সের্গেই আইজেনস্টাইন। বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

আইজেনস্টাইন—দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯। পঁচিশ টাকা।

বার্গম্যান—প্রলয় শূর। বাণীশিল্প, ১৪-এ টেমার লেন, কলকাতা-৯। চোদ্দ টাকা।

To my friend Sergei Eisenstein with my slncere admiration—নিজের ছবির নীচে এই কথাটি লিখে স্বাক্ষর করে আইজেনস্টাইনকে উপহার দিয়েছিলেন চারলি চ্যাপলিন। সেই ফোটোগ্রাফটি "চার্লি দি কিড" ছবির প্রচ্ছদ। একজন মহৎ চলচ্চিত্রকার সম্বন্ধে আর-এক মহৎ চলচ্চিত্র-পরিচালকের মূল্যায়ন "চার্লি দি কিড" নামের একটি প্রবন্ধ এবং আরো দুটি ছোটো রচনার অনুবাদ নিয়ে এই বই। প্রকাশক বইয়ের প্রথমে চ্যাপলিন এবং আইজেনস্টাইনের দুটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পরিশিষ্টে উভয়ের প্রতিতুলনা-

মূলক একটি রচনা সংযুক্ত করেছেন। এ থেকে বইটি প্রকাশের পিছনে প্রকাশকের একটি সুসমৃদ্ধ পরিকল্পনার পরিচয় পরিস্ফুট। আইজেনস্টাইনের জীবন এবং চলচ্চিত্রদর্শন স্বল্প পরিসরে গান্ত রোবের্জ যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, চ্যাপলিনকে চেনাতে বীতশোক ভট্টাচার্য কিন্তু তেমন পারেন নি। যে স্রষ্টা সহজ-সরলভাবে, সরস ভাষায় জটিল জীবনকে বর্ণনা করে গিয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে বখন ঘোরালো ভাষায় এবং কথার মারপ্যাঁচ করে কেউ লেখেন তা আদৌ সাজে না। বীতশোকবাবু এইরকমভাবে চ্যাপলিন সম্বন্ধে লিখতে যাওয়ায় বইয়ের প্রথম রচনাটিতেই ধাক্কা খেতে হয়।

"চার্লি দি কিড" আইজেনস্টাইন চ্যাপলিনের হাস্যরসের উৎস এবং বহুস্তু, দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য, কেন তিনি অনন্যকরণীয় এবং কোথায় তাঁর মহত্ত্ব—তার সংবেদনশীল অনুসন্ধান করেছেন। আমেরিকায় চ্যাপলিন-প্রতিভার বিকাশের কারণ কী এবং আমেরিকান চলচ্চিত্রের সমগ্র কর্মিক ঘরানা থেকে কোন্ লক্ষণে চ্যাপলিন স্বতন্ত্র—তা খুঁজে দেখে ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন লেখক। তিনি এক জায়গায় প্রশ্ন করেছেন—আমি জানতে চাই কোন্ চোখে পৃথিবীর দিকে তাকালে চ্যাপলিন তাকে যেভাবে দেখেছেন সেইভাবে দেখা যাবে। এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন এইভাবে—সবচেয়ে ভয়ানক, সবচেয়ে শোচনীয়, সবচেয়ে ট্র্যাজিক বস্তু ও বিষয়কে সহাস্য শিশুর দৃষ্টিতে দেখতে পারার ক্ষমতা। নেপোলিয়নকে নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ ছবি তৈরির পরিকল্পনা ত্যাগ করে হিটলারকে নিয়ে চ্যাপলিনের ছবি তৈরির অভিপ্রায় ঘোষণা এবং নানা টানাপোড়েনের পর "গ্রেট ডিকটেটর"-এর মুক্তি তৎকালের সমস্ত বোধসম্পন্ন মানুষকেই আলোড়িত করেছিল। "গ্রেট ডিকটেটর"-এর ইউরোপে মুক্তির এক যুগ পরে, ১৯৫৭ সালে, ক্রফো যখন পুনরায় ছবিটি দেখেন, নোতুনভাবে স্পন্দিত হয়ে তিনি এই ছবিটির ওপর একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ রচনায় বাধ্য হয়েছিলেন —স্বতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ আবহের মধ্যে ছবিটি দেখে আইজেনস্টাইন যে কী-রকম তীব্র নাড়া খেয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়, এবং সেই প্রমাণ রয়েছে এই প্রবন্ধের শেষাংশে এবং আলাদা করে লেখা একটি রচনায়। বইটির পরিশিষ্টে ধীমান দাশগুপ্ত-কৃত উভয় স্রষ্টার প্রতিতুলনা ক'রে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তালিকা রয়েছে। তিনি ৫৩টি সূত্র সাজিয়ে পাঠকদের এই তালিকাটি বাড়িয়ে তুলতে আহ্বান জানিয়েছেন। খুব ভালো প্রস্তাব, কিন্তু ধীমানবাবুর কয়েকটি সূত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ আছে যে! যেমন, ১৬ নং সূত্রে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন 'সব মিলিয়ে পরিচালকের নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে চার্লি কখনোই সচেতন ছিলেন না।' এ কথা কি আদৌ সত্য? চ্যাপলিনের বিখ্যাত আত্মজীবনী পড়লেই জানা যায়, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো শুধুমাত্র একজন অভিনেতার ভূমিকা থেকে চলচ্চিত্রের সামগ্রিক সৃষ্টিকর্মের নিয়ন্তা হিসেবে পরিচালকের ভূমিকায় তিনি কিভাবে সচেতন পদক্ষেপে উঠে এসেছিলেন ক্যামেরার পিছনে। ছবি পরিচালনার জন্য তাঁর মধ্যে কী প্রবল আগ্রহ দানা বেঁধেছিল। তেমনি ৪০ নং-এর শেষে ধীমানবাবু যখন সিদ্ধান্ত টানেন—'হ্যাঁ, সোর্গেই-এর প্রিয় ব্যক্তি দা ভিঞ্চি-ই। চ্যাপলিনের প্রিয় জন্তু হল নেকড়ে।' তখন তা বড়োই হাস্যকর শোনায়। আইজেনস্টাইনের মূল্যবান কয়েকটি রচনার অনুবাদ প্রকাশ ক'রে বাঙালির চ্যাপলিন-চর্চায় সাহায্য করার জন্য প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

দিলীপ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "আইজেনস্টাইন" বইটির মধ্যে আটটি প্রবন্ধে পরিচালকের জীবন, দর্শন, চলচ্চিত্রফর্ম এবং তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। চারটি মৌলিক আর চারটি ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা প্রবন্ধগুলির লেখক কয়েকজন প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রবিদ। এগুলির কয়েকটি দু দশক আগের লেখা। মারী সীটনের প্রথম লেখাটিতে সামগ্রিকভাবে আইনস্টাইনের পরিচয় জ্ঞাপন। পরবর্তী প্রবন্ধগুলিতে তাঁর চলচ্চিত্রের শিল্পগত এবং তত্ত্বগত দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা। "এলিজাবেথীয় ঐতিহ্যের আলোকে আইজেনস্টাইন" প্রবন্ধে উৎপল দত্ত, বাঙলায় শেক্সপীয়র-চর্চার এক পুরোধা, উক্ত নাট্য-ঐতিহ্য থেকে আইজেনস্টাইন কিভাবে তাঁর চলচ্চিত্র-নির্মাণের রসদ সংগ্রহ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ক'রে বুঝিয়েছেন। ভ্লাদিমির নিকনির রচনাটি পড়ে ক্লাসরুমে তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলচ্চিত্রশিক্ষক আইজেনস্টাইনকে পাওয়া যায়—ফিল্মনির্মাণের মতোই তরুণ ছাত্রদের কাছে চলচ্চিত্রের শিল্প আর বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে যাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। আইজেনস্টাইন সম্বন্ধে কিছু লিখতে গেলে দুটি পরিভাষা অপরিহার্য —মনতাজ এবং টাইপেজ। সম্পাদক নিজে এই দুটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমার মতে, এ বইয়ের সবচেয়ে মূল্যবান দুটি প্রবন্ধ গান্ত রোবের্জের "আইভান দি টেরিব্‌ল-এর নন্দনতত্ত্ব" এবং এব গুপ্তের "মানুষ : ব্যক্তি ও সমষ্টি এবং আইজেনস্টাইন"। রোবের্জ তাঁর দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধটিতে ধর্ম, দর্শন, সংগীত, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব—বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশাল চলচ্চিত্রটির দুটি পর্ব সম্বন্ধে যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন, সেটি বাঙলায় ভাষান্তরিত হয়ে একটি কাজের কাজ হল। সমাজবাস্তববাদী শিবিরের লেখক-শিল্পীরা সমষ্টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ব্যক্তিকে অস্বীকার করার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন এবং করেন। আইজেনস্টাইনও প্রথম দিকে তাই করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর চিন্তার পরিবর্তন হয়। পরবর্তী কালে তাঁর শিল্পে এই বিবর্তিত চিন্তাচেতনা কিভাবে রূপ গ্রহণ করে, তিনি ক্রমশ সমষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিও মনোযোগী হয়ে ওঠেন, এবং চলচ্চিত্রে ব্যক্তিমনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করতে থাকেন তা উদাহরণসহযোগে দেখিয়েছেন এব গুপ্ত। প্রবন্ধটি শিল্পতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাদ-বিসংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হওয়ায় চিন্তা-উদ্রেককারী এবং বিতর্কমূলক।

বইটির প্রচ্ছদে আইজেনস্টাইনের একটি ব্যঙ্গাত্মক আত্মপ্রতিকৃতি এবং পিছনের মলাটে সত্যজিৎ রায়-কৃত তাঁর মুখাবয়বের স্কেচ নজর কাড়ে।

প্রলয় শূরের "বার্গম্যান" বইটিকে মৌলিক রচনা বলা যায় না, কারণ আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত বইটির প্রধান তিনটি বিখ্যাত বিদেশী বইয়ের থেকে মূল অংশের অনুবাদ। অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলিও বিভিন্ন বিদেশী লেখকের বার্গম্যান-সংক্রান্ত রচনার থেকে তথ্য এবং তত্ত্ব সংগ্রহের মাধ্যমে সংগঠিত। বার্গম্যানের মতো এক দৈত্যপ্রতিম শিল্পী এবং তাঁর বিশাল বহুমুখী কর্মকাণ্ডকে (যিনি বলেন—কখনো বছরে দুটো ছবি করছি, তিন-চারটে নাটক করছি, তাছাড়া রয়েছে রেডিও-প্লে··· এবং যিনি তুলনাভাবে নাট্য-পরিচালনায় জড়িয়ে থেকেও চলচ্চিত্র-পরিচালনায় প্রথম তেরো বছরে উনিশটি ছবি করেন) ধরার জন্য এ বইয়ের পরিসর অত্যন্ত সংকীর্ণ। তবুও বাঙলা ভাষায় বার্গম্যানকে নিয়ে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে—এ কম লাভ নয়। "জীবনের রেখাচিত্র" এবং "আলাপে সংলাপে পঞ্চাশ ঘণ্টা" এই দুটি পরিচ্ছেদে বার্গম্যানের গড়ে ওঠা, অগাধ নাট্যপ্রেম, নাট্যচর্চা, চলচ্চিত্রের জগতে পদার্পণ এবং ক্রমশ চলচ্চিত্র-মহাকাশের এক দীপ্যমান নক্ষত্র হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত জানা যায়। "আপন ভাষা" পরিচ্ছেদটি একটি সাক্ষাৎকার থেকে তৈরি। গ্রন্থগুলি বাদ দিয়ে লেখক উত্তরগুলি থেকে কিছু-কিছু অংশ তুলে দিয়েছেন। তা থেকে আমরা বার্গম্যানের মানসলোক সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারি। সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন চার্লস টমাস সামুলাস। স্বপ্ন আর কল্পনার প্রভাবে তাঁর শৈশব-কাল, তাঁর ছবিতে স্বপ্নের ভূমিকা, নিজের ছবিগুলিকে তিনি কিভাবে দেখেন, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তিনি কেমন গুরুত্ব দেন, কিভাবে তিনি প্রথম দিকের ছবিগুলিতে পর-পর রূপ করতে-করতে একসময় নিজের ওপর আস্থা অর্জন করলেন এবং বুঝলেন সিনেমা মাধ্যমটি তাঁর আয়ত্তে এসেছে, বার্থতাপর্বে একটা ফিল্ম করার সুযোগ পাবার জন্য তাঁর দুর্দান্ত আগ্রহ—একটি মানুষের, একজন শিল্পীর এই সংগ্রাম আর সাধনার কাহিনী জানা যায়।

লেখক বার্গম্যানের কয়েকটি মাস্টারপীস নিয়ে অন্যান্য পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন—সংক্ষেপে ফিল্মগুলির বিষয়বস্তু, চরিত্র আর বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। লেখক যেন কেবল চিত্রনাট্য পাঠ করে বা কোথাও-কোথাও বিদেশী পণ্ডিতদের মতের অনুসরণে এগুলি লিখেছেন। নিজে ছবিগুলি দেখে নিজস্ব অনুভূতি-অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা বা বিচার বিশ্লেষণ করেছেন মনে হল না। তা করলে খুব ভালো হত। এ বইয়ের একটি চিত্তাকর্ষক মুগ্ধ হয়ে পড়বার মতো পরিচ্ছেদ 'L 136'। Vilgot Sjoman-এর লেখা ওই নামের একটি বইয়ের, যা বার্গম্যানের "উইন্টার্স নাইট" ছবি তৈরির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গঠনক্রিয়ার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ডায়েরি, সাবাংশের অনুবাদ। পড়তে-পড়তে আকাশাশ হয়, কই আমাদের Sjoman নেই যিনি সত্যজিৎ রায়ের একটি চলচ্চিত্র-নির্মাণের সমগ্র পর্ব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অবশ্য, তাজিৎ রায়ের প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিল চৌধুরী সত্যজিতের কয়েকটি ছবি তৈরির (বিশেষত অপু-ট্রিলজি) নেপথ্যকাহিনীর কিছু-কিছু অংশ আমাদের জানিয়েছেন। কিন্তু তার ধরন অন্য। লেখক বার্গম্যানের চলচ্চিত্রে প্রধানত নিঃসঙ্গতা, প্রেম, মৃত্যু ও ঈশ্বর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বার্গম্যানের

জীবন এবং চলচ্চিত্রের কোনো আলোচনাগ্রন্থে যে বিষয়টির আলোচনা একান্ত অপরিহার্য এ বইয়ে কিন্তু তা নেই। আমি বলতে চাইছি 'নারী'র কথা। ১৯৮৩ সালে "বার্গম্যানস্ ওপাস" নামের একটি রচনায় ক্রুকো লিখেছেন —Like Ophuls and Renoir, Bergman's work centres on woman,…Ophuls and Bergman tend to show us men through women's eyes। একটি সুইডিশ জার্নাল যখন একবার মন্তব্য করেছিল —Bergman is much wiser about women (than men), বার্গম্যান নিজে তখন প্রত্যুত্তরে ঘোষণা করেছিলেন The world of women is my universe। সুতরাং বার্গম্যানের চলচ্চিত্রে নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্ব নিয়ে একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের আবশ্যক ছিল। আশা করি, বইটির পরবর্তী সংস্করণে লেখক তা সংযোজন করবেন। এছাড়া তিনি যখন মূলত অনুবাদের ওপর ভিত্তি করে বইটি লিখেছেন তখন ক্রুকোর "দ্য ফিলম্স্ ইন মাই লাইফ" মহাগ্রন্থ থেকে উল্লিখিত রচনাটির অনুবাদ প্রকাশ করলে তাঁর বইয়ের গুরুত্ব আরো বেড়ে যাবে, কারণ তাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের এক শ্রেষ্ঠ বিশ্ববন্দিত পরিচালকের দৃষ্টিতে বার্গম্যান কিভাবে ধরা পড়েছেন পাঠক তা জানতে পারবেন।

মেঘ মুখোপাধ্যায়

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলাম

Islam and Indian Culture by B. N. Pande. Rupa & Co, Calcutta 7000073. Price not mentioned.

ওড়িষার রাজ্যপাল বি. এন. পাণ্ডে একাধারে প্রশাসক আর ঐতিহাসিক। পাটনায় প্রদত্ত খুদাবক্স্ স্মারক বক্তৃতা ভিত্তি করে এই পুস্তিকাটি রচিত। আধুনিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অনেক তথ্য পুস্তিকায় ছড়ানো আছে।

ইসলাম আর হিন্দুধর্মের মধ্যে সংঘর্ষ আর সমন্বয় দিয়ে পাণ্ডে আলোচনা শুরু করেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা সাম্প্রদায়িক বিরোধকে অতিরঞ্জিত করেছেন। দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীকে "মুসলমান যুগ" বলে চিহ্নিত করা ভুল। ঐতিহাসিক পর্ববিচার করতে হয় সমাজবিকাশের ধারা এবং মানুষের ধ্যানধারণা ভিত্তি করে। এই যুগকে মধ্যযুগ বলা সংগত। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ সুপরিচিত। মধ্যযুগীয় সমাজ ভারতেও তখন প্রচলিত ছিল।

মুসলমান শাসকরা "মুসলিম শাসন" প্রতিষ্ঠিত করেন নি। সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত। উচ্চপদে হিন্দুদের নিয়োগ, বিপুল জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে রাখা, হিন্দুধর্ম অনুসরণের স্বাধীনতা দিয়ে মুসলমান শাসকরা তাঁদের শাসনের ভিত শক্ত করেছেন। আলাউদ্দিন খলজি এবং আকবর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিলেন। মোগল যুগে দেখা গেল "ভারতীয়তা-বোধ" : বিশটি সুবায় এক শাসনব্যবস্থা, এক মুদ্রাব্যবস্থা, এক রাষ্ট্রীয় ভাষা (ফারসি); এক নগর থেকে অন্য নগরে, এক সুবা থেকে অন্য সুবায় বণিকরা তখন ভ্রাম্যমাণ। ভারতীয় ঐক্য কবিকল্পনা নয়।

ঔরঙজেবকে নিয়ে পাণ্ডে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। যে তথ্য হয়তো আমাদের জানা নেই তা হল মন্দির-নির্মাণে জাগির দিয়ে তাঁর ফরমান। তাঁরই আনুকূল্যে কয়েকটি বড়ো মন্দির ১৬৫৯-১৬৮৫ পর্বে নির্মিত হয়েছিল। ইতিহাসের বইয়ে আজও ছাত্ররা পড়ে যে সম্রাট বারাণসীর মন্দির ধ্বংস করেছিলেন! পাণ্ডের লেখায় সম্রাটের ইতিবাচক ভূমিকা প্রাধান্য পেয়েছে।

ভক্তি-আন্দোলনের দান সত্যি অবিস্মরণীয়। ইতিহাসের ছাত্রদের এই বিষয়টি পরিচিত। নানক, কবীর, চৈতন্য, রামদাস, একনাথ সাধারণ মানুষের মধ্যে এক উদার, মানবতাধর্মী ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বলে সাম্প্রদায়িকতা গ্রামদেশে ছড়াতে পারে নি —মৌলবী-মোল্লাদের চেষ্টা সত্ত্বেও। হিন্দুধর্মের প্রচণ্ড গোঁড়ামির ফলে গ্রামদেশের নিম্নবর্গ এবং শহরের কারিগর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ফারসি রাষ্ট্রভাষা হলেও মধ্যযুগেই বিকশিত হয়েছিল প্রাদেশিক ভাষাসমূহ। পানজাবি মুসলমানের ভাষা পানজাবি, বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাঙলা। উত্তর ভারতে গড়ে উঠেছিল সুমধুর উর্দু ভাষা আর সাহিত্য, আর সেই সঙ্গে সংগীতের বিভিন্ন "ঘরানা" আর বাদ্যময়।

পাণ্ডের পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

সুনীল সেন

বাংলাদেশের কথাসাহিত্য

শান্তনু কায়সার

মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে বাংলাদেশের কথাসাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝি, সেটা দেখা দরকার। ১৯৭১-এ বাংলাদেশ-নামক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও এর জনগোষ্ঠী এবং সাহিত্যচর্চার একটি উৎসভূমি আর ধারাবাহিকতা রয়েছে। সেটি বিবেচনা করলে বাঙলা কথাসাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকে তার ধারাবাহিকতায় যেমন এর উৎসমুখকে চিহ্নিত করতে পারব, তেমনি ভূগোল, ইতিহাস, জীবনবোধ আর সংস্কৃতিচর্চার স্বাতন্ত্র্য তার ভিন্ন মাত্রা এবং চারিত্র অনুসন্ধান করতেও সক্ষম হব। ফলে কথাসাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ী আমাদের বিবেচ্য হলেও, ঐতিহাসিক কারণেই বাঙালি মুসলমানের গদ্যচর্চার প্রারম্ভিক পর্ব থেকে তার ধারাবাহিকতার মধ্যেই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের মৌল রূপ এবং চারিত্রের সন্ধান করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা যদি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে উপন্যাসধর্মী রচনার পথিকৃৎ মীর মোশার্‌রফ হোসেনের প্রথম গ্রন্থ "রত্নবতী" (১৮৬৯) বা পরিণততর রচনা "বিষাদ-সিন্ধু" (১৮৮৫-১৮৯১)র কথা স্মরণ করি, তাহলে দেখব, ভাষারীতি, কাহিনীবিন্যাস আর বর্ণনা এবং গদ্যচর্চায় বাংলাদেশের আবহমান ধারাই তাতে অনুসৃত। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে বাঙালি মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করানোর প্রবক্তা নওয়াব আবদুল লতিফকে তাঁর "বসন্তকুমারী নাটক" উৎসর্গ করলেও নওয়াবের অভিজাত মুসলমানদের উরদুচর্চার বিপরীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষায় আরবি-ফারসি-কণ্টকিত বাঙলা চর্চার সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে মীরের মতো সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হবে কলকাতা পর্ব থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে শারীরিক আর আত্মিক ভাবে সম্পর্কিত এবং তার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট কথাসাহিত্য। একারণে যেসব রচনা বাংলাদেশ ভূখণ্ডের বাইরে রচিত হয়েছে কিংবা যেসবের লেখকরা এই ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন নি, অথবা সেখানে আর ফিরে আসেন নি, সেরকম রচনাও বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। উদাহরণ হিসেবে আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি," হুমায়ুন কবিরের "নদী ও নারী" এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণের "তিতাস একটি নদীর নাম"-এর কথা বলতে পারি। মানিক আর হুমায়ুন কবির পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে যে জীবন এবং জীবনদৃষ্টির সৃষ্টি ও চিত্রণ করেছেন, এবং অদ্বৈত মল্লবর্মণ আর মানিক নদীকেন্দ্রিক অন্ত্যজ মানুষদের যে আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলাদেশেরই অন্তঃসংবাদ। আবার বাংলাদেশ-ভূখণ্ডে বসবাসকারী লেখকরা যখন ভারতের পশ্চিমবঙ্গকে পটভূমি করে প্রধানত সেখানকার চরিত্রদের নিয়ে উপন্যাস লেখেন, তখন তাও বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অংশে পরিণত হয়। শওকত ওসমানের "যাত্রাবিন্দু" বা শওকত আলীর "শরিক" অথবা "ওয়ারিশ"-এর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। ভিন্ন পটভূমিতে রচিত হলেও এসবের শেকড় যে বাংলাদেশেই প্রোথিত, বা তার আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়োজনেই সৃষ্ট, তা বোঝা যায় "ওয়ারিশ"-এর শেষ ছটি বাক্য থেকে : 'জানালা দিয়ে

বাংলাদেশ থেকে

বাইরে নজর মেলে দেয়। গাড়ি তখন বাংলাদেশের দিকে ছুটছে।' বিষয়টি আরো স্পষ্ট হতে পারে যদি আমরা মনে রাখি, অমিয়ভূষণ মজুমদারের "মহিষকুড়ার উপকথা"র প্রধান চরিত্রেরা মুসলমান হলেও বা গৌরকিশোর ঘোষের "প্রেম নেই" পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম পটভূমিতে প্রধানত মুসলমান চরিত্রদের নিয়ে রচিত হলেও তা বাংলাদেশের কথাসাহিত্য নয়। তবে শেষোক্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৩৫ থেকে ৩৭-এর, এবং তা বিভাগ-পূর্ব রাজনীতি এবং সংস্কৃতির পরিচয়জ্ঞাপক বলে এর সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ও ধারাবাহিকতার যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু উভয় উপন্যাসের প্রেক্ষণদৃষ্টি স্বতন্ত্র বলে তা আমাদের সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনাম "বাংলাদেশের কথাসাহিত্য" হলেও প্রধানত উপন্যাসের বিবেচনা থেকেই আমাদের মন্তব্য এবং বিশ্লেষণসমূহ উপস্থাপিত হবে। এই প্রধান রূপকল্পের বিচার-বিবেচনা, আশা করা যায়, বাংলাদেশের

সামগ্রিক কথাসাহিত্যের চারিত্র-চিত্রণ এবং শনাক্তকরণে সাহায্য করবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "উপন্যাসের ধারা"য় লিখেছেন, 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।' এই বিজ্ঞানমনস্কতা আবার ঐতিহাসিক বাস্তবতাবোধ এবং বস্তুবাদী চেতনার দ্বারা পরিচালিত। সামন্ততন্ত্রের অবসানে কিংবা তার ক্ষয়িষ্ণুতায় সৃষ্ট এবং উত্থিত বুরজোয়া বিকাশের সঙ্গে ইউরোপে যে সামাজিক সচলতার জন্ম এবং ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তারই ফলে জন্মলাভ করে উপন্যাস-রূপকল্প। যে সামাজিক সচলতায় সমাজ আর মানুষে এবং মানুষে আর মানুষে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, উপন্যাস প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। ভারতীয় উপ-মহাদেশে এবং অবিভক্ত বঙ্গে পূর্ণ বুরজোয়া তথা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সুযোগ রুদ্ধ অথবা সীমিত থাকায় যাঁর হাতে বাঙলা উপন্যাস প্রকৃত অর্থে জন্মলাভ করে আর বিকশিত হয়, সেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিমনস্বিতার ফলে প্রবন্ধ যতটা ঋদ্ধ হয়েছে, তাঁর উপন্যাস ততটা বিকশিত হয় নি। উপন্যাস লেখার জন্যে তাঁকে সামন্ততন্ত্রের আশ্রয়-স্থল জমিদারগৃহে অথবা দূরতর অতীতে যেতে হয়েছে, নগরজীবনে তাঁর চরিত্ররা স্বাভাবিক বিকাশের পথ খুঁজে পায় নি। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় বঞ্চিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশই যেখানে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, সেখানে উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের দ্বারা এ রূপকল্পের যথার্থ চর্চা যে সম্ভব হয় নি, তা বলাই বাহুল্য। তবু মীর মোশাররফ হোসেনের তিনটি প্রধান রচনা "বিষাদ-সিন্ধু", "উদাসীন পথিকের মনের কথা" (১৮৯০) আর "গাজী মিয়াঁর বস্তানী" (১৮৯৯)-তে উপন্যাসের যে নানা লক্ষণ প্রকাশিত, তা-ই বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের প্রারম্ভিক ধারাকে লালন করেছে। যদিও "বিষাদ-সিন্ধু"তে মীর দূরতর অতীতে এবং পরের দুটি রচনায় জমিদারগৃহকে আশ্রয় করেছেন, তবু তিনটি রচনায়ই বুরজোয়া এবং ব্যক্তিত্ববিকাশের নানা লক্ষণকে ধারণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ধর্মবোধদ্বারা পরিচালিত হলেও মীরের "বিষাদ-সিন্ধু"র নায়ক হোসেন নয়, এজিদ। নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে পরিকল্পিত হলেও তার প্রেম আর ঈর্ষা, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা আর তাকে অর্থবহ করে তোলার জন্যে এজিদ যে বাস্তববোধ, বুদ্ধি আর কৌশলের পরিচয় দেয়, তাতে তার ব্যক্তিত্বই প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সামাজিক সংস্কারের কারণে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র রোহিণীর বিকাশের পর্বে তাকে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হন না, সেখানে মীর তাঁর ধর্মবোধ সত্ত্বেও এজিদকে হত্যা করবার পরিবর্তে প্রজ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করানোর মধ্যে তাকে বন্দী করে এই চরিত্রকে এক ট্রাজিক মহিমা দান করেছেন। এরপর "উপসংহার" পরিচ্ছেদটি লেখা হলেও মীর যখন এজিদের ওইভাবে বন্দী হওয়ার পরই জানান, 'এ মহাকাব্য 'বিষাদ-সিন্ধু'র ইতিও এইখানে হইল' তখন এজিদের নায়ক হওয়া বিষয়ে ঔপন্যাসিকের স্পষ্ট সমর্থন ব্যক্ত হয়। সে কারণে পুথি-প্রভাবিত অলৌকিকতা সৃষ্টি সত্ত্বেও "বিষাদ-সিন্ধু" বাঙালি-মুসলমান রচিত উপন্যাসের পথিকৃৎ। বুরজোয়া বিকাশের একটি লক্ষণ নারীর জাগরণ। মীর যদিও এ চরিত্রটিকে নেতিবাচক হিসেবেই অঙ্কন করেছেন তবু "গাজী মিয়াঁর বস্তানী"র বেগম ঠাকুরণের উক্তিতে ওই জাগৃতির লক্ষণ স্পষ্ট। ভেড়াকান্তর স্ত্রীকে বেগম বলছে, 'স্বামীর চাইতে যদি আমার গুণ বেশী থাকে তবু তাঁকে মাথার মণি ভেবে মাথায় করে নাচতে হবে নাকি? আমার চাইতে যদি তার বুদ্ধি বেশী না থাকে তবু স্বামী বলে তাঁর পদানত হয়ে থাকতে হবে নাকি?' (অষ্টাদশ নথি)।

অন্যদিকে আঙ্গিক-চেতনায়ও মীরের ভাবনা ছিল অগ্রসর। ১৯৭৯-এ লেখা উপন্যাসে সৈয়দ শামসুল হক ("বালিকার চণ্ডযান" ও অন্যান্য) ইংরেজি আর বাংলা সংলাপের পার্থক্য ধরিয়ে দেয়ার বা ১৯৮৬তে লেখা শওকত আলী তাঁর উপন্যাসে ("প্রেমকাহিনী") লেখকের জবানিতে ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যা উপস্থিত করবার যে প্রয়োজন অনুভব করেন, তা মীর "উদাসীন পথিকের মনের কথা"য় বহুপূর্বেই অনুসরণ করেছেন। এ গ্রন্থের যথাক্রমে একাদশ এবং দ্বাদশ তরঙ্গ তার প্রমাণ।

ফলে শুধু ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার কারণেই নয়, উপন্যাসচিন্তা এবং আঙ্গিকভাবনায়ও পূর্বসূরী উপন্যাস আর ঔপন্যাসিকদের চিন্তাচেতনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং তা থেকে প্রাসঙ্গিকতার সূত্রসমূহ অনুসন্ধান এবং অনুধাবন করা আমাদের প্রয়োজন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী 'উপন্যাসের ঘোর বিরোধী' হলেও 'কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায়' বঙ্কিমচন্দ্র রঙ্গলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ রচিত 'উদ্ভট' উপন্যাসের প্রতিবাদ করতে গিয়ে "রায়নন্দিনী", "তারাবাঈ", "নূরউদ্দীন", "ফিরোজা বেগম" প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। মতীয়র রহমান খানও এই ধারার অনুসারী ছিলেন। আবার অন্যদিকে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁর নারীজাগরণ-বিষয়ক এবং আদর্শান্বিত উপন্যাসধর্মী রচনা "সুলতানার স্বপ্ন" বা "অবরোধবাসিনী" রচনা করেন। লেখকের আদর্শ-বাদ প্রচারের বাহন হয়েছে ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানের উপন্যাসের চরিত্ররা। "সরলা", "পথহারা", "রায়হান" বা "বাসর-উপহার" এর উদাহরণ। শেষোক্ত উপন্যাসের নামটিই উন্মোচন করে দেয় লেখকের অভিপ্রায়। উপন্যাস হিসেবে এসবের সার্থকতা যাই থাক, এগুলো আমাদের কথাসাহিত্য রচনার প্রাথমিক পর্বের নানা প্রবণতা এবং জটিলতাকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। যেমন সিরাজী একদিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, আবার অন্যদিকে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের প্রেরণায় বিশ্বাস করেন প্যান-ইসলা-মিজমে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'নীচতা'র প্রতিবাদ করার জন্যে প্রবল অনিচ্ছায় উপন্যাস রচনায় হাত দেন, অথচ তা করতে গিয়ে বঙ্কিম-প্রভাব থেকে একেবারেই মুক্ত হতে পারেন না।

তবে প্রাথমিক পর্বে মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ এবং উপন্যাসে তার প্রকাশ সম্পর্কে বুঝতে হলে আমাদের দুটি উপন্যাসের দ্বারস্থ হতে হবে: নজিবুর রহমানের "আনোয়ারা" (১৯১৪) এবং কাজী ইমদাদুল হকের "আবদুল্লাহ" (১৯২৫)। "আনোয়ারা" ইংরেজি-শিক্ষিত বৃত্তিজীবী মুসলিম মধ্যবিত্তের উত্থানপর্বের কাহিনী। পল্লী এবং পারিবারিক জীবনের বিশৃঙ্খলা, নীতি আর নৈতিকতা, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এবং ব্যাবসা, প্রেম আর ধর্মবোধের পারস্পরিক ঐক্য আর টানাপোড়েন এই উপন্যাসে চিত্রিত। উত্থানপর্বের এই শ্রেণীকে লেখক কিছুটা উপদেশ দিতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। উপন্যাসের নায়ক নূরুল ইসলাম পাটের ব্যবসায়ী। তার জীবনের নানা সংকট সত্ত্বেও উপন্যাসের পরিণতি সম্ভবত শিক্ষিত মুসলিম মধ্য-বিত্তকে চাকুরির পরিবর্তে ব্যাবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হতে আহ্বান জানায়। "আবদুল্লাহ" উপন্যাসটি কাজী ইমদাদুল হক সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। তবে যতটা তিনি লিখে গিয়েছেন তাতেই লেখকের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক আবদুল্লাহ। সে আর তার শ্যালক, ভগ্নিপতি আর বন্ধু আবদুল কাদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, উদার, সংস্কারমুক্ত। আবদুল্লাহ আর কাদের উভয়ে আভিজাত্যবিরোধী এবং শরাফতির মোহ থেকে মুক্ত। সেজন্যে আবদুল্লাহ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পীরব্যাবসা করতে যেমন তেমনি শ্বশুরের কাছ থেকে অর্থ-গ্রহণেও অনীহ। অন্যদিকে মাতার আপত্তির কারণে পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়ার জন্যে মীর মোহসিন আলীর কাছ থেকে সুদে টাকা গ্রহণও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশ্য নানা ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে আবদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত স্বোপার্জনে সক্ষম হয়। আবদুল কাদেরও তাঁর পিতার 'খাঁটি' শরাফতির ব্যূহ এবং মোহ থেকে মুক্ত হতে এবং বনেদি পরিবারের কাছে নিন্দিত ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ হয়। যে সমাজে মাত্র 'পনের দিনের দারগাগিরিতে' 'বঙ্গদেশের একেবারে শরিফতম ঘর' বলে পরিচিত হতে কোনো বিঘ্ন ঘটে না, সেখানে ওই বস্তুটি যে নিছক বায়বীয় তা বুঝতে আবদুল্লাহর এতটুকু অসুবিধে হয় না। উপন্যাসের একটি চরিত্র মীর মোহসিন আলী শরাফতির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে রাজি নন। পরোপকারী আর বন্ধু-বৎসল এই ব্যক্তিটি যুগের দাবি মেনে পাটের ব্যাবসা করেন আর মহাজনি সুদে টাকা খাটান। আবদুল্লাহ মনে করে ধর্মানুমোদিত না হলেও এর মধ্যেই মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত। অন্যদিকে কাদেরের পিতা সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস মসজিদের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করার জন্যে সম্পত্তি বিক্রি করার পরও ভোলানাথ সরকারের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করেন এবং তাঁর তথাকথিত শরাফতি বজায় রাখার জন্যে মহেশ বোস কর্তৃক তসরূপকৃত আটশ টাকা কলমের এক খোঁচায় মওকুফ করে দেন। অথচ তিনিই ইসলামের মৌলনীতি এবং সাম্যের বিরুদ্ধে গিয়ে আশরাফ-আতরাফ-বোধের দ্বারা পরিচালিত হন এবং সেকারণে দরিদ্র মৌলভী সাহেবকে "আতরাফ" ঘরের পড়ুয়াদের "আশরাফ" ঘরের পড়ুয়াদের চেয়ে কম সবক দিতে বাধ্য করেন ও বরিহাটিতে মসজিদের ইমাম জোলা বলে তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অস্বীকার করেন। এই উপন্যাসে নারীচরিত্রের অপ্রাধান্যই শুধু নেই, বা তারা পরদান্তরালবর্তীই শুধু নয়, বরং পুরুষশাসিত সমাজের নানা নিয়ম আর নিয়ন্ত্রণে তারা বন্দী। উপন্যাস দুটিতে উত্থাপিত সমাজচিত্রের গুরুত্ব বোঝা যাবে আমাদের একজন প্রবীণ ঔপন্যাসিক আবু রুশদের এই উক্তি থেকে:

'ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অবিভক্ত বাঙলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতেই অনেক যুগ গেছে।'[১] উপন্যাসদ্বয়ে চিত্রিত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের গঠনপর্বে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, টানাপোড়েন, পিছুটান, দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতা এবং তারই মধ্যে প্রাগ্রসরতা লক্ষ করা গেছে, তাই নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে আমাদের বর্তমান জীবন আর উপন্যাসের ধৃত এবং চিত্রিত হয়েছে।

তিরিশ আর চল্লিশের দশকে এসে অখণ্ড বঙ্গে নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে চলে যা বিকাশমান মুসলিম মধ্যবিত্ত এবং তাঁদের সাহিত্যচর্চায় প্রভাব ফেলতে থাকে। এসবের প্রতিক্রিয়ায় তাঁরা হয় ওই সময়ই উপন্যাস রচনা করেন, নয় পরবর্তী কালে লেখা উপন্যাসে ওইসব রসদ ব্যবহারের জন্যে স্মৃতি এবং চেতনায় জমিয়ে রাখেন। এই সময়-পরিসরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন এবং মন্বন্তর, কলকাতায় জাপানি বোমা, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন এবং বিয়াল্লিশে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠন, কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তানের জন্ম এবং বঙ্গবিভাগ ইত্যাদি ঘটনা ঘটতে থাকে। ঘটনাবলী শুধু যে নৃশংসতা আর ভয়াবহতারই জন্ম দেয় তা নয়, বরং ওইসবের সঙ্গে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রসার, গণতান্ত্রিক চেতনা, আধুনিক জীবনদৃষ্টি, ইহলৌকিক চেতনা এবং তার পরিণতিতে সামগ্রিক জীবনবোধেরও সৃষ্টি করে। এর ফলে উপন্যাস একটি তাৎপর্যপূর্ণ রূপকল্প হিসেবে গড়ে ওঠে। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাজী নজরুল ইসলাম "মৃত্যুক্ষুধা" (১৯৩০) ও "কুহেলিকা" (১৯৩১) উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের সমষ্টিগত দারিদ্র্যকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রণ করেন এবং তার জন্যে সাম্রাজ্যবাদকে দায়ী করে পরাধীন ভারতের মুক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের অপরিহার্যতাকে চিহ্নিত করেছেন। পাকিস্তানের জন্মের দীর্ঘদিন আগে রচিত আবুল ফজলের "জীবনপথের যাত্রী"তেও একই অনিবার্যতার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে বিয়াল্লিশের মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে "নয়নচারা"র কতিপয় গল্প লেখার পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর প্রথম উপন্যাস "লালসালু" রচনা করেন। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র মজিদ যেভাবে অন্ধ আর অস্তিত্বের চিন্তায় আচ্ছন্ন আলোড়িত তাতে সন্দেহ থাকে না ওই মন্বন্তরের পরিশ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়াই এই উপন্যাসে রূপায়িত। শওকত ওসমানের প্রথম উপন্যাস "জনী"তেও বিভাগ-পূর্ব গ্রামীণ জীবনের ক্ষয়িষ্ণু নিম্নমধ্যবিত্ত (মুসলিম) পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালে রচিত আবুল মনসুর আহমদের "জীবনক্ষুধা" উপন্যাসে লেখক যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন তাতে বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বিত্ত অর্জনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে নানা গোঁজামিল আর অবিশ্বাস্য ঘটনার বর্ণনা থাকলেও তার মধ্য দিয়েই সমগ্র জনগণের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ এবং তার সঙ্গে ওই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত লাভ করা যায়। ১৯৫৫ সালে এ উপন্যাস রচিত হলেও তার কাহিনী শুরু হয়েছে পাকিস্তানের জন্মের কিছু আগে থেকে। এর নায়ক হালিম দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। স্বভাবতই তাকে অত্যন্ত কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়। পরে সে শিক্ষিত হয়ে পরমা সুন্দরী জমিদারকন্যার হৃদয় হরণ করে, নিজেও ধনী হয়। বড়োলোকের সঙ্গে আপোস করে ধনী হওয়া তার পছন্দ না হলেও ধনী সে কেমন করে হয়েছে তা বোঝা যায় দরিদ্র আর ধনী—তার দুই পর্বের জীবনে দৃষ্টিভঙ্গিত যে পরিবর্তন হয়েছে তা থেকে। দরিদ্র থাকার সময় সে ভাবত 'সাম্যই বিধি', এখন বিধি হয়েছে 'প্রতিযোগিতা', হালিমদের কাছে লুঙ্গনের ভদ্র নাম। এই অবাধ 'প্রতিযোগিতা'র সুযোগ লাভের জন্যেই হালিম অসাম্প্রদায়িক এবং কৃষক-কল্যাণের রাজনীতি ছেড়ে 'জাতীয় সংগ্রাম' অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়। হালিম চরিত্রের স্রষ্টা আবুল মনসুর আহমদ নিজেও তাই করেছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টি থেকে তিনি যোগ দিয়েছিলেন মুসলিম লীগে, এবং তারই ফলে 'রেনেসাঁ সোসাইটি'তে। তবে গোপন কথাটি তিনি নিজেই ফাঁস করে দিয়েছেন। 'শামসুরাজের বেশীর ভাগ লোক হিন্দু হওয়ায়' এবং তার ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তদের এ থেকে কোনো সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায়[২] 'ভদ্রলোক হিন্দু ও ভদ্রলোক মুসলমানের সঙ্কীর্ণ শাসনিক স্বার্থের টক্কর' থেকেই 'পাকিস্তানের কথা উঠেছে।'[৩] "জীবনক্ষুধা"র দু বছর পরে প্রকাশিত আবুল ফজলের "রাঙা প্রভাত" উপন্যাসেও মধ্যবিত্তের সুবিধা-লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষোভ ধ্বনিত হয় যখন ইকবাল স্যার এই উপন্যাসের নায়ক কামালের খদ্দর পরার ও এটিকে স্বদেশী পোশাক হিসেবে উল্লেখ করার প্রতিক্রিয়ায় জানায়, হিন্দুরা শুধু ছোটো-বড়ো-মাঝারি চাকরিই দখল করে রাখে নি, খদ্দরের মুনাফাটাও লুটে নিচ্ছে। আবুল মনসুর আহমদ "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর"-এ স্বীকার করেছেন তাঁদের প্রজা-আন্দোলন আসলে ছিল মধ্যবিত্তদেরই আন্দোলন, সেটি বৃহৎ জনগণের স্বার্থরক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৩৭ এ কৃষক-প্রজা পার্টির মুসলিম লীগে যোগ দেয়ার ফলেই ওই প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে শেকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছিল। আসলে বৃহৎ জনগোষ্ঠী ওই মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের ওপরই আস্থা স্থাপন করেছিল। প্রজাদের বৃহদংশই মুসলমান হওয়ায়, আর জমিদারদের প্রায় সবাই হিন্দু থাকায় মুসলিম লীগের মুসলিম-উত্থানের রাজনীতিকে তাঁরা নিজেদের মুক্তির পথ হিসেবেই দেখেছিল। অবশ্য প্রজাদের দৃষ্টিভঙ্গির এবং আচরণ দ্বার্থহীন ছিল বলে তাঁরা হিন্দু-মুসলিম বিবেচনার চেয়ে বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের দাবির প্রতিই অধিকতর আস্থা আর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। উচ্চতি মুসলিম মধ্যবিত্ত এই সুযোগ-টিকে ব্যবহার করে সমগ্র জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের অবস্থান দৃঢ়তর করার ও বিত্ত প্রতিষ্ঠার কাজে লাগিয়েছে। সেজন্যে দেখব, রেনেসাঁ সোসাইটিতে ১৯৪২-এ প্রদত্ত ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ লেনিন আর স্তালিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 'পাকিস্তানের বামপন্থী বিপ্লবী' সম্ভাবনার কথা বললেও হালিম মনে করে কোনো শ্রমিক আন্দোলন বা শ্রেণীসংগ্রামের নামেও জাতীয় সংগ্রাম অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এ 'প্রতীতি' সে তার শ্রেণীস্বার্থ থেকেই অর্জন করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি-মনস্থিতায় তাঁর প্রবন্ধে মূল সত্যকে প্রকাশ করলেও উপন্যাসের বাস্তব পটভূমিতে যেমন তাকে অস্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবুল মনসুর আহমদও এখানে তাই করেছেন।

অবশ্য পাকিস্তানের প্রতি মোহ কাটতে মুসলিম মধ্যবিত্তের বেশ সময় লেগেছিল। আবু রুশদের "নোঙর", সরদার জয়েনউদ্দীনের "অনেক সূর্যের আশা" আর শহীদুল্লাহ কায়সারের "সংশপ্তক"-এর উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। "নোঙর"-এর কামালরা তিন পুরুষ ধরে কলকাতায় বসবাস করলেও সে পাকিস্তানের জন্মের মধ্যে 'মহৎ অস্তিত্বের সম্ভাবনা' প্রত্যাশা করে, যদিও বাস্তব জীবনে তার সাক্ষাৎ পায় না। সে আশা করে নিপীড়িত জনগণ একদিন 'মহাক্রোধে জেগে উঠবে', শাসকগোষ্ঠী 'খড়ের কুটার মত মিলিয়ে যাবে।' "অনেক সূর্যের আশা"র হায়াৎ খাঁ শ্রমিক ইউনিয়ন ও রক্তাক্ত পথ মাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছে এই আশায় যে, ওই দেশটি যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ ও দারিদ্র্য থেকে হবে মুক্ত। অবশেষে তথাকথিত স্বাধীন দেশে পুলিশের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়। "সংশপ্তক"-এও জাদেদ কার্যকর বিকল্পের অভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু তার আর সেকান্দারের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের উদ্যম কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতি অর্জন করে না, বরং তাবাই ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনটি উপন্যাসেরই কাহিনী শুরু হয়েছে পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকে—"অনেক সূর্যে"র ঘটনাকালের শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকে, "সংশপ্তক" শুরু হয়েছে ১৯৩৮ থেকে। কিন্তু সকল ঔপন্যাসিকই ভাষা-আন্দোলনের পূর্বেই ১৯৫১ এনে কাহিনীকে সমাপ্ত করেছেন। অথচ এঁরা সকলেই উপন্যাস লিখেছেন ভাষা-আন্দোলনের দীর্ঘদিন পরে। এর কারণ, ৫২-র ভাষা-আন্দোলন আর ৫৪-র ঐতিহাসিক নির্বাচনের পর ঘটনাক্রমকে যদি তাবও পরে অগ্রসর করতে হত তাহলে ঔপন্যাসিক সততার জন্যে লেখককে যে পরিণতির চিত্র অঙ্কন করতে হত তা চিত্রণ করতে তাঁরা তখনি বা তখনও হয়তো রাজি ছিলেন না কিংবা এর সত্যিকার পরিণতির জন্যে ওই ঔপন্যাসিকরা অপেক্ষা করছিলেন। অথবা এটাও হতে পারে যে, এই ভূখণ্ডে পাকিস্তানের পরিণতি সম্পর্কে ঔপন্যাসিকরা তখনও নিঃসংশয় হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা দ্বিধান্বিত থাকলেও পাকিস্তানিরা কিন্তু শত্রু শনাক্তকরণে ও তাঁদের হত্যাকাণ্ডে এতটুকু ইতস্তত করে নি। তাই তাঁর উপন্যাসের পরিণতিটি লেখার জন্যে তাঁরা শহীদুল্লাহ কায়সারকে আর বেঁচে থাকতে দেয় নি। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশেই সরদার জয়েনউদ্দীন "অনেক সূর্যের আশা"র উপসংহার হিসেবে "বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ" লিখতে সমর্থ হন। বিষয়টি আরেকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। যিনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেশ কটি উপন্যাস লিখেছেন সেই সৈয়দ শামসুল হক সত্তরে বাংলাদেশের জন্ম-সম্ভাবনা যখন প্রায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তখন লিখেছেন "খেলারাম খেলে যা"র মতো উপন্যাস, যে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রৌঢ় বাবর সমস্ত কিছুকে রতিসুখের মানদণ্ডে বিচার করতে চায়।

কিন্তু এই উপন্যাসেই সৈয়দ শামসুল হক নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যাঁদের নিয়ে ঈষৎ ঠাট্টা করেছেন তাঁরাই এদেশের জনচিত্তের আসল আকাঙ্ক্ষাটির কথা উল্লেখ করেন : 'আরেকজন উঠে দাঁড়াল। হাত নেড়ে বলল সে, হক সাহেবকে বলবেন তিনি যেন ব্যক্তির কথা না লিখে সমাজের কথা লেখেন। আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমরা সংগ্রাম করছি, সে নিয়ে তাঁকে উপন্যাস লিখতে বলবেন। ...আরো একজন উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "তাঁকে বলবেন গোর্কির 'মা'র মত উপন্যাস কেন হচ্ছে না?' মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘকাল পরে ১৯৮৩তে শামসুর রাহমান প্রথম যে উপন্যাসটি লেখেন সেই "অক্টোপাস"-এ-ও ঔপন্যাসিক ইশতিয়াক হোসেনকে একজন পাঠক বলেন, 'তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যেক লেখকের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাকে ভাবতে হবে জনগণের কথা। বিশ্বাস করতে হবে যে তার কাজ এবং একজন কৃষকের কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।' তাতে শিল্পবোধের ক্ষতি হতে পারে, লেখকের এরকম আশঙ্কার উত্তরে ঐ পাঠক বলে, 'অবশ্যই সাহিত্যকে শিল্প-সম্মত হতে হবে।...ল্যাটিন আমেরিকার প্রতিভাবান ঔপন্যাসিকরা কি শিল্পোত্তীর্ণ উপন্যাস লিখছেন না?' বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই সম্ভবত উনসত্তরে প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত জহির রায়হানের উপন্যাস "আরেক ফাল্গুনে" পুলিশের কাছে অন্তরীণ চরিত্ররা মিলে সমস্ত দেশের এক সাধারণ চরিত্র হয়ে ওঠে, যারা বলে : 'আসছে ফাল্গুনে আমরা... দ্বিগুণ হবো।'

কিন্তু প্রশ্ন এই, উপন্যাসে যেখানে ব্যক্তিচরিত্রের স্ফুরণ এবং বিকাশ ঘটার কথা সেখানে সমষ্টিগত চরিত্রের এই উন্মোচন কি উপন্যাস-আঙ্গিকেরই বিরুদ্ধে যায় না? অন্তত একজন প্রবীণ সমালোচক[4] এই বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখেছি, উপন্যাসে আমাদের কাল, পটভূমি বা সমষ্টিগত চরিত্রই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। হুমায়ুন কবিরের "নদী ও নারী"তে ব্যক্তি-চরিত্রের চেয়ে আকাল আর বন্যার বিরুদ্ধে লড়া সমষ্টি-মানুষই প্রধান হয়ে ওঠে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের "তিতাস একটি নদীর নামে"র কিশোর, তার স্ত্রী, তাদের সন্তান বা সুবলের প্রস্থানের পরেও তিতাস নদী আর বাসন্তী-চরিত্র নদীতীরবর্তী অনমনীয় সমষ্টিমানুষের প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকে। শওকত ওসমানের "জননী"র চরিত্রাবলীর আড়ালে মূল চরিত্র হয়ে দেখা দেয় সামাজিক পটভূমি আর তার কাল। আবু জাফর শামসুদ্দীনের "পদ্মা মেঘনা যমুনা"র মূল নায়ক তাতে ধৃত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল তিনটি দশক—বিশ থেকে সাতচল্লিশ—এই সময়সীমা।

বিষয়টির প্রতিনিধিত্বমূলক রূপায়ন ঘটেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাসে। "লালসালু"র মজিদ কোনো ব্যক্তি-প্রতিনিধি নয়, বরং সে সমষ্টি-চরিত্রেরই প্রকাশ হয়ে ওঠে যখন ঔপন্যাসিক মজিদ-সদৃশ চরিত্রদের প্রসঙ্গে বলেন, 'এরা তাই দেশত্যাগ করে...সদলবলে বেরিয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরীর একটিনি, ছাপা-খানার মেশিনম্যান, ট্যানারীর চামড়ার লোক, কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মুয়াজ্জিন।' আবার মজিদ যে মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে তারাও সমষ্টিমানুষ। এমনকি তাঁর পরবর্তী দুটি উপন্যাস "চাঁদের অমাবস্যা" ও "কাঁদো নদী, কাঁদো" সম্পর্কে যে অনেকেই মনে করেছেন এগুলো বাঙলাভাষায় রচিত 'ইউরোপীয়' উপন্যাস সেখানেও এই সমষ্টি-চরিত্রের দেখা মেলে। "কাঁদো নদী, কাঁদো" বিষয়ে আমরা বরং আমাদের অন্য একজন প্রধান ঔপন্যাসিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি : 'উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র খতিব মুনশী প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, তিনি তাঁর আজন্ম-অধ্যুষিত কুমুরডাঙ্গার অধিবাসী। এ যেন বাঙালী মুসলমান কর্তৃক আত্মজিজ্ঞাসার অগ্নি-পরীক্ষায় আবিষ্কৃত বাংলাদেশ।'[5] উপন্যাসের শিরোনামে যে আহ্বান ধ্বনিত তাও সমষ্টি-চরিত্রজ্ঞাপক।

তাহলে কি পাকিস্তানোত্তর মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে তেমন ব্যক্তিচরিত্র গড়ে ওঠে নি যাকে নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়? জবাবটি বাংলাদেশেরই একজন ঔপন্যাসিকের, উপন্যাসে নয়, তাঁর সরাসরি ব্যক্তিরচনায় খুঁজে দেখা যেতে পারে : 'একটা ছোট উদাহরণ দিলে জিনিসটা বুঝতে বেগ পেতে হবে না। ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪৭ হাজার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিলো প্রায় সাত হাজার। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সেই সাত হাজার বিনা বিপর্যয়েই চল্লিশ হাজারে উন্নীত হলো। ঠিক সেই অনুপাতেই চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের জন্যে সুযোগ সুবিধা বেড়ে উঠলো এবং এই সুযোগের বিস্ফোরণে কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ

এতটা ফুলে ফেঁপে উঠলো যে তার উপযোগী মানসিকতা অর্জন করবার মত স্থিতি তারা পেলো না।'[6] অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আরেকজন কথাসাহিত্যিক ভিন্ন চিত্র উন্মোচন করেছেন, 'কথাসাহিত্যিকরা বলতে পারলেন না মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা—দুটো চারটে কষ্ট যন্ত্রণার কথা নয়, বিরাট শ্রেণীটি ডুবছে, ডুবতে বাধ্য, উদ্ধারের কোনো পথ নেই—এই সমস্ত বিষয়টিকে নিয়ে স্থায়ী কিছু লেখা হলো না। লেখা হলো না কিসের মূল্যে ঢাকা গড়ে উঠলো। লেখা হলো না কেউ আইন করে বাধ্য না করলেও কেন মানুষ জমি জমা বাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে শহরে আশাহীন, ভরসাহীন, মৃতকল্প জীবন কাটাতে বাধ্য হলো, লেখা হলো না ছোট্ট শহর ঢাকা যে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠলো, আর এখনো বাড়ছে দৈত্যের মতো, সেই প্রক্রিয়ায় কাদের বিতাড়িত করা হলো? কোথায় গেল সেই লক্ষ লক্ষ গৃহহীন মানুষ? কারা দখল করলো সেইসব এলাকা? কাদের স্বার্থ দেখলো একটির পর একটি সরকার এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত দেশ কাদের?'[7]

একদিকে অস্বাস্থ্যকর স্ফীতি এবং অন্যদিকে ক্রমাগত পিছিয়ে যাওয়া—এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ায় মধ্যবিত্তের অবস্থা হয়েছে "চাঁদের অমাবস্যা"র আরেফ আলীর মতো। সে প্রথমে সত্য বুঝতে পারে নি। যখন পেরেছে তখন নানা মিথ্যে যুক্তি দাঁড় করিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, যখন তাতেও ব্যর্থ হয়েছে এবং সত্য প্রকাশের সংকল্প করেছে তখন পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিপক্ষ হিসেবে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তির জন্ম আর বিকাশ সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, বরং তার অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অন্য একটি উপন্যাস সম্পর্কে শওকত ওসমান যে বলেছেন সেটি পড়লে বাংলাদেশের পটভূমি বুঝতে বিলম্ব হবে না[8] তা এই উপন্যাস সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জনগণের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছে সমগ্র জাতি এবং জনগোষ্ঠীর মুক্তি অর্জন, এবং তার কাঠামোয় ব্যক্তি আর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কিন্তু স্ব-শ্রেণীর সীমাবদ্ধতায় লেখকও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ফলে সৎ থাকলে তাঁর উপন্যাসের নায়ক হয় সমষ্টি-মানুষ, পটভূমি অথবা যে কালকে তিনি চিত্রণ করেছেন তা, আর ব্যক্তি নায়ক হলে তা হয়ে পড়ে খণ্ডিত অথবা আরোপিত। রশীদ করিমের উপন্যাসের ব্যক্তিনায়করা এর সাধারণ উদাহরণ। "উত্তম পুরুষ" ও "আমার যত গ্লানি" যথাক্রমে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমিতে রচিত হলেও উপন্যাস দুটির কেন্দ্রীয় চরিত্রদ্বয় ওই পরি-প্রেক্ষিতে লালিত হয়েও এক স্বতন্ত্র বৃত্তে বন্দী থাকে। মাহমুদুল হকের "জীবন আমার বোন"ও রচনার পারিপাট্যে এবং চিত্রকল্প রচনায় সার্থকতার পরিচয় দিলেও মুক্তিযুদ্ধের পটভূমির সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিক বৈপরীত্য এর সুকৃতিকে অনেকটাই নষ্ট করে দিয়েছে। রশীদ হায়দারের "খাঁচা"র চরিত্ররা তাদের মৌল সীমাবদ্ধতার জন্যে সমস্ত আবেগ আর আন্তরিকতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে না। যা পেরেছে আহমদ ছফার "ওঙ্কার"-এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের বোবা স্ত্রী। এর কারণ, তার আর সমাজের বিকাশ হয়ে উঠেছে পরস্পরের দ্যোতক এবং পরিপূরক। এই বিশ্বস্ততাহীন ব্যক্তিবিকাশ তাই না সমাজকে না উপন্যাসকে সাহায্য করেছে।

বিষয়টি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মধ্যবিত্তের সৎ ব্যক্তি-বিকাশের আসল বৈরিতা এবং তার ফলে সৃষ্ট জটিলতাকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন। আরেফ আলীর মতো মধ্যবিত্তও স্থিতাবস্থাকে মেনে নিতে এবং তার মধ্যে যতটা সম্ভব বিকশিত হতে চেয়েছিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তার অনুকূল ছিল না। আবার ওই অবস্থাটির বিরুদ্ধে লড়বার ক্ষমতা একা তার বা তার শ্রেণীর ছিল না। এই অবস্থাটির রূপায়ন ঘটেছে "চাঁদের অমাবস্যা" বা "কাঁদো নদী, কাঁদো"য়। শওকত ওসমানের "ক্রীতদাসের হাসি"তেও তার প্রকাশ লক্ষ করি। এখানে খলিফা যে ক্রীতদাসের হাসিকে পণ্য করতে ব্যর্থ হয় তা আব্বাসীয় খলিফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে সংঘটিত জংগি বিদ্রোহের পটভূমিতে দেখলে বুঝতে পারব, সেটি ছিল স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাসমষ্টির প্রতিবাদ। পাকিস্তানি শাসনামলে রচিত ওই উপন্যাসে তাই আড়াল সৃষ্টি করতে হয়েছিল। ভাষা-আন্দোলনের সময় রচিত তাঁর গল্প "মৌন নয়" পরবর্তী কালে যে "আর্তনাদ" উপন্যাসে পরিবর্তিত হয় তা থেকেও বিষয়টি বোঝা যায়। মধ্যবিত্তের ওই অবস্থাটি বোঝা যাবে সেলিনা হোসেনের "নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি" বা শওকত ওসমানের "সমাগম" থেকে। প্রথমোক্ত উপন্যাসে সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, রণেশ দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় উপন্যাসে বারনার্ড শ, হাজী মহসিন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি চরিত্রের স্ব-নামে আবির্ভাবের

মধ্য দিয়ে আসলে আমাদের অসহনীয় স্থিতাবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই সন্ধান করা হচ্ছিল। কিন্তু তার জন্যে সমগ্র জাতির, সমগ্র জনগোষ্ঠীর উত্থান এবং যোগদানের প্রয়োজন ছিল। ১৯৭১-এ তাই ঘটেছিল। একাত্তরে আল বদরের হাতে শহীদ আনোয়ার পাশার "রাইফেল রোটি আওরাত"-এর নায়ক সুদীপ্ত শাহীন সময়ের ওই দাহ পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে "পুরনো জীবনে"র মৃত্যুতে 'নতুন মানুষ, নতুন পরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাতে'র স্বপ্ন দেখেছিল। তাই ছিল ওই অবরুদ্ধ অবস্থা আর অবস্থান থেকে মুক্তির উপায়।

কিন্তু মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার জন্যে মুক্তিযুদ্ধের গুণগত পরিবর্তনকে অনুধাবন অথবা আত্মস্থ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, অথবা তা করতে গেলে নিজেদের সংকীর্ণ সমৃদ্ধি এবং ফুলে ফেঁপে ওঠা সম্ভব হত না বলে তাঁরা সচেতনভাবে সেই পথকে এড়িয়ে চলেছিলেন। মধ্যবিত্তের প্রধান অংশ ওই প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও বা পিছিয়ে পড়লেও তার মোহ এবং শ্রেণী-উত্তরণের দুর্দান্ত লোভ তাকে এপথেই প্ররোচিত এবং পরিচালিত করেছে। ফলে মুক্তিযুদ্ধোত্তর কথাসাহিত্যে এই চিত্রটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে প্রধানত মুক্তিযুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্তকে নিয়ে লেখা এই উপন্যাসসমূহে সমষ্টি এবং ধারাবাহিক ঘনবদ্ধতার পরিবর্তে আমরা মূলত এই শ্রেণীর নানা খণ্ডচিত্রকেই প্রত্যক্ষ করেছি। রাহাত খানের একটি উপন্যাসে যেরকম হয়, মধ্যবিত্ত বারবারই 'দ্বিতীয় ব্যক্তি'তে রূপান্তরিত এবং সেকারণে খণ্ডিত ও সীমাবদ্ধ হতে থাকে। পাকিস্তান আমলে রচিত নূরুল ইসলাম খানের "মেহের জুলেখা" উপন্যাস যেমন আটটি ছোটোগল্প নিয়ে গঠিত, এ সময় রচিত কথাসাহিত্যও চারিত্রে অনেকটা সেরকম, খণ্ডিত কাহিনীগুচ্ছের যোগফল, সমগ্রের ব্যাপ্তি আর গভীরতা তাতে অনুপস্থিত। এটি না হয়ে উপায় ছিল না ; কারণ, উপন্যাসের কুশীলবের বস্তুভিত্তি বড়োই নড়বড়ে। হাসনাত আবদুল হাইয়ের "আমার আততায়ী"তে রফিকের স্বীকারোক্তি : 'স্বাধীনতার পর ব্যবসায় জগৎটা হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তারপরই হৈ-হুল্লোড় করে কাজ শুরু হলো। এতদিন যে ব্যবসা বাণিজ্য অবাঙালীদের একচেটিয়া ছিল সেসব এসে গেল বাঙালীর আওতায়। টাকা উপার্জনের যে এত পথ খোলা আছে এই তথ্য এতদিন ব্যবসার জগতে থেকেও পুরোপুরি বুঝিনি। নতুন সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম আমি। সাহায্য করলেন সিরাজ ভাই, ইনডেন্টিং, অর্ডার সাপ্লাই, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট নানা শাখায় ছড়িয়ে দিলাম আমার ব্যবসাকে।...দেশে বিদেশে বিশেষ করে বিদেশে আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ফুলে-ফেঁপে উঠলো।' অতএব এ সমাজের 'প্রতিযোগিতা চলে কে কতবার লণ্ডন ব্যাঙ্কক কলকাতায় সওদা কিনতে যেতে পারে, কে কত নূতন গাড়ী কিনতে বা বনানী-গুলশানে বাড়ী বানাতে পারে, কে কত ব্লু ফিল্ম দেখতে ও যৌনক্রীড়ায় শরিক হতে পারে বা কমসে কম কতবার চাইনীজ রেস্তোরাঁ ও কফি হাউসে যাতায়াত করতে পারে। শাড়ী গয়না ও প্রসাধনী বস্তু নিয়েও কামড়াকামড়ি লেগেই থাকে।'[৯] আর এসবে মধ্যবিত্ত অনেক সময় নির্দ্বিধায় নিজের স্ত্রীকেও ব্যবহার করে। নাজমা জেসমিন চৌধুরীর "সামনে সময়"-এর স্বামী স্ত্রীকে বলছে, 'আলবৎ (পার্টিতে) যাবে, একশোবার যাবে, জানো আফতাবকে চটালে আমার চাকরির প্রমোশন আটকে যাবে। ওর অঢেল লেনদেনের দৌলতে আমার এত দহরমমহরম। তোমাকে যেতে হবে এবং সেজেগুজে।' অতএব অস্বাভাবিক নয় রাহাত খানের উপন্যাসে 'দম্পতি'র শিরোনাম হবে 'ছায়াদম্পতি', সেখানে প্রয়োজন আর বিলাসে যৌনক্রীড়া চলবে, 'শহরে'র শিক্ষক তার ছাত্রকে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরিতে নিয়োগ করবে বা রশীদ করিমের "একালের রূপকথা"র কাবুল নিজের স্ত্রী নাফিসাকে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে রাত্রিযাপনের অথবা ছ মাস পর-পর ওই নারীকে পরস্পরের বিবাহের প্রস্তাব করবে। সেকারণে দেখি, রাহাত খানের উপন্যাসের চরিত্ররা নিজেদের সৃষ্ট এক ধরনের কৃত্রিম ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একটি উদাহরণ : 'আরে, শীলারে আমি বিয়া করতাছি। উই আর ইন লাভ দোস্ত। তোমারে ত কইতে কোন অসুবিধা নাই। আমাদের মধ্যে চুমা খাওয়া হয়া গেছে। আংটি দিয়া দিমু দুই চারদিনের মধ্যে। শীলা খানই আমার ফাইন্যাল। অরে আমি মিসেস শীলা মঈনউদ্দীন না কইরা ছাড়তেছি না।' আবুল মনসুর আহমদের আরোপিত বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাভাবিক ভাষা-নিরীক্ষা অথবা আলাউদ্দীন আল আজাদ ("কর্ণফুলী"), শহীদুল্লাহ কায়সার ("সারেং বৌ") বা আবু ইসহাকের ("সূর্য দীঘল বাড়ী") পটভূমি ও চরিত্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা অথবা খুবই সাম্প্রতিক কালে ইমদাদুল হক মিলনের আদ্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় লেখা

উপন্যাস "কালাকাল"-এ কৃত ভাষা-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এই ভাষা-ব্যবহার চারিত্রে পৃথক। কারণ, এটি ওই শ্রেণীর নিজস্ব বিকাশেরই উপজাত এবং তা ঐ প্রেক্ষাপটেই বিচার্য।

এই যে বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত বিকাশ, সেটি একই সঙ্গে উদ্বাস্তু এবং অসম। যে সময়ে এই শ্রেণী আপাত ঔজ্জ্বল্যে নিজেকে মুগ্ধ আর বিভ্রান্ত করছে সে সময়ে দেশের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বলয়ে অবস্থান করছে। বশীর আল্‌হেলালের "কালো ইলিশ"-এ দেখা যায়, একটি বিহারী মেয়েকে পাঁচটি টাকা দিলে সে এই বিরাট বদান্যতার ঋণ শোধ করবার অন্য কোনো পথ না পেয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হৃষ্টচিত্তে ওই ব্যক্তির শয্যাসঙ্গী হবার জন্যে শুয়ে পড়ে। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝা যাবে এই ঘটনা থেকে যে তাঁর "ক্ষুধার দেশের রাজা" গল্পের ভিখিরিকে গৃহিণী সুগন্ধি হালুয়া সহ রুটি দিলে সে ওই দুঃসময়ে বাড়তি, বিলাসী হালুয়ার উপস্থিতিতে খুবই বিরক্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে কাঁদতে শুরু করে। এই অসম বিকাশের জন্যেই রাজিয়া খানের "হে মহাজীবন"-এর আনিস 'কন্টিনেন্টাল মাপকাঠিতে' শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক বলে বিবেচিত হলেও আসলে থেকে যায় গ্রাম্য, যে তার স্ত্রীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়ও প্রহার করে। তার পরিবারের ইংরেজি বোলচাল আর স্মার্ট পোশাক ওই গ্রাম্যতা ঢেকে রাখারই প্রয়াস, যে কারণে তার স্ত্রী আমিনাকে অবশেষে 'আত্মহত্যা' করতে হয়। ঔপন্যাসিক একে বলেছেন 'মহাজীবনে' প্রবেশ। কিন্তু আসলে তা অপচয়। ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে যদি আমরা আমিনার সঙ্গে আবু ইসহাকের "সূর্য দীঘল বাড়ী"র জয়গুণ বা শহীদুল্লাহ কায়সারের "সারেং বৌ"য়ে নবিতুনের প্রতিরোধী মনোভঙ্গির তুলনা করি। অবশ্য এটাও সত্য, আমিনার অবস্থানই তাকে আত্মহননের পথ ছাড়া ভিন্ন কোনো বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে নি। এবং এটি এই চরিত্রেরই অন্তর্দুর্বলতা।

মধ্যবিত্তের এই বিকাশজাত জটিলতার জন্যে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যও কখনো-কখনো স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। "কালঘর্ম"-এ সৈয়দ শামসুল হক দেখিয়েছেন, ইহকাল থেকে দৃষ্টি পরকালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার, বিপ্লবের নামে বিপ্লব প্রতিহত করার পেছনে রয়েছে এক 'গূঢ় রাজনৈতিক কারণ।' সেখানে যারা গা ভাসায় তারা মূলত পলায়ন করছে। কিন্তু "স্মৃতিমেধ"-এ ঔপন্যাসিক চতুর্দিকের বৈরী পরিস্থিতিতে জীনাতের রাজাকারকে বিয়ে করার মধ্যে খুঁজে পান 'ব্যক্তিগত যুদ্ধ।' লেখকের লজিক এখানে সম্পূর্ণ ভুল। জীনাতও পলায়নই করছে। সে যদি রাজাকারকেই বিয়ে করবে তাহলে কোন অধিকার আর যোগ্যতায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পঙ্গু এবং কুঁড়েঘরে শুয়ে থাকা নিশ্চেষ্ট মুক্তিযোদ্ধাকে অভিযুক্ত করবে ? আবার যে ষড়যন্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে পঙ্গু কিংবা নিশ্চেষ্ট করে রাখে তার বিরুদ্ধে কি কখনো ব্যক্তিগত যুদ্ধ হতে পারে ? আমরা আগেই দেখেছি, ঔপন্যাসিকের রচনার ইঙ্গিতটিকে বাস্তবে রূপদানের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল সমগ্র জনশক্তির উত্থানের। সেকারণে হাসনাত আবদুল হাইয়ের "তিমি" উপন্যাসের কুশীলবদের গ্রামীণ ক্ষমতাবলয়কে স্পর্শ করতে গিয়ে নিজেদেরই পিছিয়ে আনতে হয়েছে।

এখানে উপন্যাস লেখার মূল সমস্যাটিই বিবেচনা করে দেখা যায়। "রাইফেল রোটি আওরাতে"র সুদীপ্ত শাহীনের যা অভিজ্ঞতা তাতে তার বিশ্বাস 'নিছক ইতিহাসের মতো বলে গেলেও বিস্ময়কর উপন্যাসের কাহিনী হয়ে যাবে।... কিন্তু উপায় নেই। তিনি গল্প কিংবা উপন্যাস লিখতে পারেন না।' কিন্তু আবু রুশদ যিনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতার ওপর সার্থক ছোটোগল্প লিখেছেন এবং লেখালেখিতে এখনো সক্রিয়, তিনি কেন এই সময়ের পটভূমিতে উপন্যাস লিখলেন না ? কেন উপন্যাসে আমরা "ধানকন্যা" বা "জেগে আছি"র আলাউদ্দিন আল আজাদকে পেলাম না ? কেন হাসান আজিজুল হক, যিনি ঔপন্যাসিক হতে চেয়েছিলেন[১০] এবং ছোটোগল্প লেখার আগে উপন্যাস লিখেছিলেন,[১১] উপন্যাস লিখলেন না ? কিছুটা ঝুঁকি নিয়েও বলছি, আমার বিশ্বাস, এঁরা সমকালে সৃষ্ট ও একটু আগে উল্লেখিত দ্বন্দ্বের কোনো জবাব খুঁজে পান নি। এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়া যায়। সৈয়দ শামসুল হক পাকিস্তান আমলে 'সমকালে' "জেসমিন রোড" নামে যে উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন সেটিই মূলত মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে "সচিত্র সন্ধানী"তে "দুঃসহবাস" ও দৈনিক "সংবাদে"র সাহিত্য পাতায় "বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ" নামে লিখেছেন। শেষোক্তবার মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এটি বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু কোথাও তিনি উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন নি। এ থেকে আমাদের অনুমানই সত্য বলে মনে হয়।

কিন্তু এটা তো সত্য, আমাদের বাস্তবতা এবং অস্তিত্বের মূল আর তার বিকাশের সূত্রসমূহের মধ্যেই উপন্যাসের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করা সম্ভব। সৈয়দ শামসুল হকের "বালিকার চন্দ্রযানে"র ইয়াসমিন বা ইমদাদুল হক মিলনের "পরাধীনতা"র লালন যেমন স্বদেশী বাস্তবতার প্রোথিত হওয়ার অনিবার্যতা বুঝতে পারে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। সৈয়দ শামসুল হক "আয়না বিবির পালা"কে সমকালীন বাস্তবতার কাঠামোয় একে উপন্যাসে রূপায়িত করেন। আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রেরণায় ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হন। সতোন সেনের একাধিক উপন্যাস, রিজিয়া রহমানের 'বং থেকে বাংলা,' ফকির বিস্রোহের পটভূমিতে চৌধুরী শামসুর রহমানের "মস্তানগড়" বা খালেকদাদ চৌধুরীর "রক্তাক্ত অধ্যায়"র অথবা উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা আবু জাফর শামসুদ্দীনের "ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যানে"র কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তবে এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কাজটি করেছেন শওকত আলী। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কয়টি উপন্যাস লেখার পর তিনি অতীতের দর্পণে সমকালকে শনাক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর "প্রদোষে প্রাকৃতজনে"র দুটি পর্বই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। লক্ষ্মণ সেনের শাসনামলের অন্তিম পর্বে বৌদ্ধধর্মীদের সঙ্গে সনাতন ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের বিরোধের মুখে যখন প্রাকৃত মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে নিপতিত সেই সময়ে তাদের অস্তিত্বরক্ষা এবং বিকাশের ইঙ্গিতটিকে ঔপন্যাসিক যেভাবে চিত্রণ করেছেন তাতে বঙ্গভূখণ্ডের ও বর্তমান বাংলাদেশের মৌল প্রবণতা এবং চারিত্রলক্ষণই প্রকাশিত হয়েছে। এই উপন্যাসে একই সঙ্গে সমষ্টিজীবন ও ব্যক্তিমানুষকে বিকশিত হয়ে উঠতে দেখি। শ্যামাঙ্গ ও লীলাবতী তাদের পটভূমি থেকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়, আবার ওই পটভূমিই তাদের বিকশিত হতে সাহায্য করে।

উপন্যাসে ধৃত জীবনের এই পালাবদলে তরুণ ঔপন্যাসিকরাও তাঁদের অবদান রেখেছেন। অন্তত তিন-জনের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার—হুমায়ূন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন এবং মঞ্জু সরকার। হুমায়ূনের প্রথম উপন্যাস "নন্দিত নরকে"। 'মধ্যবিত্তের রূপকার' হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি সত্ত্বেও তার বিকাশের যে জটিল রেখাবয়ব আমরা লক্ষ করেছি হুমায়ূন তা থেকে দূরে অবস্থান করছেন। তিনি বরং সুখপাঠ্য, কিছুটা সরল আর স্বাদু কাহিনী এবং গল্পের প্রতিই বেশি বিশ্বস্ত থেকেছেন। এতে পাঠকের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের নিকট ও ব্যাপকতর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মিলনের দুটি উপন্যাসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ফরমু ও দর্শন বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এখনো গড়ে ওঠে নি। তা সত্ত্বেও তিনি এমন দু-একটি উপন্যাস লিখেছেন যাতে একদিকে তাঁর অঙ্গীকার এবং অন্যদিকে এই আঙ্গিকটির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাঁর "ভূমিপুত্রে"র উদাহরণ থেকে দেখব চরিত্ররা তাদের নিজস্ব পটভূমি থেকেই বিকশিত হয়েছে। ফলে ভূমিলগ্ন এই মানুষদের আচরণ এবং ভাষা-ব্যবহার আরোপিত না হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়েছে। সেইসঙ্গে লক্ষ করব, সমষ্টিজীবন থেকেই ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ ঘটেছে। মঞ্জু সরকার তাঁর উপন্যাস 'তমস'-এ যথার্থ বস্তুজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "অবিনাশী আয়োজন" গল্পগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই অবশ্য তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "তমস"-এ তিনি তাঁর শ্রেণীকেই ব্যবচ্ছেদ করেছেন। যে মধ্যম শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করত তার বর্তমান অবস্থান এরকম : 'নেতাদের মাঝে নানান বিতর্ক, কর্মীদের মাঝে হতাশা—বিপ্লবের নামে এতোদিন যা হলো সবই কি ভুল? ভাঙতে-ভাঙতে মধ্যমের দলের একটি অংশ সরকারের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। বাটুভাই মন্ত্রী হন। অনেক হতাশ বিপ্লবী সমাজে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। মধ্যমের চাকরি, বিয়ে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—বলতে গেলে সবকিছুই বাটু-ভাইয়ের দান।' অতএব যাদের ঘৃণা করে বলে মনে হয় সেই ক্ষমতাবলয়ের পক্ষে এসে মধ্যমের কৈফিয়তের মতো নিরীহ ব্যক্তির ওপর ছুরির দায় বর্তানো বা তার হত্যার কারণ হওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাস "নগ্ন আগন্তুক"-এ এসে সন্দেহ হয়, ঔপন্যাসিক কি ঘটনা বানিয়ে তুলছেন না এর সুযোগ গ্রহণ করছেন?

বাংলাদেশের উপন্যাসে ফরমের সমস্যা কনটেন্টেরই সমস্যা। ফরম্ বিষয়ে সবচেয়ে সচেতন সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহের উপন্যাসত্রয় পরীক্ষা করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এও দেখেছি, বিষয়কে প্রকাশের জন্যেই শওকত ওসমান "ক্রীতদাসের হাসি" ও "সমাগম"-এ দুই

ভিন্ন আঙ্গিকের সাহায্য নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য সমাজ-কাঠামো থেকে আমাদের সমাজ-কাঠামো যেমন পৃথক তেমনি উপন্যাস-আঙ্গিকে বক্তির যান্ত্রিক প্রকাশও আমাদের উপন্যাস-শিল্পের মৌল বিবেচ্য হতে পারে না। কারণ সমাজবিকাশের ধরনই তার ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ধরনকে জন্ম নিতে এবং গড়ে উঠতে সাহায্য করে। একারণে আমাদের উপন্যাসে সমষ্টিচেতনা আর ব্যক্তির বিকাশের নতুন সমীকরণ হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে নতুনতর দায়িত্বগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের পরিধি এবং সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্র

১. ৬. ৯ : মাহুন বা না মাহুন, আবু রুশদ; বই, সম্পাদক ফজলে রাব্বী, নভেম্বর, ১৯৮৩

২. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর

৩. ১৯৪২ সালের ১৫ই অক্টোবর 'রেনেসাঁ সোসাইটি'তে প্রদত্ত ভাষণ 'পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা'; বশীর আল্ হেলালের 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস'-এ উদ্ধৃত

৪. Zillur Rahaman Siddiqui / Literature of Bangladesh : 1947-1971, Fiction / Literature of Bangladesh and other Essays

৫. ৮ : দুই লোকের যাত্রী, সমুদ্র নদী সমর্পিত / শওকত ওসমান

৭. দুপাঠ্য কবরেখা : আমাদের কথাসাহিত্য / হাসান আজিজুল হক, গণসাহিত্য কার্যকরী সম্পাদক : মফিজুল হক; আষাঢ়, ১৩৮৬

১০. ছোটগল্প, সম্পাদক : কামাল-বিন মাহতাব; মার্চ-মে, ১৯৭৪

১১. রূপম, সম্পাদক : আনওয়ার আহমদ; সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

নাট্যপরিচালক কমলকুমার মজুমদার

নির্মাণের উৎসমুখে

'...মনিবপত্নী আশ্বস্থ হইলেন কেননা আভাসিত ইহা যে, সেই দিনকার সেই চিঠির টুকরার পাশে বসিয়া তাহার প্রেমাস্পদ স্বামী নিজ ভাবুকতার সূচনা করিয়াছিলেন, যথা...ধর... অবশ্য বলা যায় কোন এক অলিখিত অপেরার মহতী দৃশ্য...একদল স্টেজের অন্তে আসিল, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে খণ্ডিত পত্র সকল দেখাইল, তাহারা ক্রন্দিত নয়নে কুড়াইতে লাগিল, এইরূপ কুড়াইতে, হাত বহুবার চম্‌কিয়াছে এক এক খণ্ড চমকপ্রদ মনোভাব প্রকাশিয়াছে, কখন বা মসৃণ হাতকে ভ্রমবশত, যে উহা পত্র-খণ্ড, কতবারই-না একে অন্যের হাত কেহ ধরিয়া থাকে।' (পিঞ্জরে বসিয়া শুক, পৃ ৯৫)

"পিঞ্জরে বসিয়া শুক" উপন্যাসের এই অংশে, লেখক চরিত্রের ভাবুকতার অনুভবঘন রূপ-চিত্রণে মঞ্চরীতিকে ব্যবহার করেন ; নাট্যপরিচালকের সূক্ষ্ম নির্দেশের সংহতিতে গোটা দৃশ্যটি দাঁড়িয়ে থাকে মঞ্চে। বুঝতে অসুবিধা হয় না—এই লেখক মঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, মঞ্চের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা। মঞ্চে কোন্ ভঙ্গি, কোন্ ভাব কী ভাষায় কথা বলে উঠবে, পরিপূর্ণভাবেই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। স্বভাবতই পাঠকের কৌতূহল জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে এই লেখকের লেখ্য ক্রিয়ার সঙ্গে সত্যিই কোনো বাস্তবিক মঞ্চ-অভিজ্ঞতা আছে কি নেই।

বাঙলা ভাষায় যে-কজন লেখক লেখা ছাড়া অন্যান্য শিল্পকর্মে পারদর্শী, তাঁদের মধ্যে কমলকুমার একজন। চিত্রশিল্প, নাটক, সংগীত, সিনেমা, টাইপোগ্রাফি প্রভৃতি শিল্পকর্মে কমলকুমার ছিলেন রীতিমতো পারদর্শী। সাহিত্যিক কমলকুমার যতটা খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন তাঁর অন্যান্য গুণ ততটা পরিচিতি লাভ করে নি, বরং তাঁর সাহিত্যসিদ্ধিতে, ভাষারীতিতে পৌঁছোতে অন্যান্য আর্ট-ফর্মগুলির সক্রিয় ব্যবহার উল্লিখিত হয় তাদের স্বতন্ত্র আলোচনা ছাড়াই। অথচ তাঁর সাহিত্য বারবার আভাসিত করে অন্যান্য শিল্পচর্চার পারদর্শিতাকে। ফলে তিনি যে সত্যিই শিল্পী, অন্যান্য শিল্পকর্মের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এই সত্যটাকে আবিষ্কার করতে হয়। আবিষ্কার করতে হয়

নাটক

লেখার মতোই নাটক, মঞ্চ তাঁর শিল্পীজীবনের সবচেয়ে বেশি সময় অধিকার করে ছিল।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়[১] কমলকুমারের প্রকাশ্য মঞ্চে নাট্যপরিচালনার সময়কাল ১৯৫২ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙলা নাট্যমঞ্চে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটেছিল, তেমনি বিশ্বে নাট্যজগতেও এই সময়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে "নবান্ন" নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব, বহুরূপীর প্রতিষ্ঠা, নান্দীকারের সূচনা, অপর দিকে গ্রূপ থিয়েটারেরও পদযাত্রা আর ভাঙা মঞ্চে শিশির ভাদুড়ির অভিনয় ; বিশ্বনাট্যজগতে অ্যাবসার্ড ড্রামার প্রযোজনা—এমনি একটি মুহূর্তে কমলকুমার মজুমদারের নাট্যজগতে পরিচালক হিসাবে আবির্ভাব। নাট্যআন্দোলনের এত গুরুত্বপূর্ণ নিত্যচমকিত মুহূর্তে কমলকুমারের পরিচালিত নাটকগুলি সে সময়ের কলকাতার গুণিজনদের মুগ্ধ করেছে, প্রত্যাশা বাড়িয়েছে। সেই মুগ্ধতা নিছক উচ্ছ্বাস বা বন্ধুকৃত্য নয়।[২]

১৯৫২ থেকে প্রযোজিত নাটকের তালিকার দিকে তাকালে স্বভাবতই মনে হতে পারে তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা"[৩] এবং ইউজিন ওনীলের "এমপারার জোন্‌স্" নাটক ছাড়া কমলকুমার-প্রযোজিত সব নাটকগুলিই হালকা রসের, ফারস্-জাতীয় নির্মল হাস্যরসের একাঙ্ক নাটিকা। "এমপারার জোনস" আর "মুক্তধারা" ছাড়া অন্য নাটকগুলি কেবল ছোটোদের নিয়ে মঞ্চস্থ হয়েছিল। কোনো বড়ো মঞ্চে কোনোদিন অভিনয় করাতে পারেন নি, স্থায়ী মঞ্চ বলতে নিউ এমপায়ার পর্যন্ত ছিল তাঁর দৌড়। সাধারণ ছেলেদের নিয়ে সাধারণ মঞ্চে সাধারণ আলোয় অসাধারণ পরিচালনকৃতিত্বেই তাঁর প্রযোজিত-পরিচালিত নাটকগুলির স্বাতন্ত্র্য আর মৌলিকতা। নাচে, গানে, ফুটওয়ার্কে, শব্দের নিখুঁত ব্যবহারে, পোশাকের আশ্চর্য সুন্দর প্রয়োগের গুণে ওই নিত্যচমকিত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি আলাদা একটা ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হতে পেরেছিলেন, "হরবোলা" একটি সর্বজনপরিচিত দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। কমলকুমারের পরিচালনকৃতিত্বের কারণেই এখনকার অনেক নামী ব্যক্তি তাঁর কাছে অভিনয় শিখতে চেয়েছিলেন, অনেকে শিখেওছিলেন।[৪]

১৯৫২ সালের পূর্বে কমলকুমারের নাট্যচর্চা ছিল পরিবারকেন্দ্রিক। সম্ভবত ১৯৩২ থেকে (কমলকুমারের বয়স যখন ১৭) কমলকুমার নাটক-থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পারিবারিক উৎসাহের ফলে অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো নাটক বিষয়েও তিনি উৎসাহিত হন। রীতিমতো তৈরি হয়ে পড়াশুনো করে নাট্যাভিনয় এবং পরিচালনা করেছিলেন বলেই আজীবন—মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব পর্যন্ত, ছাড়াছাড়াভাবে নাটক পরিচালনা করে গেছেন। পরিবারিক উৎসাহে, বিশেষ করে কমলকুমারের মা রেণুকাময়ীর উৎসাহে, কমলকুমারের পরিবারটি হয়ে উঠেছিল শিল্পপরিবার। তিনি যেন ছেলেদের শিল্পী হিসেবেই দেখতে চেয়েছিলেন। ছেলেরা রাত জেগে নাটকের সেট তৈরি করছে, রিহারসাল দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে তিনিও রাত জেগে চা তৈরি করে দিচ্ছেন, নাটকের পোশাক সেলাই করছেন। শুধু এতেই নয়, ছেলেদের মানসিক গঠনে, অভিজ্ঞতা অর্জনে এমন সব ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, যা বর্তমানে অলৌকিকই শুধু নয়, হাস্যকরও ঠেকবে। মায়ের এই উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কমলকুমারের বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় রিথিয়ায়, পয়লা বৈশাখ এলগিন রোডে মা বাবা ভাই বোন কাকা সবাই মিলে পারিবারিক নাটক করতেন। বোন রাণীর নাচ (ইনি হরেন ঘোষের সেরাইকেল্লার ছৌনাচের দলের সঙ্গে বিদেশ ঘুরে আসেন ১৯৪০ সালে), কমলনীরদের অভিনয়, গীতার গান—সব মিলিয়ে জমজমাট নাটক, অভিনয়শেষে ১৬০ বকুলবাগানে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে সরগরম আলোচনা। ১৯৩৯ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর আশ্রয়ে এবং উৎসাহে এইরকম পারিবারিক নাট্যাভিনয় চলেছিল। এই পারিবারিক নাটকের অভিজ্ঞতা সাধারণ দর্শকের সামনে এল ১৯৫২ সালে সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে) -কে কেন্দ্র করে "হরবোলা"র মাধ্যমে।

সিগনেট প্রেসের ডি. কে. গুপ্তর উদ্যোগে গড়ে ওঠা "হরবোলা" দলই কমলকুমারের বাইরে প্রথম নাটকের দল। 'সঙ্গীতের ভার নিয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অর্থাৎ বটুদা, এবং কৈয়াজ খাঁর শিষ্য সন্তোষ রায়। শিল্পনির্দেশক সত্যজিৎ রায়। আর কমলকুমার পরিচালক।' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "কৃত্তিবাস" সম্পাদকীয়, পৌষ ১৩৮৩) 'পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ (ভূমিকা, "গোলাপসুন্দরী", পৃ ১০) এই দলের প্রথম পালা "লক্ষ্মণের শক্তিশেল"—এলগিন রোডের সিগনেট প্রেসের বাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে নিজস্ব মঞ্চে পরপর চার শনিবার অভিনীত হয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—'দুর্দান্ত সফল যে হয়েছিল, এতে যাঁরা সন্দেহ করবেন, তাঁরা সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাসংগ্রহ খুঁজে দেখুন, প্রমাণ পেয়ে যাবেন। সেই সময় দৈনিকপত্রে আলী সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঐ নাটক অভিনয় বিষয়ে এক কলম লিখেছিলেন। এই নাটক দেখতে এসেছিলেন অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেব থেকে বহু লেখক ও শিল্পী।' 'হরবোলা'র দ্বিতীয় নাটক রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা"। এই নাটকটিও পরপর চার শনি-রবিবার ধরে অভিনীত হয়েছিল একই মঞ্চে। তার পর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লম্বকর্ণ" পালার রিহারসাল চললেও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয় নি "হরবোলা" ভেঙে যাওয়ায়।

"লক্ষ্মণের শক্তিশেল" আবার অভিনীত হয় ১৯৬৭ সালে নিউ এমপায়ারে। "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকটির সঙ্গে "রামায়ণগাথা"ও অভিনীত হয় একই মঞ্চে একই সময়ে। ১৯৫২র "হরবোলা" ততদিনে নাম নিয়েছে "চিলড্রেনস অপেরা গ্রূপ"। ১৯৫৮ সালে সাউথ পয়েনট স্কুলে এবং তারপর 'ক্যালকাটা চিলড্রেনস অপেরা'[৫] নামে বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনেও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" অভিনীত হয় ১৯৭৭ সালে। কমলকুমার জানিয়েছেন, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল পালাটি আমাদের বড় আদরের, বড় প্রাণের।' পৌরাণিক পোশাকের আড়ালে আধুনিকতম ব্যঙ্গ কখনো মাইমে, কখনো গানে, ফুটওয়ার্কের তালে-তালে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, গোটা পালাটি জমজমাট হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। সুকুমার রায়ের দেওয়া সুরেই আগাগোড়া অভিনীত হলেও কমলকুমারের ইচ্ছা ছিল 'ইহাকে সমস্ত রূপে সঙ্গীতমুখর কমিক অপেরা করা অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংলাপই সুরগত হইবে।' সমগ্র পালাটিকে 'সঙ্গীতমুখর' করার কাজ মোটামুটি করা থাকলেও করতে পারেন নি অর্থাভাবে। যেমন বড়ো মঞ্চ কোনোদিন পান নি অর্থাভাবে, তেমনি অনুভব করেছেন 'ইদানীং বাদ্যকর পাওয়া অতীব মুস্কিল।' পালার প্রাক্‌ভাষণে স্পষ্টভাবেই তাই সন্দেহ করেছেন, 'জানিনা এইবার (১৯৬৭) দর্শকগণের কেমন লাগিবে' কেননা ১৯৫৮ সালের সাউথ পয়েনট স্কুলের অভিনয়ে 'গীত আমার মনোমত হয়

নাই' বলে তিনি স্পষ্টই ১. ১০. ৬৭-তে পালার প্রাক্‌ভাষণে জানিয়েছেন।

ক্রম অনুযায়ী চিলড্রেনস গ্রুপের পরবর্তী নাটক "এমপারার জোনস"। ৯ অকটোবর ১৯৬৪, ১৪ জুলাই ১৯৬৮ এবং ২রা অকটোবর ১৯৭০ মুক্তাঙ্গনে, নিউ এমপায়ারে এবং কলামন্দিরে অভিনীত হয়। বাঙলা ভাষায় সম্পূর্ণ নোতুন আঙ্গিকে আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ওনীলের এই নাটকটি পরিচালনার কৃতিত্বেই কমলকুমার খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। মাইম, অভিনয়, উপস্থাপনা, চিত্রনির্মাণ—সব মিলিয়ে মঞ্চে তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন। পালার প্রাক্‌ভাষণে কমলকুমার জানিয়েছেন, '১৯৬৮ সালে স্বরাষ্ট্রের একজন উচ্চপদস্থ কহিলেন ভান গুড প্লে তুমি নিশ্চয় পাইবে পুলিশের একজন বিরাট কর্ত্তা শিবশঙ্কর মিত্র ইনি অসম্ভব পড়াশুনা করা লোক ইংরাজী সাহিত্য তো বটেই এমন কি ভারতীয় সাহিত্য—আই. সি. এসদের যেমন অশোক মিত্র,...' অর্থাৎ এই পালাটি করার পিছনে তাঁদের প্রত্যাশা যেমন ছিল, তেমনি ছিল ভালোবাসাও।

"এমপারার জোনস" পালার শুরুটি যেমন চমকপ্রদ তেমনি শেষের মৃত্যু-দৃশ্যটিও আশ্চর্য শিল্পগুণান্বিত। কৃষ্ণের-স্তব-উচ্চারিত অন্ধকারে জোনস একটি লাল বল নিয়ে খেলা করতে-করতে মঞ্চে আসে—গোটা দৃশ্যটি মাইমে, অথচ জোনসের অঙ্গভঙ্গিতে তার লাল বড়ো মাপের পোশাক আর কালো মঞ্চে গোটা ব্যাপারটি আশ্চর্য মনোরম হয়ে ওঠে। তার মৃত্যুটিও ঘটে অদ্ভুতভাবে, সে হাঁটু মুড়ে বসে, রিভলবার-সমেত হাত সাপের মতো ক্রমাগত দুলতে-দুলতে স্থির হয়ে যায়, সব আলো এসে জড়ো হয় তার ওপর, গোটা দৃশ্যটি অসাধারণভাবে গাঢ় প্রতীক হয়ে ওঠে। খুবই বিচিত্রভাবে সময়, হৃৎস্পন্দনের ক্রমে থামা, কাহিল সম্রাটত্ব—সব একাকার। দৃশ্যটির রিয়ালিটিতে অবিশ্বাস প্রশ্রয় পেলেও টাইম ফ্যাকটরকে ম্যাগনিফাই করে যা-কিছু অসহায়তা আর নশ্বরতা ঘোর বাস্তব হয়ে ওঠে। এমন নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবের মৃত্যুদৃশ্য খুব কম নাটকেই চোখে পড়ে। 'জোনস আত্ম-প্রত্যয়ী ছিলেন না, তিনি নিজেরই প্রণয়ী কেননা তাতে অনুতাপ ছিল, তিনি ধর্মে বিশ্বাসী।' (পালার প্রাক্‌ভাষণ ২. ১০. ৭০) এই-সমস্ত গুণ-গুলিই মৃত্যুদৃশ্যে জড়ো হয়ে যায়, আদল পেয়ে যায়, কেননা রিভলবার, যে রিভলবার জোনসের 'আত্মপ্রেমের দীর্ঘতম আশ্রয়'। এই নাটকের যা-কিছু সৌন্দর্য—অর্থাৎ জোনস চরিত্রের সংস্কার আর নীতিবোধ, জোনসের সংলাপ 'বড় বড় গাছ, ওরা আমার বন্ধু' প্রভৃতিতে খুবই রহস্যময় আর পোয়েটিক যথার্থতা পেয়ে যায় নাটক-টির উপস্থাপনায়, অভিনেতার স্বরযন্ত্রের অমোঘ কৌশলে। নাটকটির কাহিনীও এক অদ্ভুত অন্ধকার, মানুষের সচেতন তথা অচেতন কর্ম আর তজ্জনা দুঃস্বপ্ন আর ভীতি-আতঙ্কের কাহিনী। শেষ-দৃশ্যে যখন জোনস নিজেই ভিক্‌টিম, তার অনায়াস সূক্ষ্মতাকে ধর্মভাব যেন প্রহার করে—'আমি যেন বাইবেলের কোন অলৌকিক ঘটনা'। এর মধ্যেই সমস্ত একাকার হয়ে যায়।

'রামায়ণগাথা' ১৯৬৭র ১লা অকটোবর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এমপায়ারে অভিনীত হয়। অভিনীত না বলে বলা দরকার গাওয়া হয়। গঙ্গার ঘাটে কথকতার আদলে এই পালাটির উপস্থাপনা। পালার প্রাক্‌ভাষণে কমলকুমার বলেছেন, 'এটি একটি সঙ্কলন। ভগবান বাল্মীকি ব্যতীত, ইহাতে এক বিরাট মহাপুরুষের, অবতার রামকৃষ্ণের কথা ও বিবিধ প্রতিভাবান কবি ও লেখক, যাহারা বঙ্গভাষাকে বিশুদ্ধ রূপ দিয়াছেন, তাহাদের কীর্তি হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে যথা জয়দেব, কবিকঙ্কণ, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস, মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশিভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন, দীনেশ সেন, লক্ষ্মীর পাচালী।' আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সঙ্কলয়িতার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ অনুভব। 'আমার বড় সাধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল কাশীর ঘাটে রামায়ণ পাঠ করিব। কেমন গ্যাসের বাতি কিনিব তাহাও দেখিয়াছিলাম, রামায়ণ পাঠ শিখিয়াছি। গীতে সুর দিয়াছিলাম। বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে কি শালার জীবন হইল।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০. ১১. ৭৬) এই পালাটির সংকলন সম্পর্কে বলেন, 'এই রামায়ণগাথা বহু পূর্ব্বেই সংকলিত হয়। গীতের সুর সকল আমি সংগঠন ও সংযোজনা করি। কিন্তু ইহা লোকসমক্ষে প্রকাশের সুযোগ হয় নাই।' (পালার প্রাক্‌ভাষণ) অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত চিন্তাধারার সু-নিবিড় এবং সুচিন্তিত সেতুবন্ধনে সংকলয়িতার যেমন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি মমতা আর টান লক্ষ করি, তেমনি অনুভবের স্নিগ্ধতা আর গভীরতার ব্যাপ্তিতে গোটা অনুষ্ঠান-টিতে রামায়ণের যুগের অজস্র আলোর বন্যাধারা সঞ্চারিত হয়েছিল বর্তমান যুগের কর্মক্লান্ত, স্বপ্নাহত মানুষের কাছে। তিনি জানিয়েছেন, 'একদা বহুদিন পূর্ব্বে তখন আমি বড় অল্প বয়সী, দেরাদূন হইয়া পদব্রজে প্রণম্য হিমালয়ে উঠি, কেননা পথে বহুতর লতা গুল্মাদি চয়ন করিতে পারিব ইহাই অভিলাস ছিল; যখন আমি ঋরিপাণি ছাড়াইয়াছি তখন কুয়াশা নহে পথ মেঘাচ্ছন্ন। এই মেঘের মধ্য হইতে অপূর্ব্ব বেদগান আসিতেছিল এবং পথ মেঘ রহিতা হইবামাত্র, সূর্য কিরণ তির্য্যক ভাবে অকস্মাৎ প্রাদুর্ভাব হইল, এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখিলাম এক-খণ্ড তেজঃ সম্পন্ন আলোক আসিতেছে।' —এই অনুভবটি গোটা "রামায়ণ-গাথা"য়। একক এক কিশোর শিল্পী (রঞ্জন সরকার) শ্রোতাদের সামনে কথকতার ভঙ্গিতে আন্তর নিষ্ঠায় গোটা অনুষ্ঠানটিকে সজীব করে রেখেছিলেন। বিরতিমূলক নীরসতার প্রতি মুহূর্তে সুযোগ থাকলেও সুরের রেশ আর সঙ্গীতের আবেশ শ্রোতাদের উপর বর্ষণ করেছিল রামায়ণের যুগের 'তেজঃ সম্পন্ন একখণ্ড আলোক'।

১৯৭৬-৭৭—এই দু বছরে কমল-কুমার তিনটি নাটক করেন বিভিন্ন সময়ে। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী এবং নিজের নাট্যরূপ দেওয়া "কঙ্কালের টংকার", নিজের লেখা "দানসা ফকির", এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "ভীমবধ"। "দানসা ফকির" ও "কঙ্কালের টংকার" পালা দুটিতে কমলকুমারের ফারসিক্যাল নাটকের কৃতিত্ব একই সঙ্গে নাট্যকার আর পরিচালক হিসাবে ফুটে উঠেছে। মলিয়েরের বহু ফারস্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে বাঙলায় রচিত হয়েছিল, অমৃতলালের পর সেই হারিয়ে-যাওয়া সূত্রটি কমলকুমারের হাতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা পায় এই দুটি নাটকের মাধ্যমে। ২৮. ১১. ৭৬ এবং ২৯. ৯. ৭৬ বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে, ১৯. ১. ৭৭-এ বঙ্গ-সংস্কৃতিসম্মেলনে "দানসা ফকির" এবং "কঙ্কালের টংকার" ২৯. ৯. ৭৬-এ বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে ও ১৯. ১. ৭৭-এ বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলনে অভিনীত হয়। নির্মল হাস্যরস আর পাশাপাশি হাসি-খুশির মধ্য দিয়ে সমকালীন বাস্তবতার গুণে এই নাটক দুটির প্রযোজনা খুবই যুগোপযোগী এবং দৃষ্টিনন্দন হয়েছিল। এ দুটির মঞ্চায়নের মৌলিকতায় কমল-কুমার সে সময়ের অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—আবার এই নাটক দুটিকে কেন্দ্র করেই কলকাতা ময়দানে ১৯. ১. ৭৭ তারিখের সন্ধেতে ঘটেছিল "unpleasant scenes of crowd behaviour"।[৬]

"দানসা ফকির" নাটকটির মূল পরিকল্পনা গিরিশ ঘোষের "সিরাজ-উদ্‌দোল্লা" নাটকের দুটি দৃশ্য থেকে। "কঙ্কালের টঙ্কার" এবং "দানসা ফকির" পালার প্রাক্‌ভাষণে কমলকুমার বলেছেন, 'আমাদের পালা দুটিই আষাঢ়ে পালা, চরিত্র ফুটানো নাই, সাম্য তোষামোদ রস তথা বৈষম্য ঘটিত রস নাই। লোক শিক্ষার কিছু নাই। আছে ছেলেমানুষী হরষ অর্থাৎ ব্যাইসটারয়স প্লে।' মঞ্চ সজ্জাহীন, আলোর বৈচিত্র্যহীন, গীতহীন এই নাটক দুটির মধ্যে আছে কড়া ধাঁচের ব্যঙ্গ আর গতি, আর সংলাপের ক্ষুর ধার। সাধু থেকে উপভাষা আর মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রবাদ-প্রবচনের বিপরীত আর বিকৃত অর্থবোধক সংলাপ। রূপায়ণে এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে পোশাকের বিশাল ভূমিকাও দেখা গেছে এই নাটক দুটিতেই।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "ভীমবধ" ২৮. ১১. ৭৬-এ বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনে এবং ১৯. ১. ৭৭-এ বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলনে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকটির নিছক হালকা ঘটনাকে কমলকুমার পৌরাণিক পোশাকের আড়ালে আধুনিকতম ব্যঙ্গের প্রয়োগে সার্থক করে তোলেন। চরিত্রগুলির চড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা এবং পরমুহূর্তেই ক্ষণকালের জন্য মাইম আসা, আবার সংলাপ, সব মিলিয়ে আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠে—নাটকটির মূল্য অনেকগুণ বেড়ে যায়।

ভাবপ্রকাশ বিষয়ে (শান্ধ, মে-জুন ১৯৫৭) প্রবন্ধে, "এমপারার জোনস" এবং "দানশা ফকির" ও "কঙ্কালের টংকার" পালার প্রাক্‌ভাষণে নানা প্রসঙ্গে কমলকুমার জানিয়েছেন উপরের উল্লিখিত নাটকগুলি ছাড়াও "লক্ষ্মীর পরীক্ষা", "হ-য-ব-র-ল" পালা দুটি অভিনয় করেন। এ ছাড়া অভিনয় হয় নি অথচ প্রস্তুত ছিল এমন পালার সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়,—"রিজিয়া", "ঠোক্কর", "হবুচন্দ্রের অশান্তি, "ঘোড়া-চোর", "প্রহ্লাদচরিত", "কবিকঙ্কণ চণ্ডী", "যমালয়ে ভীমরুল", "ডন কুইকজটের আক্কেল" প্রভৃতি। অভিনয় না হওয়ার কারণ 'আমাদের অর্থ নাই' এবং সম্ভবত 'আমরা অল্পবয়সী লইয়া দল গঠন করিয়াছি; ঘাট হইয়াছে! আজ মামস্‌, কাল পরীক্ষা, এতাদৃশ গরহাজির লাগিয়া আছে। বস্তি লইয়া আমরা বছর দুই চেষ্টা করিলাম, সেখানেও নানান ওজোড়, ইহা ব্যতীত উচ্চারণ কোন ক্রমেই শ্রুতিযোগ্য হইল না।'

"লক্ষ্মীর পরীক্ষা" ও "হ-য-ব-র-ল" পালা দুটি কবে কোথায় অভিনীত হয়েছিল তার কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য

মেলে নি এখনও। তৈরি ছিল অথচ অভিনয় হয় নি এমন পালাগুলির প্রসঙ্গ নানা স্থানে নানা কারণে কমলকুমার বারবার বলেছেন—"রিজিয়া" (সুলতানা রিজিয়া?) পালাটিতে শুধুমাত্র মেয়েদের ভূমিকা আছে। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা' পালাটিও শুধুমাত্র মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে। 'মেয়েদের ভূমিকা লইয়া পালা লেখা ভারী কঠিন। "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" পালায় কঠিনত্ব প্রসঙ্গে কমলকুমার বলেছেন, 'এরূপ একখানি নাটক কোন সাহিত্যে নাই, এখানে মেয়েদের মনে ঝিয়ের মানসিকতা লইয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কি বাস্তব, তাহা কি সুন্দর! সেখানে কি বিস্ময়কর কথা 'তোমারও লেগেছে দাতার হাওয়া'—এমন এক মুহূর্ত নাই যেখানে কিছু না কিছু উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এইরূপ এক নাটক জানিলে স্বভাবতই পালা লিখিতে ভয় করে।" (সুলতানা রিজিয়ার মুখবন্ধ, কবিতীর্থ, অকটোবর ৮৫) "এমপারার জোনস" নাটকের প্রাক্‌ভাষণে বলেছেন, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' একটি চমৎকার নাটক, প্রথমত তাহার থিম ঝির রাণী হইবার কল্পনা'।

"ঘোড়াচোর" গীতে সম্পূর্ণ। 'মানসিকতার সহিত শব্দ যোজনা করিয়া ঘোড়াচোরটি নির্মিত! উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে কমলকুমারের নাট্যরূপ। "ভাব প্রকাশ বিষয়ে" প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, 'আমাদের বড় ইচ্ছা ছিল একটি সঙ্গীত-মুখর পালা যেমন, প্রখ্যাত নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশবাবু করিয়াছেন তেমনই ধরণের রচনা করিব—তবে ইহা অনেকটা opera-র মত (প্রকাশ থাক পুচিনি আদি বহু অপেরা আমরা গ্রামোফোন রেকর্ডে ইদানীং টেপের মারফৎ শুনিয়াছি) অবশ্যই ঐ অপেরা মজার হাসির হইবে।'

"প্রহ্লাদচরিত", "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" পালা দুটি "রামায়ণগাথা"র মতোই কথকতার ভঙ্গিতে রচিত। "আলমগীর" পালায় শর্মিলা ঠাকুর উদিপুরির ভূমিকায় রিহারসাল দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৩২-৩৯ পর্যন্ত অভিনীত "শোধবোধ", "শেষরক্ষা", "পুরস্কার", "হৃদিস্পৃক", "চাঁদ সদাগর", "ছন্দপতন" এবং ১৯৫২ থেকে ৭৭ পর্যন্ত অভিনীত নাটকগুলিকে যোগ করলে কমলকুমারের পরিচালিত নাটকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।[৭] আর অভিনীত হয় নি অথচ তৈরি ছিল নাটকগুলি মিলিয়ে সংখ্যার দিক দিয়ে কমলকুমার একাই একটি ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠান। সংবাদপত্রের প্রশংসা, গুণিজনদের সহযোগিতা এবং কমলকুমারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং হাই-আর্ট সৃজনের পারদর্শিতা সত্ত্বেও ওই নাটকগুলি কেন বর্তমানে কয়েকজন মানুষের স্মৃতিতে সীমাবদ্ধ, কেন কোন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নি, সেটাই বিস্ময়ের!

মানসিকতার সহিত শব্দযোজনা, নির্মাণ ও অভিনয়গঠন

এক অর্থে কমলকুমার-পরিচালিত নাটকগুলি ছোটোদের নিয়ে নাটক করার বিলাসিতা মাত্র। স্থায়ী মঞ্চ স্থায়ী দল কোনোটাই ছিল না। বার বার দলভাঙা দলগড়ার মধ্য দিয়ে কমলকুমার যেন বাহবা পেতে চেয়েছিলেন আনকোরা গোঁফ-না-ওঠা ছোকরাদের নিয়ে নতুন-নতুন নাটক পরিচালনা করে। নাট্যসমালোচকরা দৈনিক পত্রেরপাতায় ভাষার অদলবদল করে এই কথাটাই বারবার বলেছেন, যে, "পরিণত মননের এই নাটক অথচ একদম নভিসদের নিয়ে পরিবেষণ একমাত্র প্রজ্ঞা সেই সাহস রাখে। হয়ত শুধু কমলকুমার মজুমদারই রাখেন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪.১০.৭৬) ছোটোদের নিয়ে নাটক করায় ফ্লেকসিবিলিটির যে সুবিধা কমলকুমার পেতেন সেই সুবিধা নিয়ে গড়ে তোলা ছেলেরা পরবর্তী নাটকে আর থাকত না। এর কী কারণ জানা যায় না, হয়তো 'আজ মাম্‌স, কাল পরীক্ষা, এতাদৃশ গরহাজিরা' একটি কারণ হলেও মূল কারণ তারা কেউই নাটকের জগতে চাঁদ-সূর্য হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসে নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "গোলাপসুন্দরী"র ভূমিকায় বলেছেন, 'আমরা নাটকের দল খুলেছিলাম বটে, কিন্তু নাট্যজগতের চন্দ্র-সূর্য হবার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের ছিল না।' হয়তো কমলকুমারের-ও ছিল না। ১৯৫২ সালের "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" নাটকের অভিনয়ে 'চুনীশীল, বুড্ডা, সুনীল, উৎপলের কথা চিরদিন মনে থাকিবে' বললেও কমলকুমার ১৯৫৮ সালেই তাদের বাদ দিয়ে দেন ওই একই নাটকের মঞ্চায়নে। "দৈত্যকাহিনী" (কৃত্তিবাস, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৮৪)-তে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কমলকুমারের 'একটি মাত্র বাক্যের এমন মহান বিবাদের দৃশ্য' জানিয়েছেন যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে কমলকুমার যেমন গড়তে ভালোবাসতেন, তারও চেয়ে ভালোবাসতেন ভাঙতে। ফলে এই ভাঙাগড়ার ফাঁকে-ফাঁকে যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছিল সেগুলির নিশ্চিত একটা কৃতিত্বের পরিমাপ করার ভূমিকা আছে। এবং বলাই বাহুল্য, আনকোরা নভিসদের নিয়ে নাটক করার মতো প্রজ্ঞা আর সাহস কমলকুমারের ছিল রঙ্গমঞ্চের সেই নিত্যচমকিত মুহূর্তেও। প্রয়োগ, মঞ্চসজ্জা, আলো, অভিনয়, স্বরক্ষেপণ, পোশাক এবং চিন্তনের মধ্যেই স্বতন্ত্র একটি স্থান করে নিয়েছিল নাটকগুলি।

পঞ্চাশ-ষাট দশকের মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সচেতনতার প্রতিফলন যেমন ঘটেছে এই সময়ের নাটকগুলিতে, তেমনি এই সময়েই দেখা গেছে চিরন্তনতার নিরিখে মানুষের অবস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস বহুরূপীর নাট্য-প্রযোজনায়। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তার, উপলব্ধির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির এবং সর্বস্তরের মানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছিল বহুরূপীর মাধ্যমে। অপরদিকে উৎপল দত্তের L. T. G. পরে P. L. T. ইংরাজি নাটকের অভিনয়ে সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতির রাজনৈতিক বিশ্লেষণ-মূলক নাটক আর তার সঙ্গে নান্দীকারের পাশ্চাত্ত্য অভিনয়রীতির মুহূর্তে কমলকুমারের হালকা রসের ফারস্‌গুলিকে অপ্রাসঙ্গিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কাঁচা বাঙলা রীতির প্রয়োগ, যে বাঙলা রীতি 'মহাপ্রভু হইতে কেশববাবু...গিরিশবাবু হইতে এক বিরাট প্রয়োগ ঐতিহ্য বহমান এবং দেখিলাম তাহা কেমন সৌন্দর্য্যে শিশিরবাবু, তারাসুন্দরী প্রভা ইত্যাদির দ্বারা খেলিয়া উঠিল (রাজা) রবিঠাকুর এর স্টেজ কভার, গতি, পদক্ষেপ এখনও হাতে ছুঁইতে পারি।' ("দানসা ফকির", "কঙ্কালের টংকার" পালার প্রাক্‌ভাষণ) কমলকুমার এই বহমান বাঙলা রীতিতে নতুন মাত্রা যোজনা করে সমকালীন বাস্তবতাকে মূর্ত করেছিলেন হালকাভাবে ব্যঙ্গের মাধ্যমে। চোখে দেখা বাস্তব থেকে সরে গিয়ে বস্তুর বস্তুত্বের স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন সাহিত্যিক কমলকুমারের রীতিতেই। ফরমালিসট তদন্তের প্রবণতা বেশি থাকায় সমালোচকদের চোখে নাটকগুলির উপস্থাপনা যে অর্থে ওরিজিনাল হয়ে ওঠে, সেই অর্থেই কমলকুমারও হয়ে উঠেছিলেন 'only rebel in Bengali theatre today' (স্টেটসম্যান, ২. ১০. ৭৬)। ফলে "কঙ্কালের টংকার" নাটকের 'মানুষও তেমনি ভূতের ঘাঁড়ে চাঁপে' প্রভৃতি সংলাপ সমাজ-বাস্তবতা হারিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে পরিচালকের অভিনব পরিচালনকৃতিত্ব। নাটকগুলির চোখধাঁধানো উপস্থাপনা থেকে সরে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পঞ্চাশ-ষাট দশকের সামাজিক অবস্থাকে তিনি পাশ কাটিয়ে যান নি, এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গেই অন্বিত হয়ে গিয়েছিলেন নতুন নান্দনিক মূল্যবোধ আর দৃষ্টি নিয়েই। একদিকে ফর্‌ম্‌-চেতনা অন্যদিকে বুদ্ধির প্রয়োগ এবং মানসিকতার নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে শব্দযোজনার দ্বারাই যুক্ত হয়ে উঠেছিলেন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে; নিজেও হয়ে উঠেছিলেন সত্যি সত্যি 'only rebel in Bengali theatre'।

গান, চিত্র, মূকাভিনয়, নিখুঁত ভয়েস এবং ভলিউম, স্থাপত্য প্রভৃতি আর্টকর্মের একত্র সমাবেশে আর তার সঙ্গে 'মানসিকতার সহিত শব্দ' যোজনার মাধ্যমে কমলকুমার পরিচালিত নাটকগুলির পূর্ণতাকে স্পর্শ করা যায়। 'কোন অবলম্বনের আমরা পক্ষপাতী নই'—এই ঘোষণার সত্য নাট্য উপস্থাপনার full performing থেকে উঠে আসত। সাধারণ আলোয়, সাধারণ মঞ্চে অভিনয় হত, আলোর জৌলুসে অভিনয়ের বিন্দুমাত্র ঘাটতি ঢাকা দেবার চেষ্টা পরিচালকের ছিল না। গোটা মঞ্চ জুড়ে ঝকঝকে আলো অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকত। "এমপারার জোনস" নাটকে আলোর ব্যবহার প্রসঙ্গে কমলকুমার বলেছেন, 'যাঁহারা আমাদের আলমগীর, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, কঙ্কালের টংকার ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, আমরা ফুটলাইটে বিশ্বাসী, মুক্তাঙ্গনেও আমরা ফুটলাইট করিয়া লই, কিন্তু এখানে (কলামন্দিরে) তাহা অসম্ভব। স্টেজ চাপা ফলে নটেরা গরমে মহা অসুবিধায় পড়িবে। অথচ ফুটলাইট দিলে লাল অনেক জব্দ হইত।' মারাত্মক দৌড়ঝাঁপ এবং চরিত্রদের চলাফেরা থাকায় মঞ্চের মেঝেয় সমস্ত আলো জড়ো হয়ে মঞ্চ-মেঝে হয়ে উঠত অত্যন্ত ঝকমকে। নাটকগুলির পরিচ্ছদ ও অভিনয় গঠনে মঞ্চ-মেঝের প্রয়োজন হয়ে উঠত অনিবার্য। অভিব্যক্তিমূলক নাটকে বিশেষত "এমপারার জোনস" নাটকে সংলাপের সঙ্গে মঞ্চ-মেঝের ব্যবহারে নাটকখানির রূপ যেন হাতে ছোঁয়া যায়, জোনসের চরিত্রে সলিল ভট্টাচার্য দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চ-মেঝেকে কাজে লাগিয়েছিলেন, যেটুকু মেলোড্রামাটিক মনে হয়েছিল মঞ্চের অপরিসর জমি তার অনেকখানিই কারণ।

চরিত্র অনুযায়ী পোশাক কমলকুমারের নাটকের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। নিজে ছবি এঁকে পোশাক তৈরি করাতেন চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী। উজ্জ্বল ভেলভেট, সাটিন ও ব্রোকেড ছাড়া 'দানসা ফকির' পালায়

কালো আলখাল্লার উপর নানা বর্ণের কাপড়-টুকরোর তালি দিয়ে পোশাক তৈরি করিয়েছিলেন নিজে। "কঙ্কালের টংকার" পালায় মাধব চক্রবর্তীর পোশাক ছিল সাদা-কালো ডোরা-কাটা দীর্ঘ জামা। ভূতেদের হাতে বন্দীদশায় মাধব চক্রবর্তী এবং গোটা দৃশ্যপটে কম্পন-অনুভব আনতে ওই ডোরাকাটা জামার ব্যবহার ছিল অনিবার্য। একটু কাঁপনেই গোটা মঞ্চটিও যেন নড়ে উঠত। "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" পালায় পোশাকের বিচিত্র বিন্যাস ভিন্ন আবহ সঞ্চার করেছিল।

রূপসজ্জা এবং মেক-আপের ক্ষেত্রেও কমলকুমারের মৌলিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মেক-আপের চেয়েও বেশি জোর দিতেন চরিত্র রূপায়নে। যার ফলে ইতিহাসপরিচিত আলমগীর চরিত্রের কোন দাড়ি ছিল না, দানসা ফকিরেরও দাড়ি ছিল না। অভিনয়ের গুণেই অভিনেতারা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করত, মুখের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আলাদা-আলাদা ভাবপ্রকাশ প্রতিটি দর্শকের কাছে পৌঁছে দিত পূর্ণ চরিত্র-টিকে। ফলে তাঁর নাটক দৃশ্যমুখী যতটা ঠিক ততটাই অনুভবমুখী। একই সঙ্গে পেনটিং, অভিনয় এবং অনুভবের সূক্ষ্মতা পৌঁছে যেত প্রতিটি দর্শকের কাছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হত নিঁখুত স্বরক্ষেপণ আর গীত। উচ্চারণের সাংগীতিক সূক্ষ্মতা, কম্পনহীন স্পষ্টতা আর স্বরের পৃথক-পৃথক আক্ষরিক ভিন্নতা কমলকুমারের নাট্যকলার প্রধান বিশেষত্ব। প্রতিটি দর্শকের কাছে নিক্ষিপ্ত স্বরের একই রকম উচ্চারণ স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে কমলকুমার বিজ্ঞানীর মতো নানা উপায় উদ্‌ভাবন করেছেন, কোনো শব্দের শেষে 'ন' তুলে 'ম' বসিয়ে চেপে উচ্চারণ করলে একই রকম শোনাবে, কিংবা 'কি সংবাদ উজির'-এর পরিবর্তে 'ই-য়-ম কি সংবাদ উজির' বললে 'কি' শব্দটি সমস্ত দর্শকের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসবে ইত্যাদি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "কৃত্তিবাস" সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, "তাঁর মুখেই শুনেছি যে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' এই বিখ্যাত উক্তির সময় গিরিশচন্দ্র নাকি বাগান না বলে 'বাংকান' বলতেন, দূর থেকে তাতেই শব্দটি অনেক বেশি শোকাবহ মনে হতো।" শব্দের নিখুঁত স্বরক্ষেপণের কারণে প্রতিটি অভি-নেতাকে মহড়ার পূর্বে সরগম করতে হত—গানের গলা থাক বা না থাক। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'যে মানুষ কথা বলতে পারে সে গানও গাইতে পারে।' কিশোর অভিনেতাদের অ-আ-ক-খ মতোন ধরে-ধরে উচ্চারণ শিখিয়ে-ছিলেন। 'মানসিকতার সহিত শব্দ' প্রয়োগের শিক্ষা নিয়েছিলেন 'মনুষো-চিত বৃত্তি, বিস্ময়, হতবুদ্ধি, হাস্য, বাচনভঙ্গী, তোতলা হইতে আপ্লুত স্বর! জিহ্বার আড়। চলতি কথার রকম—ক্রন্দনসহ বাচনভঙ্গী, ভিক্ষুকের আবেদন, খেলার গোল, রেকর্ড খারাপ হওয়াতে একই জায়গার স্বর… ন্যাকামী, আঞ্চলিকভেদ, মন্ত্রপাঠ, শ্রাদ্ধ, অঞ্জলির সমবেত কণ্ঠ, আজান, সত্যপীর, চাহিল্লুমের গীত, ফেরিওয়া-লার ডাক, চৌকিদারের হাঁক, পশু-পাখির গর্জ্জন তর্জ্জন কলহ!' (ভাব-প্রকাশ বিষয়ে, পৃ ৩৪) প্রভৃতি থেকে। স্বরক্ষেপণের শুদ্ধ প্রকাশ আর স্বরের ভিন্ন-ভিন্ন অক্ষরের পৃথক উচ্চারণ বিষয়টি কমলকুমার গ্রহণ করেছিলেন বাঙলা নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে। কেশব সেন 'ঐ ত ভগবান!' বললেই সমস্ত শ্রোতা অঙ্গুলিনির্দেশিত পথে দৃষ্টি মেলে ধরত। শিশির ভাদুড়ি "দেনা পাওনা" নাটক নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলে পাঠান 'বলিয়া দিও শিশির ভাদুড়ি যদি কলেজ স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া a b c বলে ত লোকে শুনিবে…' "অর্থাৎ যে কোন পরিচিত অক্ষর দ্বারা তিনি সর্বৈবভাবে আপনার স্বরবৃত্তি প্রকাশে দক্ষ ছিলেন" (ভাবপ্রকাশ বিষয়ে) কমলকুমার স্বরবৃত্তি প্রকাশে এই দক্ষতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, সর্বাংশে সফল হয়ে ওঠেন নি। প্রায় প্রতিটি নাটকেই অভিনেতাদের স্বর-ক্ষেপের দুর্বলতা এবং উচ্চারণের অস্পষ্টতা স্থূলভাবেই বর্তমান ছিল।[8]

কমলকুমারনির্দেশিত নাটকগুলিতে সংগীতপরিচালক ছিলেন ফৈয়াজ খাঁর শিষ্য সন্তোষ রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সুশীল মল্লিক প্রভৃতি প্রখ্যাত সংগীত-শিল্পীরা। কমলকুমার নিজেও সংগীতে পারদর্শী এবং যোদ্ধা ছিলেন। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত এবং বিদেশী গানের ব্যাপারে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সচেতন মনের পরিচয় বিভিন্ন জনের কাছে যেমন শোনা যায়, তেমনি জানা যায় নানা চিঠিপত্রে, 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার' প্রবন্ধে, "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় নানা সময়ে প্রকাশিত 'সঙ্গীত' নামক ফিচারে।[9] 'ঘোড়াচোর' পালার সংগীত পরিকল্পনায় কমলকুমারের স্পষ্ট সংগীত-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়—'ইহাতে রাগরাগিণী, লোকগীতি টপ্‌পা, ছেলে-বেলায় চার্চে গীত-সহিতা এবং আমাদের সিদ্ধ সুরকার রামপ্রসাদ, গিরিশবাবু, আলিবাবার সুরকার ডি এল রায় হইতে ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ সরকার দিলীপবাবু, ভীষ্মদেব, কুমুদ-

মল্লিক, কুমার শচীনদেব—ও কর্ণাট ধারণ সবই ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি।' (ভাবপ্রকাশ বিষয়ে) আর এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন মোজার্ট, ভার্দি, পুচ্চিনির সুরাভাস। "রামায়ণগাথা" পালায় গীতের সুরপ্রবাহ দর্শকদের মোহিত করেছিল। প্রায় সব নাটকেই গীতের সূক্ষ্ম ব্যবহার নাটকগুলিতে আলাদা মাত্রা যোজনা করত। কমল-কুমার মনে করেন 'সংগীতপরিচালকের কাজ শুধু কোন একটি কি দুটি গানে ভালো সুর দিতেচেষ্টা করা নয়; আবহ-সংগীত সৃষ্টি করে তোলাই তাঁর দায়িত্ব। যে সুরব্যঞ্জনা গোটা কাহিনীকে ধরে রাখবে পিছন দিক থেকে; কাহিনীর কাঠামোর কাজ করবে আবহসংগীত।' (চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার, চলচ্চিত্র, আশ্বিন ১৩৫৭) ফলে পেনটিং এবং আবহসংগীত উভয়ে মিলে কমলকুমারের নাট্যকৌশলকে বিশেষত্ব দান করত এক আলাদা মাত্রার—প্রচলিত নাটক দেখার অভ্যাস খুঁজে পেত ওরিজিনালিটি।

শ্রোতব্য দিকটির মতো দৃশ্যত দিক-টির প্রতিও কমলকুমারের যত্ন ছিল অনলস। মহড়ার সময় গলার স্বরের মতোই গতিময় চলন প্র্যাকটিস নিখুঁত না হলে নাটককে মঞ্চস্থ করতেন না কিছুতেই। প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সূক্ষ্ম চলনও ছক কেটে-কেটে নিখুঁত-ভাবে রপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সমানে চলত মহড়া। মহড়া সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ, 'এক একটি নাটকের মহড়া অনেকদিন ধরিয়া, নিদেনপক্ষে তিনমাস নেওয়া উচিত।' পালাগুলির প্রতিটি কমপো-জিশনকে কমলকুমার যেহেতু ছবির মতো এঁকে তুলতেন মঞ্চে সেই কারণে পালাগুলি ছিল সম্পূর্ণ ফুটওয়ার্ক নির্ভর। পদক্ষেপের সামান্য তারতম্যে ছবিটি ভেঙে যেতে পারে বলেই প্রতিটি দৃশ্য কমলকুমার এঁকে নিতেন, অভিনেতা-দের ফুটওয়ার্ক অভ্যাস করাতেন জমিতে খড়ির দাগ কেটে-কেটে। 'অভিনেতার ফুটওয়ার্কই আসল'—কমলকুমারের অভিনয় সম্পর্কে আসল কথা ছিল। যার ফলে "আলমগীর" নাটকে সম্রাজ্ঞী কিভাবে হাঁটবেন এইটুকু শেখাতে কমলকুমার শর্মিলা ঠাকুরকে সর্বস্তরের নারীজাতির হাঁটার অনুশীলন করিয়ে-ছিলেন। সারা মঞ্চ জুড়ে অভিনেতা-দের তীব্রগতিযুক্ত পদক্ষেপ নাটকের শেষ পর্যন্ত থাকত বলেই বড়ো মঞ্চের জন্য হাহাকার করেছেন কমলকুমার, নানা প্রসঙ্গে বড়ো মঞ্চের খেদের কথা বারবার প্রকাশ করেছেন। ৯.১০.৭৯ তারিখের একটি চিঠিতে কমলকুমার আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'আমার পয়সা থাকিলে অথবা ঠাকুরের কৃপায় ডি.কে. গুপ্তর মত একজন লোক পাইতাম তাহা হইলে দেখান যাইত বাংলা স্টেজ কি করিতে পারে।' "এমপারার জোনস" পালার প্রাক্‌ভাষণেও একই আক্ষেপ—'১৯৬৭ হইতে আজ পর্যন্ত ছোটদের নাটক আমরা অদ্যপি বড় স্টেজে মঞ্চস্থ করিতে পারি নাই। আমরা সকলেই জানি মঞ্চ-মেঝে সংলাপের অনেকখানি …এখানে ঐ স্থানাভাবে বাচনভঙ্গী মেলোড্রামাটিক হইতে পারে।' এত সব হাহাকার সত্ত্বেও কমলকুমার মহড়ায় কোনো ত্রুটি সহ্য করতেন না। পদ-ক্ষেপের নিখুঁত ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন মাইম। 'মাইম বলিতে শুধু হস্ত সঞ্চালন নয়, সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহই খেলিবে এবং সমগ্র মঞ্চ ব্যবহার রপ্ত করিতে হইবে।' (সুলতানা রিজিয়া) কেননা 'জাঁ বেরো বলিয়া-ছেন, মাইম বোবার সহিত কথা বলা নহে।' সংলাপ এবং মাইমের পাশা-পাশি ব্যবহার দ্রষ্টব্য এবং শ্রোতব্য অংশ ছাড়াও চরিত্রগুলির ভাবুকতার অনুভবঘন রূপটিকেও মঞ্চে আলোর মতো সংগীতের সুরের মতো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হতেন পরিচালক কমল-কুমার মজুমদার।

কমলকুমারের এত সচেতনতা, এত মৌলিক উদ্‌ভাবন, এতবার নাটক সঞ্চায়িত করা সত্ত্বেও সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্যটিই সত্যি হয়ে দাঁড়ায়,—'কমল-বাবু কিছু করলে ধারেকাছে কেউ আসবে না।'[10] রঙ্গমঞ্চে কমলকুমার বরাবরই অ্যামেচার থেকে গেছেন। যা করেছেন শখে, খেয়ালি মানুষের মতো নাটক নিয়ে খেয়াল মিটিয়েছেন। বাঙলার মঞ্চে স্থায়ী কোনো দাগ রেখে যাননি, নিদেন তাঁর দল থেকে একজনও খ্যাতিমান অভিনেতা উঠে আসে নি। তৈরি-করা ছেলেদের দিয়ে নাটক অভিনয় করানোর সুবিধাকে গ্রহণ না করে বার বার নতুন দল গঠন করেছেন, দল এক থাকলেও অভিনেতারা বদলে গেছেন বারবার। আসলে কমলকুমার শিক্ষক—প্রবলভাবেই শিক্ষক। অভি-নয়জগতেও কমলকুমার শিক্ষকতা করে গেছেন, যে শিক্ষকতা আজ কয়েকটি মানুষের স্মৃতির আশ্রয়ে বেঁচে আছে। সমসাময়িক কালে সংবাদপত্রের পাতায় only rebel in Bengali theatre today। সেই today tomorrow-র কোনো প্রতিশ্রুতি বহন করে না। হয়তো প্রবল অর্থকষ্ট, স্থায়ী মঞ্চের অভাব একটি কারণ হতে পারে,—তবু কমলকুমার সাহিত্যিক, পরিচালক নন। শিল্পের নানা দিকে যুক্ত থেকে সাহিত্যকেই পুষ্ট করতে চেয়েছিলেন।

সময়ের বিচারে সাহিত্যিক কমলকুমারের পরই পরিচালক কমলকুমার স্থান পেতে পারেন, জীবনের অনেকটা সময় নাট্য-অভিনয়-পরিচালনায় কাটিয়েছিলেন। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা যখন তুঙ্গে তখনও কমলকুমার নাট্য-পরিচালনায় অনেক সময় ব্যয় করেছেন, ফলে রঙ্গমঞ্চের কমলকুমারকে বাদ দিয়ে, কৃতিত্বকে অস্বীকার করে কখনোই সাহিত্যিক কমলকুমারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয়, চিত্রকর কমলকুমারকে অস্বীকার করে তাঁর সাহিত্যের চিত্রময় গদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা।

প্রসঙ্গনির্দেশ

১. ১.১০.৬৭ সালে "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" এবং "রামায়ণগাথা" পালার প্রাক্‌ভাষণে কমলকুমার বলেন, 'আজ হইতে বছর পনেরো পূর্বে শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার গুপ্ত মহাশয় আমাকে আজ্ঞা করেন, যে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' মঞ্চস্থ করতে হইবে।' তাছাড়া স্নীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে ১৯৫২ সালের কথাই বলেছেন।

২. সংবাদপত্রের নাট্যসমালোচকদের মন্তব্য ছাড়া কমলকুমারকে অনেক গুণিজন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখে নাটকগুলির উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করেন। তাদের কয়েকটি তুলে ধরছি—(ক) "রামায়ণগাথা" এবং "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" পালার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করে ২৭ অকটোবর ১৯৬৭ তারিখের "দেশ" পত্রিকা লেখে—'এর জন্য যে নিষ্ঠা, অনলস পরিশ্রম ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ ও বিশ্বাসের প্রয়োজন, তা এই অনুষ্ঠানের পরিচালক শ্রীকমলকুমার মজুমদারের ছিল। তাঁর অনুভবের স্নিগ্ধতা ও গভীরতার ব্যাপ্তিতেই 'চিলড্রেন অপেরা গ্রুপের' অনুষ্ঠান শুধুমাত্র সংগীত, অভিনয়, যন্ত্রসংগীতের আকর্ষণকারী অনুষ্ঠানই হয়নি, তা হয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতির একটি পুণ্য লগ্ন।' (খ) কমলবাবুর নাটকে মঞ্চসজ্জা, আলোছায়ার খেলা বাদ দিয়ে তাঁর প্রখর ওরিজিনালিটি অন্যত্র খুঁজতে হয়—এ দুটি নাটকেও সেই একই ব্যক্তিত্বের নাট্যাভিনয়। পৌরাণিক পোশাকের আবরণে আধুনিকতম বাঙ্গ প্রকাশে কমলবাবু সিদ্ধহস্ত।··· দ্বিতীয় নাটকটির (লক্ষ্মণের শক্তিশেল) রূপসজ্জা বর্ণনাতীত—একমাত্র সুকুমার রায় হয়ত ভাবতে পারতেন।—আনন্দ বাজার পত্রিকা ১.৭.৭৭

(গ) Kamal Majumdar remains the only rebel in Bengali theatre today. He takes no interest in ideological hair-splitting, neither has the arena replaced the Proscenium in his affections.—Statesman 2.10.76

(ঘ) পরিণত মননের এই নাটক অথচ একদম নভিনদের নিয়ে পরিবেষণ একমাত্র প্রজ্ঞা সেই সাহস রাখে। হয়ত শুধু কমলকুমার মজুমদারই রাখেন। আনন্দবাজার পত্রিকা / ১৪.১০.৭৬

(ঙ) Despite the recent enthusiasm for Beckett, Brecht and Joneses, properly stylized productions are still rare on our stage. The success of a Bengali version of "The Emperor Jones" staged by the Children's Opera Group at Kala Mandir (basement), came as a pleasant surprise. Statesman / 9.10.70

১৫.১০.৭০ তারিখের একটি চিঠিতে রবি ঘোষ লিখেছেন—'Jone's-এর last drop যখন পড়ল আমার কাছে কবিতার মত মনে হোলো। Classical গান (ভাল) শেষ হলে যেমন একটা সুর থেকে যায়, সেদিনকার অভিনয়েও তেমন একটা সুর থেকে গিয়েছিল।' ৭.১০.৮৬ তারিখের একটি চিঠিতে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত লিখেছেন—'সেদিন 'দানসা ফকির' ও 'কংকালের টংকার' দেখা আমার কাছে চিরকালের জন্য থেকে যাবে এক অত্যন্ত দামী ও প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা হয়ে। কখনো ভোলা যাবে না। আমি ব্রেখট বা ম্যলিওর দেখিনি, জানি না এঁরা সেদিন যা দেখলাম তার চেয়েও ভালো করতেন কি না।'

৩. "মুক্তধারা" হরবোলার দ্বিতীয় নাটক। এই নাটকটির একটুও ছাঁটকাট না করে সম্ভবত কমলকুমারই প্রথম অভিনয় করেন। 'মুক্তধারা' এ একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক ছিপছিপে চেহারার সুন্দরী তরুণী, তিনি এখন গৌরী আইয়ুব্।' দৈত্য-কাহিনী, স্নীল গঙ্গোপাধ্যায়)

৪. রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জী, অরুণ গুহঠাকুরতা কমলকুমারের কাছে অভিনয় শিখতে চেয়েছিলেন। "আলীবাবা" নাটকটি করবার বাসনায় রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কিছুদিন কাজও করেছিলেন। "আলীবাবা" নাটকের কিছু স্কেচস্কেচ আমার কাছে আছে। শর্মিলা ঠাকুর "আলমগীর" নাটকে উদিপুরির ভূমিকায় অনেকদিন কমলকুমারের কাছে মহড়া দেন।

৫. হরবোলা, কলিকাতা নাট্য সম্প্রদায়, চিলড্রেনস্ অপেরা, ক্যালকাটা চিলড্রেনস্ অপেরা গ্রুপ কমলকুমারের নাটাদলের নাম। ডি. কে, গুপ্তর "হরবোলাকে নিছক নাটকে দল করার ইচ্ছে একদম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, সেখানে সমবেত হয়ে আমরা সকলে সঙ্গীত-সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে অনুরক্ত হবো।" (দৈত্য-কাহিনী, স্নীল গঙ্গোপাধ্যায়) 'কালকাটা চিলড্রেনস অপেরা গ্রুপ' মূলত ছিল একটি ফিল্মক্লাব। বছরে ১২ টাকা চাঁদা লাগত সভ্যদের। প্রতি রবিবার সিনেমা দেখানো হত সভ্যদের। ১৯৭৮-এ Statesman কাগজে K. K. Mazumdar's Arts and Crafts School নামে একটি বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল। এই সংস্থাগুলিকে শুধুমাত্র নাট্যকে দল করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত নাটকেরই দল হয়ে উঠেছিল।

৬. ভালো লাগেনি এই অজুহাতে কলকাতা ময়দানে বঙ্গসংস্কৃতিসম্মেলনে কমলকুমার-পরিচালিত "দানসা ফকির" ও "কঙ্কালের টংকার" নাটক দুটি দর্শকরা ভণ্ডুল করে দেয়। এর প্রতিবাদে 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' ২৭.১.৭৭ তারিখে 'Sad on Mela ground' নামে একটি খবর ও 'কৃত্তিবাস', পৌষ ১৩৮৩-তে সম্পাদকীয় লেখা হয়। 'কবিতীর্থ', অকটোবর ১৯৮৬ সংখ্যায় সুবিমল মিশ্র সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার গর্ব, যেবার বঙ্গসংস্কৃতিতে কমলবাবুর নাটক চেঁচিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় সেবার প্রতিবাদ করেছিলাম—চেঁচামেচির বিরুদ্ধে প্রবলভাবে চেঁচিয়েছিলাম।'

৭. ১৯৫২ সালের পূর্বে কমলকুমারের নাটকগুলির নাম সংগ্রহ করেছি শান্থ লাহিড়ী, গীতা বসু ও দয়াময়ী মজুমদারের কাছে। ২রা ফেব্রুয়ারি 'প্রতিক্ষণিকায়' শান্থ লাহিড়ী 'বহুসংক্রান্ত স্মৃতি' রচনায় কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করেছেন। ৫২ সালের পর কমলকুমার-পরিচালিত নাটকের পূর্ণ তালিকা এবং কবে কখন কোথায় অভিনয় হয় তার খুব বিশ্বাসযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। নানা স্মৃতিকথায় উল্লেখ পাওয়া যায় (প্রবন্ধে আলোচিত নাটকগুলি ছাড়া)। হ-য-ব-র-ল, আলমগীর, লক্ষ্মীর পরীক্ষা, রিজিয়া নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল। এ সম্পর্কে কেউ বিশদ তথ্য জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

৮. উচ্চারণের সুক্ষ্মতা এবং স্বরক্ষেপণের নানা পদ্ধতি কমলকুমারের নাট্য প্রসঙ্গে অবশ্য উল্লিখিত বিষয়। প্রচণ্ড যত্ন এবং পরিশ্রমের পরও অভিনয়ে অভিনেতাদের উচ্চারণের ত্রুটি বড়ো হয়ে উঠেছিল প্রায় সব নাটকেই। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়—"ভীমবধ" ও "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার ১.৭.৭৭ তারিখের নাট্যসমালোচক লেখেন—'অ্যাকশনের ঝাপটায় সুকুমার রায়ের সেইসব অনিবার্যণীয় সংলাপও হারিয়ে যায়; তার জন্যে আবার দায়ী উচ্চারণে স্বরক্ষেপের দুর্বলতা। সম্মিলিত উচ্চারণে বা গানগুলির শব্দোচ্চারণে সেই দুর্বলতাই দুঃখজনক হয়ে উঠেছিল।' "কঙ্কালের টংকার" এবং "দানসা ফকির" সম্পর্কে "দেশ" ১৬.১০.৭৬-এ 'সংলাপ এখানে এমনই অমোঘ ছিল যে শুধু তার উচ্চারণ মঞ্চকে উদ্ভাসিত করতে পারতো।···দুঃখ শুধু, কুশীলবদের উচ্চারণে সেসব সংলাপের সমান প্রকাশ ঘটেনি।' ১৪.১০.৭৬-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লেখে—"উচ্চারণে আরও সতর্ক হওয়া দরকার ছিল। তীক্ষ্ণ উচ্চারণ, স্পষ্ট স্বরক্ষেপ, কণ্ঠের মডিলিউশন। দুঃখ এই যে, এখানে যুবা অভিনেতাদের সংলাপ সম্বন্ধে ধারণা ছিল না; যথেষ্ট ওঞ্জগত হয়নি বলে প্রমপটিংও বরাবর শোনা গেছে।'

৯. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় "দৈত্যকাহিনী" প্রবন্ধে লিখেছেন—'কমলকুমার মজুমদারও গায়ক নন। কিন্তু তিনি সবসময় গুনগুন করে সুর ভাঁজতেন।' নানা তথ্য থেকে জানা যায়, কমলকুমার একজন গায়কও ছিলেন। ১০.৬.৫৬ তারিখের অরুণ ভট্টাচার্যকে একটি চিঠির শেষে আছে, "আসলে নিবিবিলি সঙ্গীত চর্চা করা যেতো। নতুন করে তবলা বায়া ছেয়েছি। তানপুরোর সুরটিও বেশ মিষ্টি রয়েছে। আপনাকে ভৈরো শোনাবো যদি আসেন এবং আপনারও শুনবো।" ১৯৬৫ সালের ২৭শে মার্চের চকল চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিতেও গান বিষয়ে নানা তথ্য রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ করা যায় কমলকুমার ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন।

১০. রঙ্গমঞ্চ ও কমলদা, রবি ঘোষ, শব্দপত্র, কমলকুমার সংখ্যা, সেপটেমবর ১৯৮৪

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে

পিছনে তাকালে আজও পরিষ্কার দেখতে পাই। আকাইপুরের পশ্চিম গায়ে বেলেমাটির ধু-ধু প্রান্তর। সারাদিন আগুন ঢেলে জ্বলতে-জ্বলতে জ্যৈষ্ঠের সূর্য সবে পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে। যদু হাজরার বটগাছের আড়ালে বিলম্বিত অলস অন্ধকারে গল্পে-গল্পে বিভূতিদা আর আমি বেড়িয়ে ফিরে আসছি। দক্ষিণপাড়ার পৈতৃক বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের রোয়াকে সতরনজি আর মাদুর বিছিয়ে যখন বসা গেল তারাভরা খোলা আকাশের নীচে, তখন দু-তিনটে লনঠনের লালচে-সাদা আলোয় আশে-পাশে জড়ো হয়ে ছোটো-বড়ো ছায়া ফেলে নানা বয়সের ছেলেমেয়ের পারিবারিক পাঠচক্রের আসর বসেছে। আর মাঝে-মধ্যে এটা-ওটা গল্প চলছে। সেই আসরে বিভূতিভূষণ নিজে যেন প্রধান অতিথি। আর তাঁরই লেখা বই থেকে কিছু-কিছু পাঠ করা হচ্ছে। কিছু আলোচনাও হল। তারপর গল্প জমে উঠে ক্রমশ সবার অগোচরে সন্ধ্যা গিয়ে রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে এল। যোগীন্দ্রদের বাগানে উঁচু নারকেলগাছের মাথায় কুল্লোপাখি তার ঘুমজাগানো কাঁপা-কাঁপা উচ্চকণ্ঠে কর্কশ স্বরে দ্বিতীয় প্রহরের সমাপ্তি ঘোষণা করল : ওয়াক্‌···ওয়াক্‌···কোহো—ও···কোহো—ও···কোহো—ও···

বিভূতিদা প্রশ্ন করলেন, 'মা, তারপর ?'

মা উত্তর দিলেন, 'তারপর ? তারপর হল কী বাবা, সেজো ঠাকরুন মা-কালী হলেন।'

বিভূতিদা—মা-কালী হলেন ?

মা—হ্যাঁ বাবা, মা-কালীর ভর হল ! মাথায় সেই ঘন লম্বা একঢাল কালো চুল এলিয়ে দিয়ে পরনের শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে আঁচলে গাছকোমর বেঁধে সিঁড়ির ওপরে লুটিয়ে পড়া স্বামীর হাত থেকে রক্তমাখা সেই খাঁড়া তুলে নিলেন। আহা ! কী বলব বাবা, মহাদেবের মতো দেখতে সেই দশাসই মানুষ, পদ্মের পাঁপড়ির মতো দুধে-আলতা রঙ যেন ফেটে পড়ছে, কতক্ষণ আর একা পারবেন—পড়ে গেছেন। ঝাড়া একঘণ্টা একহাতে যেন কচুকাটা করেচেন, দোতলার চাপা সিঁড়ির দরজা খোলেন, আর ধাপে-ধাপে নেমে গিয়ে কেটে-কেটে আসেন, কেটে-কেটে আসেন ; সিঁড়ি দিয়ে তখন রক্তগঙ্গা বইছে···আর বাড়ির বাইরে প্রকাণ্ড উঠোনে তখন মশাল হাতে অমন দুশো ডাকাত আকাশ ফাটিয়ে মারমার কাটকাট করচে। রাত তখন দুটো—

'করুণার মায়ের মুখে সেকালের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই।···এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেছি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম।' (বিভূতি-রচনাবলী, ৩ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৫ই আশ্বিন ১৩৭৭, পৃ ৪৮৮-৮৯)

এ হল "পথের পাঁচালী"র বিভূতিভূষণের নিজের কথা। ঊর্মিমুখর দিনলিপিতে ছাপার অক্ষরে স্থান পেয়েছে সে কথা। উনিশশো তিরিশের দশকের গোড়ার কথা। কিন্তু সে যাই হোক, "পথের পাঁচালী" থেকে অপু-দুর্গার গল্প পড়ে সেদিনের সন্ধ্যার আসর আমিই দখল করে রাখব, এই ছিল আশা। কিন্তু কিছুক্ষণ এগোতেই মা তাঁর এই ডাকাতির গল্প ফেঁদে এক ঝটকায় সে আসরের কর্তৃত্ব কেড়ে নিলেন। নিজের দিকে বিভূতিদার মনোযোগ টেনে আনলেন।

স্মৃতিচারণ

মা এমনই গুছিয়ে কথা বলে গল্প জমাতে পারতেন যে তাঁর গল্প শুনবার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সেকালের গল্পের ঝাঁপি খুলে বিভূতিদার গল্পপাগল, খোকার মতো বিস্ময়ভরা তাজা মনটাকে তিনি অধিকার করে নিলেন।

একশো বছরের পুরনো ঘটনা। দুই পক্ষের নীলের ব্যাবসা এবং স্থানীয় নীলকুঠিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ আর সিমহাট-স্বর্ণপুর থেকে ডাকাতের দল আনিয়ে আকাইপুরের প্রতিপক্ষের বাড়ির কর্তাকে খুন করাবার কাহিনী। সেই কাহিনীর বিস্তারিত নাটকীয় বর্ণনা দিয়ে ইতিহাসকে গল্পের রসে জারিত করে বিভূতিদাকে মা যেন কল্পনার রসলোকে পৌঁছে দিলেন। স্মরণীয় যে, "ইছামতী" লিখবার ইচ্ছা এর আগেই বিভূতিভূষণের মনে দানা বেঁধে উঠেছিল এবং তার উপকরণ—নীলকুঠির বিবরণ—সংগ্রহ পর্যন্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সেসব কথা এখানে নয়। আমাদের গল্পের আসরের কথা বলছিলাম। আর এই গল্পের আসরের কথা বলতে গিয়ে এতকাল পরে অর্ধ শতাব্দীর এপারে আজ এইক্ষণে মনে পড়ছে আমার নিজের হারিয়ে-যাওয়া দিন-

সেপটেম্বর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম-মাস। এই উপলক্ষে তাঁর এক অনুরাগীর স্মৃতিচারণ প্রকাশ করা হল।

গুলোর কথা। সে কথার অনেক প্রসঙ্গ বিভূতিদার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, ছড়িয়ে আছে। সেই আমবাগানে, বৈঁচিবনে, নদীর ধারে, ধানের খেতে, মাঠে-মাঠে, ঘুরে-ঘুরে আনন্দে হেলায় হারাবার দিনগুলো। কত যে অদ্ভুত তাজা সবুজ অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত জীবনের স্মৃতি। সেই মায়ের আদর, কত না আবদার, সেই পাড়াগাঁয়ের দুঃখসুখের সংসারের উদার উন্মুক্ত সহজ সরল দিন যা তরতর করে বয়ে যেত। আকাইপুরের সেই পদ্মবিল, সেই মেঘাপোতার ষাঁড়াগাছের মাথায় আলোকলতার সোনার টোপর দুলছে, দক্ষিণের ঝিরিঝিরি পদ্মগন্ধমাখা হাওয়া বইছে, প্রহ্লাদ-বাবাজীর আখড়ায় একতারা বাজছে···সেই পদ্মাবতী আমগাছের নীচু ডালে শুয়ে-শুয়ে দোল খাওয়া, সেই নব-বর্ষার ঘনবর্ষণে ঢেউ তুলে মাঠঘাট ছাপিয়ে গাঙ্গুলীদের চালতাতলায় কুলুকুলু জলের প্লাবন। বিলক্ষণ বুড়ীর কাছে একপয়সায় দুটো হাঁসের ডিম কেনা। আর তারই মাটির ঘরের পাশে রাস্তার ওপারে নওদা আর আকাইপুরের মধ্যখানে সেকালের নীলকুঠির সারি-সারি প্রকাণ্ড উনন আর চৌবাচ্চা, আর ইটসুরকি দিয়ে মজবুত করে বাঁধানো প্রশস্ত ঢালু চাতাল—

ছেলেবেলায় গ্রাম্য সমাজজীবনে আমার মেলামেশার গণ্ডি যখন অপস্রিয়মাণ দিগ্বলয়ের মতো ক্রমশই প্রসারিত হয়ে চলেছে, হঠাৎই তখন একদিন বিভূতিভূষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তখনকার দিনে আমাদের যশোহর আর নদীয়া জেলার প্রান্তিক পল্লীজীবনে আঠারোটি এবং কোনো-কোনো সময় বাইশটি ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম নিয়ে ছিল আমাদের স্থানীয় "সমাজ"। সে সময়ে দেখেছি, আমাদের বড়ো-বড়ো পূজা-উৎসব আর ভোজের আয়োজনে "সমাজ"-এর সব ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ হত এবং দশ-বারো মাইল দূর থেকেও দলে-দলে যে যার গোরুর গাড়ি চেপে বোঝাই হয়ে বাড়ির পুরুষমানুষরা নিমন্ত্রণ খেতে আসতেন। এমনই এক "সমাজ"-এর নিমন্ত্রণে আমরা ছোটো-বড়োরা এসেছিলাম। এইসব গ্রামের মধ্যে পাশাপাশি চারটি গ্রাম : বারাকপুর, আকাইপুর, মাঝখানে গোপালনগর, আর আকাইপুরের পশ্চিমে গরিবপুর। সেই গরিবপুরে এসেই হঠাৎ দুজনের দেখা হয়ে গেল। বিভূতিদার 'খিদু' অর্থাৎ আমার নীরুদাদার স্ত্রী, যাঁকে বৌদি বলে ডাকতাম, তাঁরই একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশনে সেদিন এলাহি কাণ্ড। সেই নিমন্ত্রণে ভোজের পূর্বে গানের আসরে প্রথম দেখা-সাক্ষাৎ। গরিবপুরে দেখা হবার দু বছর পরে কলকাতায় রিপন কলেজে যখন পড়তে গেলাম, তখন থেকে হ্যারিসন রোডে (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) আমার রিপন হসটেল আর বিভূতিদার মিরজাপুর স্ট্রীটের মেসবাড়ির কয়েক গজ দূরত্বের মাঝখানে অবাধ গতায়াতের অদৃশ্য সেতুবন্ধন দেখতে-দেখতে সুদৃঢ় হয়ে গেল। ১৯৩০ সালে দুজনের প্রথম পরিচয়ের যে সূত্রপাত ঘটেছিল, তার দু বছর বাদে কলকাতায় এসে পরবর্তী সুদীর্ঘ আরও প্রায় আঠারো বছরের মেলামেশা আর সাহচর্যের ফলে যে নিবিড় সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা শেষ হয়ে গেল ১৯৫০ সালে যখন অল্প বয়সে অকালে আমাদের মায়া কাটিয়ে বিভূতিদা চলে গেলেন।

আর আমি তাঁর জীবৎকালে তিরিশ দশকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে সেই যে বঙ্গবাসী কলেজে যোগ দিয়েছিলাম, তাঁর মৃত্যুর কিছু পরে আবার বঙ্গবাসীর অধ্যাপনা ছেড়ে ছুটি নিয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর আহ্বানে ধনবিজ্ঞানের "বাটা চেয়ার"-এর অধ্যাপক হিসাবে। তাই আমার নিজের শৈশব-কৈশোরের এবং প্রথম যৌবনের সুখদুঃখের দিনগুলোর কথা মনে হবার সঙ্গে-সঙ্গে বিভূতিদার স্মৃতি ফিরে-ফিরে আসে। বারে-বারে মনে পড়ে বহু দিনের বহু স্থানের ঘটনা এবং সযত্নলালিত না-বলা যত বিচিত্র কথা আর কাহিনী, যারা শেষ হয়েও ফুরোত না। যাঁর ভালোবাসা ছিল শুধু অনুভবের বস্তু, যেসব স্মৃতি কেবল আমার অন্তরেই সঞ্চিত আছে, এবং যা স্মরণে এলে চিত্ত কী এক বেদনায় ভরে যায়, হাসি অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে—গুছিয়ে ঠিক-ঠিক সেসব প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। বিভূতিদার কাছে যা পেয়েছিলাম তা ছিল নিজের সহোদর ভায়ের মতো স্নেহ আর সুযুক্তি, বন্ধুর মতো বিশ্বাস আর প্রশংসা, দরদির মতো প্রেম আর সাহচর্য, সরল মানুষের উদার প্রাণের পাবক স্পর্শ আর আন্তরিক সহানুভূতি। সেসব দু-এক কথায় বোঝানো যায় না। বার্ধক্যের শেষ দিনগুলিতে পৌঁছে গিয়ে এখন টের পাওয়া যাচ্ছে, এই জীবনের একক এবং ব্যক্তিগত নানা ধরনের অভিজ্ঞতা, বিস্ময়, হর্ষ আর বেদনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে বিভূতিদাকে একান্ত কাছে থেকে নিজের করে পাবার যে আনন্দ, আর চিরতরে হারাবার যে হাহাকার।

ছোটোবেলায় বিভূতিদার কাছে এসে যা সবচেয়ে

ভালো লাগত তা হল তাঁর বাক্‌পটুতা, বর্ণনানৈপুণ্য, বিবিধ ধরনের বিজ্ঞান, ভূগোল, এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, তাঁর গভীর বিস্ময়বোধ, সাধারণ পাড়াগাঁয়ের বন্য প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, আর প্রাণের সংবেদনশীল সহমর্মিতা এবং অদম্য ভ্রমণপিপাসা। এইসব দেখে-দেখে এবং তাঁর পোশাকে-আশাকে ঢিলেঢালা ঔদাসীন্য আর ভোজনে নিমন্ত্রণে একই সঙ্গে আসক্তি এবং অনাসক্তির বৈপরীত্য লক্ষ করে করে আমি একই কালে তাঁর অনুগত ছাত্র, অনুজ সহোদর, শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত, এবং গুণগ্রাহী বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর সাহিত্য আমি কিভাবে বুঝতাম বা বুঝি তা বলার স্থান এখানে নেই। কিন্তু মানুষটাকে যে ভাবে দেখেছিলাম, বুঝেছিলাম, সেই কথাগুলোই বলতে ইচ্ছা করে।

আমার সেই আকাশছোঁয়া বহুবিধ বাসনা-কামনার দিনগুলিতে সবচেয়ে যা আমাকে তাঁর কাছে টানত তা হল তাঁর গ্রাম্য সরলতা; অনেক গুরুতর বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষি এবং অবাক-করা আচরণ; নিজের সাহিত্যকীর্তি যে কত বড়ো তা বুঝেও না বোঝা; সাংসারিক সামাজিক সাফল্যের আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি একান্ত ঔদাসীন্য এবং অনীহা, উদার বন্ধুর মতো উজাড় করা অন্তরের প্রীতি আর প্রণয়। 'আরে, এসো এসো' বলতে-বলতে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নেওয়া, মাদুরের কোনায় কাগজ, বই, দেশী-বিদেশী সাময়িক পত্রিকার স্তূপ সরিয়ে রেখে হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেওয়া, এবং সঙ্গে-সঙ্গে কুশলজিজ্ঞাসা—'তারপর, কেমন আচো?' এই 'কেমন আচো' প্রশ্নটি একদিন পরে-পরে দেখা হলেও তাঁর জিজ্ঞাসা করা চাই। আর থেকে-থেকে কথার মাত্রাই ছিল, 'আকাইপুরে আবার একবার যেতে হবে, বুঝলে।' বাক্যালাপ এইভাবে যে শুরু হল তো আর অন্য খেয়াল নেই। সকালে যে-যে দিন যেতাম, তাঁর স্কুলে পড়াতে যাবার সময় হলেই অবশ্য উঠে স্নান করতে যেতেন, আর নীচের তলায় দু-বালতি জল মাথায় ঢেলেই গামছা দিয়ে গা মুছতে-মুছতে উপরে উঠে এসে আমার সামনেই বারান্দায় খেতে বসতেন। আমি ঠায় বসে থাকতাম। অন্য সময় হলে, বিশেষত সন্ধ্যাবেলায় গেলে খেয়াল হত আমার নিজের, রাত আটটায়—ভোলা সিং রিপন হসটেলের গেট বন্ধ করে দেবে।...ঘরে ঢুকতেই বিভূতিদা তাঁর সেই ছোট্ট স্যুটকেসের ওপরে বসানো তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি সরিয়ে রাখতেন আর তারপর চলত গল্প আর গল্প। অনেক সময় সেসব গল্পের বিশেষ মাথামুণ্ডু বুঝবার উপায় থাকত না। আচমকা নানা ধরনের প্রস্তাব করে বসতেন যার সংখ্যা এখানে গুনে-গুনে বলা যাবে না। কত কথাই না মনে পড়ে। দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তখন আমি কলেজের সবে প্রথম বার্ষিক আর্টস ক্লাসের ছাত্র। তখনকার দিনে স্কুলের থার্ড ক্লাসের (বর্তমানের ক্লাশ এইট্-এর) বার্ষিক পরীক্ষার পরই পিতৃহীন হয়ে কোনো গতিকে ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে মানুষ হচ্ছি। একদিন গিয়েছি বিভূতিদার মেসে। মাদুরের ওপর বসবার খানিক পরই দেখি মানচিত্র আর ছবি খুলে কী সব লিখছেন। লেখা থামিয়ে আমায় হঠাৎ বললেন, 'চলো, আফ্রিকা বেড়িয়ে আসি।' আমি বললাম 'ভালো রে ভালো! আমি টাকা কোতায় পাব? আপনি তো ফিরে এসে লিখে খরচা উসুল করে নেবেন।' তাই শুনেই সেই পরিচিত সরল হাসি হেসে আমাদের যশোহর জেলার গ্রাম্য উচ্চারণে বললেন 'তা যা বোলোস।' অন্যান্য ঘটনার মধ্যে যেসব বাস্তব প্রস্তাব থাকত তার উল্লেখ এবার দু-একটা করি: সেদিন যেতেই বললেন, 'চলো, আজ বিকেলে গারস্টিন প্লেসে। সজনী দাসের সঙ্গে আজ সন্ধের পর পরলোক নিয়ে আলোচনা আছে।' সেদিনের সেই বেতারকেন্দ্রের কী অবস্থা ছিল আর ব্রডকাস্টিং কিভাবে হত এবং হল—সেই চাক্ষুষ দেখাটা ছিল আমার জীবনে প্রথম এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।...আর-একদিন বললেন, কাল সকাল-সকাল হসটেল থেকে খেয়ে এসো, আমি তোমায় খেলাৎ ইন্‌সটিটিউশানে নিয়ে যাব। গেলাম। সে আর-এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এইরকম অনেক ঘটনা, অনেক কথার স্মৃতি জমে আছে। কত-কত সময় এমন হয়েছে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নামছেন, আমি উঠছি, মাঝপথ থেকেই বললেন, 'চলো, নামো, আজ তোমায় এক জায়গায় নিয়ে যাই।' এইভাবে সেসব দিনে কত দ্রষ্টব্য বস্তু দেখানো—কখনও মেসবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশের গ্রহনক্ষত্র চিনিয়ে দেওয়া, কখনও বা দেশের বাগানে বনে মাঠে গাছফুললতা দেখিয়ে বুঝিয়ে বলা, পথের পাশের ঝোপঝাড় আগাছা থেকে পাতা তুলে ফুলের কুঁড়ি হাতে নিয়ে তার গঠনশৈলী ব্যাখ্যা করা—বিশেষ করে অনাদৃত অগোছালো গ্রাম্য প্রকৃতির রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবার অক্লান্ত চেষ্টা, এবং তার সঙ্গে এক ধরনের অশরীরী রোমানটিক অনুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করা।

তাঁর সে ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়: তাঁর বাগবৈদগ্ধ্য, গল্পের আঙ্গিক, বর্ণনার কলাকৌশল, প্রকৃতির সৌন্দর্য কথায় এঁকে হাতের আঙুল দিয়ে কাল্পনিক রেখা কেটে-কেটে বোঝাবার ক্ষমতা আর রিনরিনে কণ্ঠস্বরে অনর্গল কথা বলে-বলে থেমে অবশেষে মধুর সরল হাসি। আর সবশেষে আমার মন্তব্য শুনে মৃদুমন্দ হেসে মোক্ষম কথাটি উচ্চারণ করা: 'যা বোলোস্'—অর্থাৎ যা বলেছি একেবারে ঠিকই বলেছি। এইসব ব্যাপার, এই ব্যবহার আমাকে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে দিত। অবশ্য সেকস নিয়ে থেকে-থেকে যে আলোচনা আর যে অনুভূতির বাক্যবিনিময় হত তা বলার স্থান এটা নয়। ...সেই আমার প্রথম যৌবনের বছরগুলো!...সব মিলে তখনকার সেই মৃতদার পূর্ণযুবক বিভূতিভূষণের জীবনচর্যা, আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, দেশবিদেশের সাহিত্য আর ভ্রমণকাহিনীর আলোচনা আমার মনের উপরে থেকে-থেকে এক ধরনের গভীর প্রভাব বিস্তার করত।

অনেক দিনের অনেক ছোটোখাটো ঘটনার ভেতর থেকে মাত্র দু-একটি উদ্ধার করে এখানে কিছু বলব—বারাকপুর আর আকাইপুরের কেবল দুদিনের ঘোরাঘুরির টুকরো ছবি আংশিকভাবে অক্ষম হাতে আঁকবার চেষ্টা করব। একদিন বারাকপুরে আর অন্যদিন আকাইপুরে। সেসব দিনগুলিতে বেড়াতে-বেড়াতে যে অভিজ্ঞতা, যে উচ্ছ্বাস, যে ভাবৈশ্বর্যের স্মৃতি মনের মঞ্জুষায় মণিকাঞ্চনের মতো আজও ঝলমল-ঝলমল করে ওঠে তারই মাত্র এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের বিবরণ দেওয়া সম্ভব। এ যেন হারিয়ে-যাওয়া সেই বছরগুলির স্মৃতির ঝরা বকুলফুলগুলি, যার দু-চারটি কুড়িয়ে তুলে মালা গাঁথার চেষ্টা। যে মালা শুকোলেও গন্ধ ঢালে।...বারাকপুর মানে "পথের পাঁচালী"র নিশ্চিন্দিপুর। সেখানে যাওয়া এবং সেখান থেকে চার মাইল মানে প্রায় সাত কিলোমিটার্ব দূরে আমার গ্রাম আকাইপুরে আসা, আবার আকাইপুর থেকে সেখানে এগিয়ে দেওয়া, আর এগিয়ে আনা—অনেক অনেক দিন ধরে যাওয়া আর আসা,—আসা আর যাওয়া—এর শেষ ছিল না। সময়ের হিসাবে এই আসাযাওয়ার বিরাম ছিল না। বিশেষ করে তিরিশের দশকে। এবং তারপরও মাঝে-সাঝে সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত। এখানে এখন বারাকপুরের কথা বলি। সেদিন সেই একসঙ্গে বাঁওয়ের ধারে বেড়ানো, সেই ইছামতীতে স্নান, পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটা, পোড়োবাড়ির ভাঙা রান্নাঘরের রোয়াকে পাশাপাশি বসে ডালভাত ডাঁটাচচ্চড়ি সোনা-হেন মুখ করে খাওয়া, বিলবিলের পশ্চিম-উত্তরে বকুলতলায় হাতল-ভাঙা নড়বড়ে চেয়ারে বসে গল্পের পর গল্প। হাতের বই হাতেই রইল। গল্পের আর শেষ নেই। আজ এসবই মনে পড়ছে। একদিনের দুপুর আর তার একটু পরেই যা ঘটল সেই ঘটনার কথা বলব। কিন্তু বলবার আগেই মনে যে প্রশ্নটা উঠছে তাই আগে বলি: গ্রাম্য সম্পর্ক এবং বংশপরম্পরায় আত্মীয়তার নৈকট্যের কথা সরিয়ে রেখে ভাবতে গেলে আমি আজও অবাক হই যে, সেদিনে একজন যিনি অত বড়ো দিগ্বিজয়ী এক সাহিত্যিক, আর অন্যজন মাত্র কলেজে পড়া এক সদ্য-তরুণ, তাকে তিনি সত্যি করে ভালো না বাসলে তাঁর নিজের জীবনের সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে কেমন করে কখন কোথায় স্থান পেয়েছিল সেই বিষয়টি নিয়ে কথার টুকরো-টুকরো অংশ বিভিন্ন সময়ে আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য অমন খোলা মনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কি? সেদিন ইছামতীতে স্নান সেরে পুঁটিদিদির বাড়ি ফিরছি। স্বর্গত মহানন্দ জ্যাঠামশায়ের অর্থাৎ বিভূতিদার পিতৃদেবের বাস্তবাড়ি তখন ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। ছায়ানিবিড় আমবাগানের ভেতর দিয়ে খিড়কির সুঁড়িপথে ভিজে কাপড়ে ফিরে আসছি দুজনে। আমি আগে, তিনি পরে। হঠাৎ পিছন থেকে আমার গায়ে জড়ানো ভিজে গামছা টেনে ধরে আচমকা থামালেন। থামিয়েই এগিয়ে এসে পিছন থেকেই আমার বাঁ পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আমার বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে তাঁর ডান হাত উঁচু করে সামনের বড়ো ঝাঁকড়া আমগাছটার উপর-ডালে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওই-যে, ওই দেখচ? ওই আমগাছটার তেকাটা ফেকড়ি ডালটা দেখতে পাচ্চ? ওই-যে দুটো তেরচা ডালের ফাঁক, তার ভেতর দিয়ে খোলা আকাশটুকু দেখা যাচ্চে, লক্ষ করচ? ঠিক এইখানে—এই যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আচি—আমার ছেলেবেলায় একদিন হল কি, এমনি আজকের মতো ভিজে কাপড়ে ইছামতী থেকে স্নান সেরে ফিরে আসচি, আসতে-আসতে এই জায়গাটায় এসেই ওপরের ওই ফেকড়ি ডালটার দিকে চোখ পড়ল; পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম—দাঁড়িয়েই রইলাম, বুঝলে,—আমি নড়তেও পারি নে আর চোখ ফেরাতেও পারি নে।' আমি এই শুনে বাঁ পাশ ঘুরে তাঁর সামনাসামনি মুখ রেখে দেখি বিভূতিদা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

তাই দেখে আমি তাঁর চোখে চোখ রেখে বললাম: 'অপুরও তো একদিন এমনটিই হয়েছিল, তাই না?' বিভূতিদা একটু যেন হাঁপাচ্ছিলেন, সামান্য জিরিয়ে মুখ নীচু করে আবার মাথা তুলে সরল হাসি হেসে বললেন, 'ঠিক—ঠিক ধরেছ, তুমি।' কিন্তু এই কথা শোনার পরই বিভূতিদা আমাকে আর ছাড়তে চাইলেন না, ভুলে গেলেন আমরা ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে রয়েচি, এবং ফিরে গিয়ে ভাত খাব। তখন দুপুর প্রায় সাড়ে বারোটা একটা বেজে গিয়েছে। বললেন, 'চলো, এখুনি তোমাকে একটা বিউটি স্পট দেখিয়ে আনি।' আমি সলজ্জ হাসি হেসে বললাম, 'সইমা, জগো, পুঁটিদি এঁরা সব বসে আছেন, আগে খেয়ে নিয়ে তারপর বেরুলে হয় না?'

খেয়ে উঠতে যা দেরি। সে মানুষের যেন তর সয় না। জ্যৈষ্ঠের সেই কাঠফাটা রোদ্দুরে বারাকপুরের কুঠির মাঠের বনেজঙ্গলে নিয়ে গেলেন। শেয়াকুল, বাবলাকাঁটা আর বৈঁচিবনের বেড়াজাল এড়িয়ে, বিচুটি ভাটুই কাঁটানটে ও ঘাস খড় আর শুকনো সোঁদালি চারার গোঁজা ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে দুজনে এদিক ওদিক টো-টো করে ঘুরতে লাগলাম। অবশেষে একটা ঘন বনের ভিতর নাটালতার ঝোপের মধ্যে মাথা নীচু করে গা বাঁচিয়ে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন: 'এইখানটা দিয়ে গুঁড়ি মেরে এসো, এই দিকে।' ভেতরে ঢুকতেই আদেশ হল: 'ওই যে ওদিকের ওই মোটা গুলঞ্চ-লতাটা দেখছ, ওইটে ধরো, ধরেচ? এবার নীচের গাঁথনির ধাপে পা রাখো।' বলতে-বলতে নিজেই আগে খাদের নীচে তরতর করে নামলেন। হাত বাড়িয়ে উঁচু করে বললেন: 'এদিকে, এই-যে, এবারে আমার হাত ধরো, ধরে ওখান থেকেই লাফ দাও, নীচের চৌবাচ্চায় নেমে এসো।' দিলাম লাফ এবং নেমে পড়লাম খাদের গভীরে। তখন থেকে প্রায় একশো বছর আগেকার নীলকুঠিয়াল সাহেব-দের সবিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের উত্তপ্ত জলে চুবিয়ে রাখার ফলে নীলের চারাগুলো ভিজে-ভিজে গাঁজিয়ে উঠবার পর যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে আলোড়ন করার ফলে নিষ্কাষিত যত রস থিতিয়ে গাঢ় হয়ে সব নীচের চৌবাচ্চায় যেখানে নীল রঙের পলি স্তরে-স্তরে জমে উঠত, সেই শান-বাঁধানো গুহাঘরের মতো মাটির গভীরে বৃহৎ চৌকো চৌবাচ্চার নীচে নেমে পড়লাম। যেন ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখানোর একটা শহুরে কৃত্রিম জলের আধার (সুইমিং পুল)। উপরে তাকিয়ে দেখি নেমে এসেছি প্রায় একতলা-সমান নীচু খাদে। পাশাপাশি দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। বিভূতিদা বুঝিয়ে বলছেন, উঁচু-নীচু পাশাপাশি চৌবাচ্চাগুলো নির্মাণের প্রয়োজন এবং কৌশল। বোঝাতে গিয়ে ক্রমশ নিজেই নিজের ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাঁর ক্লান্তিবিহীন ইতিহাসের বর্ণনা-ও-ব্যাখ্যারত সস্মিত আত্মস্থ মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। মাথার উপরে ছিল নাটাফল, বনসীম আর গোলাপি পাকা নোনা: দুলছিল ঝুলন্ত মেটে আলুর ফল, সিঁদুরের মতো পাকা তেলাকুচোর আর হিঙ্গুল রঙের মাকাল ফল, ছড়িয়ে ছিল নীল অপরাজিত ফুল, লতামঞ্জরী আর গুলঞ্চলতা এবং নোনাগাছের কচি-কচি পাতায়-পাতায় ছাওয়া ছায়াঘন মণ্ডপ। প্রবাহিত হচ্ছিল চতু-র্দিকে বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের সুগন্ধ, পায়ের নীচে ছিল শুকনো ঝরাপাতায় আকীর্ণ পরিত্যক্ত নীল-কুঠির লাল সুরকির চাতাল। সেই ঝাঁ-ঝাঁ ঠিক-দুপুরে নিশ্চিন্দিপুরের শান্ত ঘুম-ঘুম নিঝুম প্রকৃতির কোলে ঘুঘু-ডাকা একান্ত নির্জনে সময় যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই মধুর অলস রোমাঞ্চিত শান্তির নিভৃত আলয়ে সুদূর অতীত যেন বিভূতিদার মুখে কথা বলছিল। বিগত শতাব্দীর কুঠিয়াল সাহেবদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের গল্প শুনছি। গয়ামেমের দরদি স্রষ্টা আমার সামনে দাঁড়িয়ে যেন ইতিহাসের পাতা উলটে মহাকালের পরদা সরিয়ে আমাকে ধীরে-ধীরে নিয়ে যাচ্ছেন ভিন্ন এক কল্পনা-সৃষ্ট জগতে। তিনি যেন চাইছিলেন আমি চলে যাই এক বিশেষ ভাবানুভূতির রাজ্যে, যেন এক আশ্চর্য দিব্য চোখ মেলে পৌঁছে যাই সেই অতীতের কলস্রোতা ছায়াভরা ইছামতীর কালো জলের তীরে-তীরে; কাশফুল, বন্যে-বুড়ো, শিরীষ, শিমুল, সাঁইবাবলার রহস্যঘেরা বনমর্মরের অন্তঃপুরে।

বিভূতিদা হয়তো চেয়েছিলেন আমিও তাঁর মতো, তাঁর মানস-প্রতিভূ অপুর মতো, রোমানটিক কল্পনার রাজ্যে ও প্রকৃতির চিরন্তন গোপন রহস্যের অন্দর মহলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যেন কবি হয়ে যাই। কিন্তু একজন কি আর একজনের মনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে? গড়ে দিতে পারে কি অন্যের জীবনের পথ? তাই তো সেদিনের বিভূতিভূষণের সাথী সেই যুবকের পথ চলে যায় নি অপুর মতো সোনাডাঙার মাঠ চিরে, বেত্রবতীর ঘাট পেরিয়ে, দূর থেকে সুদূরের রোমানটিক মিসটিক রহস্যের সন্ধানে। সেই যুবকের জীবনের পথ নির্মিত হয়েছিল ভিন্নভাবে বিভিন্ন উপাদানে। তার জীবনজিজ্ঞাসা বিশ্ববীক্ষা ভিন্নতর হয়ে রূপ পালটে-পালটে বারেবারে ধরা দিয়ে আবার অন্তর্হিত হয়ে পুনরায় ফিরে-ফিরে এসেছে নতুন রূপ ধরে। তবে এক জায়গায় বোধ করি কোথাও কোনো মিল ছিল, টান ছিল। বিভূতিভূষণের নিজের চোখে না-দেখা কিন্তু কেবল তাঁর কল্পনার সহায়ে এই পৃথিবীর চির বিস্ময়ের স্বপ্নপুরী প্রশান্ত মহাসাগরের অনুপম সৌন্দর্যের দেশ যে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে রসপিপাসু বিভূতিভূষণ বৃহত্তর পৃথিবীর রূপদর্শনে বুঝি ব্যর্থ বঞ্চিত হয়েই বিরহীর মতো অপুকে মেঘদূত করে কল্পনার স্বর্গে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়ে আমাদের মতো পাঠকদের মন অপুর জন্য, কাজলের জন্য চিরভারাক্রান্ত করে রেখে দিয়েছেন,—সেই দ্বীপপুঞ্জে, সেই ফিজি দ্বীপে, আমি আক্ষরিক অর্থে সশরীরে কোন দিন না কোন দিন যাব,—যাবই—এবং গিয়ে এক বিশেষ অর্থে অপুর খোঁজ করব—এই ছিল আমার দিনের চিন্তা, রাতের স্বপ্ন। কিন্তু মাঝখানে কিছুকাল অনিবার্য কারণে আমার গভীর প্রাণের আলো-অন্ধকারে সেই ভাবনা চাপা পড়ে ছিল। আর প্রথম যৌবনের ভয়ভাবনাহীন স্বপ্নভরা জীবনে ফিজি যাবার চিন্তাটিও ছিল বড়ো বেশি রোমানটিক এবং কিছুটা বা অস্পষ্ট। অনেক শোকদুঃখ, অনেক বাধা, শঠতা এবং প্রবঞ্চনার আঘাতে অন্তরের অন্তঃস্থল যখন কঠিন হয়ে উঠছে, তখনই আমি 'এলেম নতুন দেশে' রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। চোখ খুলে গেল। তারপর আশ্চর্য ঘটনা সব ঘটতে লাগল। হৃদয় থেকে একটা চেনা মানুষ যেন বেরিয়ে এল। আমি-আমি-আমি—এই অনেক আমির মাঝখানে একটা পুরনো দিনের চেনা আমি ধরা পড়ল।…সেদিন কোপাই নদীর তীরে ছায়াভরা আমবনে প্রথম দিনের আশ্রমের বিদ্যা-শিক্ষাভবনের যৌথ বন-ভোজনের আনন্দমুখর আয়োজন। পদযাত্রায় সমবেত সংগীত, গন্তব্যে পৌঁছে নৃত্যগীত হাসি গল্প খেলা কৌতুক। প্রথম পর্ব প্রাতরাশ শেষ করে একদিকে একা-একা কোপাই-এর বালুচরে নেমে গেলাম। হাঁটুজলে শীতের সকালে দেখলাম ইচ্ছামতীর কালো জল ছলছল চোখে আমার মুখে চেয়ে আছে। অতীত স্মৃতি গীতি হয়ে জেগে উঠল। আর তারপর একদিন কাণ্ডটা ঘটে গেল: শালবীথির দক্ষিণে বেলগাছের নীচে মোরাম-বিছানো মাটিতে ক্লাস বসেছে। ছাত্রছাত্রীরা যে যার বইখাতা কলম সামনে সাজিয়ে নিজের নিজের আসন বিছিয়ে বসেছে অর্ধবৃত্তা-কারে। বাঁধানো বেদিতে ঝুঁকে বসে সবার নাম ডেকে-ডেকে প্রথম দিনের আলাপ-পরিচয় চলছিল। শিক্ষা-ভবনের প্রথম বার্ষিক অর্থনীতির ক্লাস। এক-একজন ধরে-ধরে আসতে-আসতে পরবর্তী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর তুমি, তোমার নাম কী? তুমি কোথা থেকে এসেছ? ইংরাজীতে উত্তর দিল, 'সুন্দর সিং, ভিকি নওসোরি, স্যার।' 'ভিকি নওসোরি? সে কোথায় গো?' উত্তর হল, 'ফিজিআইল্যানডস্ স্যার?' 'ফিজি আইল্যানড্‌স্?' অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। সুন্দর শ্যামল সুপুষ্ট গড়ন, বলিষ্ঠ পেশীবহুল সুদীর্ঘ দেহ, কচি গোঁফের কোমল মুখখানিতে যৌবনের লাবণ্য এঁকে দিয়েছে। তাকিয়ে থেকে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখছিলামও। কিন্তু চোখ আমার এক নতুন চোখে তাকে দেখছিল। কী আশ্চর্য! সে হল ফিজি দ্বীপে প্রবাসী ভারতবর্ষের মানুষদের বংশধর—সে এসেছে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর শিক্ষা-ভবনে পড়াশুনা করতে সেই সুদূর ফিজি দ্বীপ থেকে? চকিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। এই ছেলে এসেছে সেই দেশ থেকে—সেই ফিজি থেকে যেখানে বিভূতিভূষণ অপুকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন?…অপু কাজলকে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে চলে গিয়েছিল। শৈশবে মাতৃহীন স্নেহবঞ্চিত অবোধ শিশু কাজল। মৃতদার অপুর একমাত্র মা-মরা ছেলে। দোয়েল পাখির মতো ডাগর-ডাগর দুটি চোখের সরল নিষ্পাপ চাহনি। ভালোবাসা না পেয়ে-পেয়ে কঠোর শাসনের বেড়াজালে আটকে বড়ো হতে-হতে শৈশবেই যখন জীবনের মুকুল ঝরে যায়-যায়, অনেকদিন পরে তখন বাবাকে পেয়ে নিবিড় নির্ভর সুখে অপুকে আঁকড়ে ধরে-ছিল। কলকাতা ছেড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে এসে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের আড়ালে দাঁড়িয়েছে। বাইশ বছর পরে গ্রামে ফিরে অপু তার বাল্যসঙ্গিনী রানুদির হাতে কাজলকে সঁপে দিয়েছে। মমতাময়ী পিসিমার কাছে মায়ের মতো স্নেহের স্পর্শ পেয়ে রজনীগন্ধার কচি ডাঁটার মতো নিদারুণ গ্রীষ্মের শেষে যেন নববর্ষার জল পেয়ে সে সতেজ হয়ে মুকুলিত হয়ে উঠেছে। নিজের ঠাকুরদাদা মৃত হরিহর রায়ের জঙ্গলে ঘেরা পোড়ো ভিটেয় উঠে মনের আনন্দে বনের মধ্যে পাখির বাসা খুঁজছে। বাবাকে এনে দেখাবে, বাবা বলবে, বাঃ! কাজল বড়ো ভালো ছেলে। দেখি, খোকা, কী পাখির বাসা এনেছিস রে!…সেই

কাজলকে না বলে লুকিয়ে একলা ফেলে রেখে নিষ্ঠুর বিবাগী উদাসী বৈরাগীর মতো অপু চিরতরে চলে গেল—কোথায় গেল যে, বলেও গেল না।…"অপরাজিত" গ্রন্থ এইখানে শেষ করে পাঠকের অনেক আশার ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে গেছেন বিভূতিভূষণ।…

একটা কালো পরদা যেন চোখের সমুখ থেকে সাঁ করে সরে গেল। সুন্দর সিং-এর দিকে চেয়েই আছি। একটা পল প্রহরে পরিণত হল। স্মৃতির চিত্রপটে নির্বাক ছায়া-ছবির মতো সারি-সারি ফুটে উঠল একের পর এক অতীত দিনের ভাবমূর্তি: বারাকপুর, ইছামতী, আকাইপুরের পদ্মবিল, মীর্জাপুরের মেস, রিপন হস্টেল, রিপন কলেজে বিভূতিসংবর্ধনা—আশু, সুধীর,…আমি নাছোড়বান্দা প্রশ্ন করছি, 'অপুকে ফিজি থেকে ফিরিয়ে আনবেন তো? আনবেন তো? ঠিক বলছেন?' সেই প্রতিশ্রুতি, সেই হাসি, সেই গল্প, অনুষঙ্গ, সঙ্গ, সুখদুঃখের কথা, ভ্রমণ, সাহিত্যের তর্ক, অপুদুর্গাকাজলকে ঘিরে কতদিনের কত আলোচনা অনুযোগ অভিযোগ—স্মৃতির গভীরে মন তলিয়ে গেল। মনে হল সব স্বপ্ন। এসব কোনোদিন ঘটে নি। আর তখনই সেই অবাককরা দৃশ্যটা: খোলা চোখে কী করে জানি নে কি যেন দেখলাম বেলগাছের নীচে যেখানে ক্লাস বসেছিল তারই দক্ষিণে সন্তোষালয়ের ময়ূর-ময়ূরীর খাঁচার পাশে ভাবের ঘোরে যেন দেখতে পেলাম সুন্দর সিং-এর পিছন দিকে ছায়ানিবিড় বিশাল বটগাছটার আড়ালে বিভূতিভূষণ যেন অপুকে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। আবার বাস্তবে ফিরে আসতে হল। নমো-নমো করে প্রথম দিনের ক্লাস সাঙ্গ করে উঠে পড়লাম। যেন একটা নেশার ঘোরে সময় কাটতে লাগল।…

'বুঝলে হে, করুণা, বেঁচে থাকা একটা আর্ট।' বিভূতিদা এই কথাটি প্রায়ই বলতেন। সেই আর্টটা যে কী, নিজের জীবনে কখনও বুঝে উঠতে পারি নি। সেই 'আর্ট' আয়ত্ত করব ভেবেও কোন ফল হয় নি। সে কৌশলটি যে কী, তা জানতে, বুঝতে বহুদিন কেটে গেছে। কালের চক্রে অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ফুলফোটানো ফলঝরানো হাসিকান্না হীরাপান্নায় জড়ানো ঊষর-উর্বর চলার পথে-পথে ছিয়াত্তর বছরে পৌঁছে গিয়ে এইটুকুই শুধু বোঝা গেল যে, অপুর মতন পথের পাঁচালীর গান আমার কণ্ঠে নেই, আমার শেষ পারানির কড়ি যে কী তাও ঠিক বুঝিনি। থেকে-থেকে শুধু অন্য একটা জিনিস টের পাই, গভীরভাবে অনুভব করি যে, বিভূতিদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বছর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুর বছর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই গোটা দুই দশক ধরে সেইসব নিবিড় সাহচর্য-পরম্পরাগুলি মনের মুকুরে যখন প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সুদূর নিরালা নির্জন থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কণ্ঠে আমার কানে কানে যেন কে শুনিয়ে যায়: আমার কথা কিছু বলো—কিছু বলো।…

কখনও-কখনও বুঝে দেখি,—বুঝতে গিয়ে মনে পড়ে—বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও অনেক কাল ব্যেপে, নিজের অজ্ঞাত সুদূর অতীতে প্রসারিত হয়ে আছে। সে হল বংশগত অর্থে, ঐতিহাসিক কালক্রম-পরম্পরায়। সে সম্পর্ক তিনপুরুষের সম্পর্ক—আকাইপুর এবং বারাকপুরের মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-রায় বংশের গোষ্ঠী-গত জ্ঞাতিসম্পর্কের আত্মীয়তা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক—যা আমার মা বলতেন শুনেছি। আর যা এখনকার সময়ে আমার তিন জ্যেষ্ঠ সহোদর সেজদা, মেজদা এবং বড়দাদা-দের কাছে শুনে-শুনে বহু বছর বহু দিন ব্যেপে আমার দিনলিপিতে একে-একে লিখে রেখেছি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। সেসব অতীতের কাহিনী যা গোপালহাটি, বারাকপুর, নওদা আর আকাইপুরের নীলকুঠির সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। এমন কি, তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় বিশ বছরের প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কাহিনীগুলো চুম্বকে ছক কেটে সংক্ষেপে বলাও এখানে সম্ভব নয়। এখানে শুধু বলব এবং একথা বারে বারেই বলতে হয় যে, তাঁর ভালোবাসা, বন্ধুত্ব—তাঁর আত্মভোলা জীবন যা কাছ থেকে অহরহ দেখেছি—সেই যে তাঁর জীবন, তাঁর জীবনের অনেক-অনেক অজ্ঞাত ঘটনা যা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে,—বিভূতিভূষণের জীবিত অবস্থার সেই ঘটনাগুলির চেয়েও বোধকরি তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী স্মৃতি আমার মনকে প্রভাবিত করেছিল, এবং করে রেখেছেও,—অনেকভাবে বেশি করে। গত সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে। বলতে চাইছি, প্রায় কুড়ি বছরের সাহচর্যের অদৃশ্য প্রভাব আমার মনের অগোচরে গভীর প্রাণে যা লুকিয়ে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরের ছত্রিশ বছর ব্যেপে তাঁর সেই ব্যক্তিসত্তার অশরীরী স্পর্শ থেকে-থেকে আমার ভাবনা, আমার চেতনা, আমার অনুভবকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—রেখেছেও। আমি জানি, হয়তো বুঝতে পারি, তাঁর বিদেশভ্রমণের পিপাসা কেবল তাঁর মুখের কথায় এবং লেখার ভিতরেই রূপ পেয়েছিল—সেই কথাটি মনে ভেবে-ভেবে আমি যতবার যখনই ভারতের বাইরে যাবার সুযোগ পেয়েছি, সেসব দিনে বারে-বারে তখনই আমার নিজের একক আনন্দের উপলব্ধি আর বিভূতি-চিন্তার কাতর করুণ রস মিলেমিশে এক মিশ্র অনুভব, এক বিধুর-মধুর পুলকিত ভাবনা আমাকে ঘিরে-ঘিরে রাখত। আর ভাবতাম, বিভূতিদা নিজে যদি এইসব দেখতেন, তা কি আর আমার চোখে দেখার মতো হত! সে হয়তো হত অন্য দিব্যদর্শনের মতো। তাই মনে মনে বলতাম আর খেদোক্তির মতো দিনলিপিতে লিখতাম, 'বিভূতিদা, আপনার মতো দেখবার চোখ যদি কেউ আমাকে দিত!' আর এই কথাগুলোই আমাকে যেন সতত চমকিত করে শুনিয়ে দিত,—না, বিভূতিদা আমার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছেন। তাই তো, চীনের প্রাচীরে উঠে বিভূতিদাকে দেখেছি, দেখেছি ঈফেল টাওয়ারে, পার্থেননে, মিশর-রোম-মেকসিকোর বিবিধ বিচিত্র গড়নের পিরামিডে-পিরামিডে। ফিজির তামাবুয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। যেখানে যাই সেখানেই বিভূতিদাকে মনে পড়ে। বস্টন থেকে ওয়েলেসলি হয়ে সেই AUDOBON 'উড স্যাংচুয়ারি,' সেই অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত কথাটি—"স্পয়েল ইঅরসেল্ফ উইথ অ্যা ভিজিট টু আনস্পয়েন্ট প্লেস" (spoil yourself with a visit to unspoilt place)—যার ভাবার্থ হল: এই অরণ্যে 'এই অরণ্যের নিজস্ব অভয়ারণ্যে—যেখানে মানুষের হাতের ছোঁয়া লেগে প্রকৃতি কোন অর্থে কোনদিন দূষিত, লুণ্ঠিত হয় নি, এইখানে চলে এসো, এই অরণ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আপনাকে হারিয়ে ফেলো, নিজেকে লুণ্ঠন করে নাও।…তারপর সেখান থেকে আর-এক বিস্ময় সেই "ওয়াল্ডেন পণ্ড (Walden Pond) থোরো এঁর বিখ্যাত বনকুটির। য়ুরোপ হয়ে ঘুরে জাপানের পথে দেশে ফিরছি। সানফ্রান্সিস্কোর (MUIR WOODS) মুইর অরণ্যে প্রবেশ করে আর-এক বিস্ময়কর উপলব্ধি। গগনচুম্বী রেড উড মহাবৃক্ষের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঊর্ধ্বে চেয়ে যখন আকাশে মুখ তুলে বৃক্ষচূড়ার দিকে তাকালাম মনে পড়ল বিভূতিদার প্রকাশিত দিনলিপি "হে অরণ্য কথা কও" যেখানে তিনি নিজে লিখেছেন: আট ফুট পরিধি বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায় প্রায় ৫০/৬০ ফুট, বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে…ব্রহ্মশক্তি রয়েছে বিশ্বের সব তাতে। এইসব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু, (শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ, ২/১৭) কি হবে?'…হায়! না জানি মুইর অরণ্যে সংরক্ষিত বিশাল মহান রেডউড মহাবৃক্ষগুলি দেখলে বিভূতিদা কী করতেন। আর ফিজিতে সত্যিই যদি যেতেন? আর সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের রূপ দেখতেন। সে রূপ দেখলে, মনে ভাবি, তিনি আর হয়তো ঘরে ফিরতে পারতেন না। সেই কোরো সাগর অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউগুলি বহু-বহু সুদূর থেকে সবেগে যেন উদ্যত বিপুল বিস্তৃত দুই বাহু প্রসারিত করে ছুটে-ছুটে আসছে—আসছে এসে-এসে প্রবলপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে আছড়ে পড়ছে—আছড়ে পড়ছে—চিরকাল, চিরকাল, চিরকাল। সেই আসছে, আর ভাঙছে, আসছে আর ভাঙছে,—ফুঁসে গর্জে অনন্তনাগের সহস্র ফণা মেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকসাট খাচ্ছে, আর নিরুপায় হয়ে তরঙ্গগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ জলকণাসমষ্টি বাষ্পরাশিতে পরিণত হচ্ছে। স্তরে-স্তরে পুঞ্জে-পুঞ্জে ঊর্ধ্বগগনে উঠে যাচ্ছে। উষার আলোয় প্রভাতের রবি কিরণ ফেলে মুহুমুহু রঙ পালটাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিমুগ্ধ চিত্তে বিভূতিস্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে-হয়ে যেন সৌর বর্ণালীর বিচিত্র রূপের ছটায় ফুটে-ফুটে উঠছিল। সেই আমার বিভূতিভূষণের স্মৃতিপরম্পরা। আবারও বলি: সেই আবেগ, ভালোবাসা, সেই হৃদয়ের অনুভব, যার ছোঁয়া লেগে বাস্তবের ধূলির্ধোঁয়া ক্লেদগ্লানির পঙ্ককুণ্ড থেকে মনটা যেন আজকের জেটশক্তি-চালিত হয়ে মুক্তির মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হত। আবার অন্যদিকে অন্য-অন্য সময়ে যত সব খ্যাপামি, দুজনের যত ছেলেমানুষি অর্থহীন কথাবার্তা, পাগলের মতো গ্রাম্য কথার পুনরাবৃত্তি—যেসব কথা হাসিতে খুশিতে রূপান্তরিত হয়ে যৌবনের সেই গৌরবের দিনগুলিতে নির্ঝরের জল-ধারার মতো ঝরে-ঝরে পড়ত।

আরও আগের কথায় ফিরে যাই। বিভূতিদার সেই স্নেহমমতা, সপ্রেম আন্তরিকতা, গল্পের ছলে সুদূরের চিন্তায় মনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, পাশাপাশি হাঁটা, চলাফেরা, বেড়াতে যাওয়া, গল্পের প্লট শুনতে-শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। অসংখ্য ঘটনার সেইসব পুরনো দিনের স্মৃতির রেখা—টুকিটাকি কথা, সংলাপের পরিবেশ আর পরিস্থিতি—সেসব মনে পড়লে আজও যেন সেই সময়কার নির্ভাবনার

কাজলকে না বলে লুকিয়ে একলা ফেলে রেখে নিষ্ঠুর বিবাগী উদাসী বৈরাগীর মতো অপু চিরতরে চলে গেল—কোথায় গেল যে, বলেও গেল না।…"অপরাজিত" গ্রন্থ এইখানে শেষ করে পাঠকের অনেক আশার ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে গেছেন বিভূতিভূষণ।…

একটা কালো পরদা যেন চোখের সমুখ থেকে সাঁ করে সরে গেল। সুন্দর সিং-এর দিকে চেয়েই আছি। একটা পল প্রহরে পরিণত হল। স্মৃতির চিত্রপটে নির্বাক ছায়া-ছবির মতো সারি-সারি ফুটে উঠল একের পর এক অতীত দিনের ভাবমূর্তি : বারাকপুর, ইছামতী, আকাইপুরের পদ্মবিল, মীর্জাপুরের মেস, রিপন হস্টেল, রিপন কলেজে বিভূতিসংবর্ধনা—আশু, সুধীর,…আমি নাছোড়বান্দা প্রশ্ন করছি, 'অপুকে ফিজি থেকে ফিরিয়ে আনবেন তো? আনবেন তো? ঠিক বলছেন?' সেই প্রতিশ্রুতি, সেই হাসি, সেই গল্প, অনুষঙ্গ, সঙ্গ, সুখদুঃখের কথা, ভ্রমণ, সাহিত্যের তর্ক, অপুদুর্গাকাজলকে ঘিরে কতদিনের কত আলোচনা অনুযোগ অভিযোগ—স্মৃতির গভীরে মন তলিয়ে গেল। মনে হল সব স্বপ্ন। এসব কোনোদিন ঘটে নি। আর তখনই সেই অবাককরা দৃশ্যটা : খোলা চোখে কী করে জানি নে কি যেন দেখলাম বেলগাছের নীচে যেখানে ক্লাস বসেছিল তারই দক্ষিণে সন্তোষালয়ের ময়ূর-ময়ূরীর খাঁচার পাশে ভাবের ঘোরে যেন দেখতে পেলাম সুন্দর সিং-এর পিছন দিকে ছায়ানিবিড় বিশাল বটগাছটার আড়ালে বিভূতিভূষণ যেন অপুকে হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে উঠে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। আবার বাস্তবে ফিরে আসতে হল। নমো-নমো করে প্রথম দিনের ক্লাস সাঙ্গ করে উঠে পড়লাম। যেন একটা নেশার ঘোরে সময় কাটতে লাগল।…

'বুঝলে হে, করুণা, বেঁচে থাকা একটা আর্ট।' বিভূতিদা এই কথাটি প্রায়ই বলতেন। সেই আর্টটা যে কী, নিজের জীবনে কখনও বুঝে উঠতে পারি নি। সেই 'আর্ট' আয়ত্ত করব ভেবেও কোন ফল হয় নি। সে কৌশলটি যে কী, তা জানতে, বুঝতে বহুদিন কেটে গেছে। কালের চক্রে অর্ধ-শতাব্দী পার হয়ে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ফুলফোটানো ফলঝরানো হাসিকান্না হীরাপান্নায় জড়ানো উষর-উর্বর চলার পথে-পথে ছিয়াত্তর বছরে পৌঁছে গিয়ে এইটুকুই শুধু বোঝা গেল যে, অপুর মতন পথের পাঁচালীর গান আমার কণ্ঠে নেই, আমার শেষ পারানির কড়ি যে কী তাও ঠিক বুঝিনি। থেকে-থেকে শুধু অন্য একটা জিনিস টের পাই, গভীরভাবে অনুভব করি যে, বিভূতিদার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের বছর ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুর বছর ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত এই গোটা দুই দশক ধরে সেইসব নিবিড় সাহচর্য-পরম্পরাগুলি মনের মুকুরে যখন প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সুদূর নিরালা নির্জন থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কণ্ঠে আমার কানে কানে যেন কে শুনিয়ে যায় : আমার কথা কিছু বলো—কিছু বলো।…

কখনও-কখনও বুঝে দেখি,—বুঝতে গিয়ে মনে পড়ে—বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও অনেক কাল ব্যেপে, নিজের অজ্ঞাত সুদূর অতীতে প্রসারিত হয়ে আছে। সে হল বংশগত অর্থে, ঐতিহাসিক কালক্রম-পরম্পরায়। সে সম্পর্ক তিনপুরুষের সম্পর্ক—আকাইপুর এবং বারাকপুরের মুখুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-রায় বংশের গোষ্ঠী-গত জ্ঞাতিসম্পর্কের আত্মীয়তা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক—যা আমার মা বলতেন শুনেছি। আর যা এখনকার সময়ে আমার তিন জ্যেষ্ঠ সহোদর সেজদা, মেজদা এবং বড়দাদা-দের কাছে শুনে-শুনে বহু বছর বহু দিন ব্যেপে আমার দিনলিপিতে একে-একে লিখে রেখেছি। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। সেসব অতীতের কাহিনী যা মোল্লাহাটি, বারাকপুর, নওদা আর আকাইপুরের নীলকুঠির সম্পর্কে সম্পৃক্ত হয়ে কালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে। এমন কি, তাঁর সঙ্গে আমার প্রায় বিশ বছরের প্রত্যক্ষ সাহচর্যের কাহিনীগুলো চুম্বকে ছক কেটে সংক্ষেপে বলাও এখানে সম্ভব নয়। এখানে শুধু বলব এবং একথা বারে বারেই বলতে হয় যে, তাঁর ভালোবাসা, বন্ধুত্ব—তাঁর আত্মভোলা জীবন যা কাছ থেকে অহরহ দেখেছি—সেই যে তাঁর জীবন, তাঁর জীবনের অনেক-অনেক অজ্ঞাত ঘটনা যা আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেছে,—বিভূতিভূষণের জীবিত অবস্থার সেই ঘটনাগুলির চেয়েও বোধকরি তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী স্মৃতি আমার মনকে প্রভাবিত করেছিল, এবং করে রেখেছেও,—অনেকভাবে বেশি করে। গত সুদীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে। বলতে চাইছি, প্রায় কুড়ি বছরের সাহচর্যের অদৃশ্য প্রভাব আমার মনের অগোচরে গভীর প্রাণে যা লুকিয়ে ছিল, তাঁর মৃত্যুর পরের ছত্রিশ বছর ব্যেপে তাঁর সেই ব্যক্তিসত্তার অশরীরী স্পর্শ থেকে-থেকে আমার ভাবনা, আমার চেতনা, আমার অনুভবকে কিছুটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—রেখেছেও। আমি জানি, হয়তো বুঝতে পারি, তাঁর বিদেশভ্রমণের পিপাসা কেবল তাঁর মুখের কথায় এবং লেখার ভিতরেই রূপ পেয়েছিল—সেই কথাটি মনে ভেবে-ভেবে আমি যতবার যখনই ভারতের বাইরে যাবার সুযোগ পেয়েছি, সেসব দিনে বারে-বারে তখনই আমার নিজের একক আনন্দের উপলব্ধি আর বিভূতি-চিন্তার কাতর করুণ রস মিলেমিশে এক মিশ্র অনুভব, এক বিধুর-মধুর পুলকিত ভাবনা আমাকে ঘিরে-ঘিরে রাখত। আর ভাবতাম, বিভূতিদা নিজে যদি এইসব দেখতেন, তা কি আর আমার চোখে দেখার মতো হত! সে হয়তো হত অন্য দিব্যদর্শনের মতো। তাই মনে মনে বলতাম আর খেদোক্তির মতো দিনলিপিতে লিখতাম, 'বিভূতিদা, আপনার মতো দেখবার চোখ যদি কেউ আমাকে দিত!' আর এই কথাগুলোই আমাকে যেন সতত চমকিত করে শুনিয়ে দিত,—না, বিভূতিদা আমার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছেন। তাই তো, চীনের প্রাচীরে উঠে বিভূতিদাকে দেখেছি, দেখেছি ঈফেল টাওয়ারে, পার্থেননে, মিশর-রোম-মেকসিকোর বিবিধ বিচিত্র গড়নের পিরামিডে-পিরামিডে। ফিজির তামাবুয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে। যেখানে যাই সেখানেই বিভূতিদাকে মনে পড়ে। বস্টন থেকে ওয়েলেস্‌লি হয়ে সেই AUDOBON 'উড স্যাংচুয়ারি,' সেই অনবদ্য ভাষায় বর্ণিত কথাটি—"স্পয়েল ইঅরসেল্‌ফ, উইথ অ্যা ভিজিট টু আনস্পয়েল্ট প্লেস" (spoil yourself with a visit to unspoilt place)—যার ভাবার্থ হল : এই অরণ্যে 'এই অরণ্যের নিজস্ব অভয়ারণ্যে—যেখানে মানুষের হাতের ছোঁয়া লেগে প্রকৃতি কোন অর্থে কোনদিন দূষিত, লুণ্ঠিত হয় নি, এইখানে চলে এসো, এই অরণ্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে আপনাকে হারিয়ে ফেলো, নিজেকে লুণ্ঠন করে নাও।…তারপর সেখান থেকে আর-এক বিস্ময় সেই "ওয়াল্ডেন পণ্ড (Walden Pond) থোরো এঁর বিখ্যাত বনকুটির। য়ুরোপ হয়ে ঘুরে জাপানের পথে দেশে ফিরছি। সানফ্রান্সিস্কোর (MUIR WOODS) মুইর অরণ্যে প্রবেশ করে আর-এক বিস্ময়কর উপলব্ধি। গগনচুম্বী রেড উড মহাবৃক্ষের নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঊর্ধ্বে চেয়ে যখন আকাশে মুখ তুলে বৃক্ষচূড়ার দিকে তাকালাম মনে পড়ল বিভূতিদার প্রকাশিত দিনলিপি "হে অরণ্য কথা কও" যেখানে তিনি নিজে লিখেছেন : আট ফুট পরিধি বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায় প্রায় ৫০/৬০ ফুট, বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে…ব্রহ্মশক্তি রয়েছে বিশ্বের সব তাতে। এইসব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু, (শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ, ২/১৭) কি হবে?'…হায়! না জানি মুইর অরণ্যে সংরক্ষিত বিশাল মহান রেডউড মহাবৃক্ষগুলি দেখলে বিভূতিদা কী করতেন। আর ফিজিতে সত্যিই যদি যেতেন? আর সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের রূপ দেখতেন। সে রূপ দেখলে, মনে ভাবি, তিনি আর হয়তো ঘরে ফিরতে পারতেন না। সেই কোরো সাগর অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল ঢেউগুলি বহু-বহু সুদূর থেকে সবেগে যেন উদ্যত বিপুল বিস্তৃত দুই বাহু প্রসারিত করে ছুটে-ছুটে আসছে—আসছে এসে-এসে প্রবলপ্রাচীরে প্রতিহত হয়ে আছড়ে পড়ছে—আছড়ে পড়ছে—চিরকাল, চিরকাল, চিরকাল। সেই আসছে, আর ভাঙছে, আসছে আর ভাঙছে,—ফুঁসে গর্জে অনন্তনাগের সহস্র ফণা মেলে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকসাট খাচ্ছে, আর নিরুপায় হয়ে তরঙ্গগুলি ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ জলকণাসমষ্টি বাষ্পরাশিতে পরিণত হচ্ছে। স্তরে-স্তরে পুঞ্জে-পুঞ্জে ঊর্ধ্বগগনে উঠে যাচ্ছে। ঊষার আলোয় প্রভাতের রবি কিরণ ফেলে মুহুর্মুহু রঙ পালটাচ্ছিল আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিমুগ্ধ চিত্তে বিভূতিস্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে-হয়ে যেন সৌর বর্ণালীর বিচিত্র রূপের ছটায় ফুটে-ফুটে উঠছিল। সেই আমার বিভূতিভূষণের স্মৃতিপরম্পরা। আবারও বলি : সেই আবেগ, ভালোবাসা, সেই হৃদয়ের অনুভব, যার ছোঁয়া লেগে বাস্তবের ধূলিধোঁয়া ক্লেদগ্লানির পঙ্ককুণ্ড থেকে মনটা যেন আজকের জেটশক্তি-চালিত হয়ে মুক্তির মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হত। আবার অন্যদিকে অন্য-অন্য সময়ে যত সব খ্যাপামি, হুজনের যত ছেলেমানুষি অর্থহীন কথাবার্তা, পাগলের মতো গ্রাম্য কথার পুনরাবৃত্তি—যেসব কথা হাসিতে খুশিতে রূপান্তরিত হয়ে যৌবনের সেই গৌরবের দিনগুলিতে নির্ঝরের জল-ধারার মতো ঝরে-ঝরে পড়ত।

আরও আগের কথায় ফিরে যাই। বিভূতিদার সেই স্নেহমমতা, সপ্রেম আন্তরিকতা, গল্পের ছলে সুদূরের চিন্তায় মনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া, পাশাপাশি হাঁটা, চলাফেরা, বেড়াতে যাওয়া, গল্পের প্লট শুনতে-শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত। অসংখ্য ঘটনার সেইসব পুরনো দিনের স্মৃতির রেখা—টুকিটাকি কথা, সংলাপের পরিবেশ আর পরিস্থিতি—সেসব মনে পড়লে আজও যেন সেই সময়কার নির্ভাবনার

খুশিভরা মুক্তমনের ঘুমন্ত কিশোরটাকে জাগিয়ে তোলে; হাত ধরে অন্তর থেকে বার করে তুলে আবার অতীত দিনের কুঠির মাঠে ডেকে নিয়ে যায়। আর তখনই মনে হয় বুঝি-বা সেই কুঠির মাঠের বহু অতীতের নীলের চারা-ভেজানোর চৌবাচ্চার পাশে ইছামতীর তীরে ভিজে মাটিতে বসে পঞ্চাশ বছর আগে হয়তো কোন বিশেষ এক ধরনের মানসিকতার ছোট্ট কোনও বীজ নিজের অজ্ঞাতে আমার মনে উপ্ত হয়েছিল; সেই বীজ বিদীর্ণ হয়ে ধীরে-ধীরে হয়তো কোনও ভিন্ন ধরনের মননের আর জীবন-চিন্তার অঙ্কুর উদ্গত হয়ে লতিয়ে-লতিয়ে উঠে বড়ো অযত্ন-বিন্যস্ত গোপন কোনও আত্মানুভূতির ছায়া ফেলেছিল অখ্যাত এই লেখকের ধ্যানে আর কর্মে। যা তখন বুঝতে পারি নি।

এই জীবনের অভিজ্ঞতা-পরম্পরার সঙ্গে মিশে আছে বিভূতিদার যেসব ব্যক্তিগত স্মৃতি, এবারে আমার গ্রাম আকাইপুরের এক টুকরো ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু-এক কথা বলার চেষ্টা করব। প্রায় কুড়ি বছরের যাতায়াতের কথা তো একসঙ্গে বলা যায় না। একটি দিনের খণ্ডচিত্রের বর্ণনা করেই আজ শেষ করব।

সেবারে তখন গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। রিপন হসটেলে দিন গুনছি কলেজের ছুটি কবে হবে। মায়ের কাছে ফিরে যাব করে। দেখতে-দেখতে মায়ের চিঠি এল—'বাবা, বাড়ি এসো, আম নেবেচে' মানে, পেকেছে পেকে মাটিতে পড়েছে। 'বিভূতিকে সঙ্গে নিয়ে এসো।' চোখ বুজে স্পষ্ট দেখলাম, আমাদের বাগানে-বাগানে দেশী আর কলমের গাছে-গাছে দোলখাওয়া ঝুলন্ত আমগুলোর গায়ে এপিঠ ওপিঠ রঙ ফিরছে, কাঁচা ডাঁশা পাকা আম ডালে-ডালে ছেয়ে আছে। পাকা আমের গায়ে-গায়ে হলুদ কমলা সিঁদুর রঙের ছড়াছড়ি। লাল্‌সে পিঁপড়ের ভয়ে সারা গায়ে ছাই মেখে গাছে উঠে জাল-আকশি ভরে পাকা আম পেড়ে নিয়ে গাছে বসেই কতকগুলো খেয়ে-খেয়ে তলায় আঁটি ফেলছি আর বাকিগুলো একে-একে থলে ভরে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিচ্ছি। তারপর জোংড়া-বোঝাই গোরুর গাড়িতে আমের পর্বত ঠেলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে ফিরে সকাল বিকাল এক আসনে বসে এক-এক বারে চার-পাঁচ-ছ গণ্ডা আম পেট ভরে খেয়ে অলস ঘুমে দিন কাটছে।... চিঠি হাতে বিভূতিদার মিরজাপুর স্ট্রীটের মেসে গিয়ে সব বললাম। তাঁর স্কুল, খেলাৎ ইনস্টিটিউশান, কিছু দেরিতে বন্ধ হয়। রিপন কলেজ তার আগেই। কথা শেষ হলে বিভূতিদা বললেন, 'তা হলে ওই কথাই থাকলো, ওই সময়ে তুমি বারাকপুরে এসো। দুপুরে খেয়ে জিরিয়ে দুজনে আকাইপুরে যাব।' যথাসময়ে নির্দিষ্ট তারিখে ভোরে উঠে বারাকপুরে পৌঁছে খেয়ে জিরিয়ে সেখান থেকে দুজনে বিকালে জোরকদমে হেঁটে দু ক্রোশ রাস্তা দেখতে-দেখতে পার হয়ে এলাম। গোপালনগর, কানসোনা গ্রাম, কানসোনার মাঠ পেরিয়ে গলাকাটা পুকুরের কলাবাগান বাঁহাতে রেখে নওদা গ্রামের মধ্যে দিয়ে হনহন করে হেঁটে আকাইপুরের পদ্মবিলের ধারে বটতলার বড়ো ঘাঠের কাছে পৌঁছলাম যখন, তখন শেয়ালডাঙার মাঠের শেষে অস্তরবি দ্বারবাসিনীর সেগুনবাগানের আড়ালে হেলে পড়েছে। বাড়ি পৌঁছে এর পরে যা ঘটল তার কথা এখানে নয়। অন্য একটা কথাই এখানে বলব। আমার মাথায় সেদিন ঘুরছে একটা কৌতুকভরা অভিসন্ধি—মানে এবারে আমি এমন একটা কিছু বিভূতিদাকে দেখাব যাতে বাহবা তাঁকে দিতেই হবে। সে হবে কাল সকালে উঠে। তাই রাতের খাওয়া সেরে আমরা বাবার ছচালা সরু খড়ে ছাওয়া চণ্ডী-মণ্ডপের খোলা রোয়াকে পাশাপাশি দুখানা ক্যামপখাট পেতে ঘুমিয়েছি।

রাত কেটে সবে পুবে ফরসা হয়েছে কি হয় নি। ঠেলে তুললাম বিভূতিদাকে। 'উঠুন। চলুন ঘুরে আসি।' মা ছাড়লেন না। বাসি দুধ ছিল। আজিমগঞ্জের লোহার ছোট্ট উনুনে টিনের বাটির তলায় পুরনো 'বঙ্গবাসী' কাগজে দেশলাই জেলে ফুটিয়ে গরম করে একটু আগেই ভিজিয়ে রাখা চিঁড়ের সঙ্গে আম আর আখের গুড় দিয়ে তখুনি ফলার মেখে খাইয়ে দিলেন। বেরিয়ে পড়ে প্রথমেই আমি বললাম; 'আমাকে আপনি সেবারে কুঠির মাঠ দেখিয়েছিলেন তো? আপনাকে আমি এবার আমাদের মেঘা-পোতার মাঠে নিয়ে যাব।' তাঁর কাছে ধারকরা ভাষায় বললাম, 'আপনাকে একটা "বিউটি স্পট্" দেখাব।' হেসে ফেলে বিভূতিদা বললেন, 'তাই নাকি হে। তা বেশ তো, চলো, আগে সেখানেই যাই।' চলতে-চলতে এবারে আমি হলাম প্রগল্‌ভ বক্তা, বিভূতিদা শ্রোতা এবং নীরব দ্রষ্টা। অসম বন্ধুত্বের পারস্পরিক ভূমিকা এদিন বদলে গেল: আমি দ্বারবাসিনী গ্রামের ভেতর দিয়ে তাঁকে পদ্মবিলের পশ্চিম পাড়ে নিয়ে গেলাম। একনজর চারিদিক চেয়ে দেখেই বিভূতিদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লক্ষ-লক্ষ ফুল আর ফুল, সবই গোলাপি পদ্ম। সে যে কী দৃশ্য তা বলে বোঝানো যায় না। প্রায় এক মাইল চওড়া তিন মাইল লম্বা আকাইপুরের বিলটা শুক্লা একাদশীর চাঁদের মতো বেঁকে-বেঁকে গেছে দক্ষিণ থেকে কাখিতে শেয়ালডাঙা, দ্বারবাসিনী, আকাইপুর, নওদা, মেদিয়া গ্রামগুলি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঘুরে চাকদা আর বনগাঁর চোদ্দ মাইলের লাল সুরকির প্রায় মাঝখান বরাবর পাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত। ঠায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে গ্রীবা সঞ্চালিত করে এপাশ থেকে ওপাশ, আবার ওপাশ থেকে এপাশ চেয়ে-চেয়ে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগলেন বিভূতিদা। শিকারি বাজ-পাখির মতো তাঁর চোখ দুটো তখন তীক্ষ্ণ, একাগ্র হয়ে উঠেছে। চারিদিক চেয়ে-চেয়ে নিরীক্ষণ করছেন। তার-পরই বিভূতিদা কী কাণ্ডই না করতে লাগলেন। লাটিমের মতো নিজের চারিপাশে ঘুরে-ঘুরে ওপর নীচে দশদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মুগ্ধ চোখে অভিভূত হয়ে সব দেখতে লাগলেন। বারাকপুরের কুঠির মাঠের প্রাণকাড়া অবাককরা প্রকৃতি আকাইপুর দ্বারবাসিনী গ্রামে যেন চলে এসে ভিন্ন এক রূপ নিয়ে তাঁকে উদার আহ্বান জানাচ্ছে। দেখতে দেখতে অগাধ বিস্ময়ের গভীরে ঢুকে এবার হঠাৎ উচ্ছ্বাস-ভরা আনন্দে উদ্বেল হয়ে খুশির তোড়ে যেন পাগল হয়ে গেলেন। পথ চলার যে আনন্দ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথের দৃশ্য দেখে যে আনন্দ, সে ছিল অন্য ধরনের। এতক্ষণ আকাইপুরের পথঘাট, কুমোরপাড়ার বাঁশবাগান, আম-অশথ-শিমুল-বট-তেঁতুলগাছের বীথিপথে, সেগুনবনের ভেতর দিয়ে এই পদ্মবিলের অন্যপ্রান্তে আসছিলাম। সেই শুরু থেকে পথের বাঁকে-বাঁকে বহুরঙের পাতালতাফুল, বিবিধ গাছগাছালি, আগাছার জঙ্গল, ঝরা বাঁশপাতায় বিছানো পথের উপরে ছায়াশীতল সুঁড়িপথ বেয়ে দুচোখে তিনি চারিধার যেন গিলতে গিলতে আসছিলেন। এখানে বিলের ধারে পৌঁছে গিয়েই পদ্মফুল দেখে যে তিনি এতটা অভিভূত এবং বিহ্বল হয়ে এমনটি করবেন, তা তখন ভাবি নি।...দাঁড়িয়েই আছেন আর দেখছেন আর দেখছেন।

সযত্নে তাঁর ডান হাতখানি আঁকড়ে ধরে বললাম, 'ওদিকটায় একটু চলুন, আসল জায়গাটাই এখনও দেখা হয় নি।' এই বলে প্রায় টানতে-টানতে নিয়ে গেলাম মেঘাপোতার মাঠে, যেখানে ক্রমোচ্চ ঢালু পথ বেয়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠতে হয়। দুজনে পাশাপাশি উঠে গিয়ে সেই বিরাট সামুদ্রিক কচ্ছপের আকারবিশিষ্ট বিস্তৃত এক মালভূমির মতো মাঠের ওপরে সমতল জমিতে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি, বিভূতিদার সুন্দর আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টি স্নিগ্ধ কোমল হতে-হতে আহ্লাদে উদ্ভাসিত হয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। তিনি যতদূর চোখ যায় খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলো দেখছেন। তারপরই দৃশ্যের পর দৃশ্য নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে আমাদের চোখের আলোয় একে-একে ফুটে উঠতে লাগল।

আমি তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলাম। আলোকলতার টোপর পরা সারি-সারি গোলাকারে সজ্জিত প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া পুঞ্জ-পুঞ্জ ষাঁড়াগাছের ছায়াঘন নিকুঞ্জবন দেখাতে লাগলাম। সেখানে মানুষের হাত পড়ে নি কোনোদিন। তার সৌন্দর্য তার মাধুর্য স্থানীয় মানুষদের চোখে ধরাও পড়ে নি—যুগ যুগ ধরে অনাদরে অবহেলায় উপেক্ষিত হয়েছে মেঘা-পোতার বিস্তীর্ণ মাঠের পূর্বদক্ষিণ, দক্ষিণ আর পশ্চিম সীমান্ত ঘিরে কিছু দূরে-দূরে ছোটো মাঝারি আর উঁচু মাপের পাঁচ-ছয়টি করে ষাঁড়াগাছ একত্রে গায়ে-গায়ে ডালে পাতায় জড়াজড়ি করে ভিন্ন-ভিন্ন দূরত্বে অসংখ্য গোলাকার নওবতখানার মতো মঞ্চের সমষ্টি সৃষ্টি করেছে। যেন গথিক নির্মাণশৈলীর মতো উপরে চুড়ো হয়ে ক্রমোচ্চ ভঙ্গিতে মাথা তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি প্রশস্ত, এবং ফাঁকা মঞ্চের ভিতর বেলেমাটির বৃত্তাকার তলভূমি তৃণগুল্মহীন, এবং কোরা কাপড়ের উত্তরীয়ের মতো পরিষ্কার ধূসর রঙে রঙিন হয়ে চকচক করছে। ভিতরে ঢুকে মাথা তুললেই উপরে দেখা যায় বাইজ্যানটাইন গম্বুজের মতো লতায় পাতায় জড়ানো মজবুত ঘন ছাউনি নিপুণভাবে নির্মাণ করে কে যেন সদ্য-সদ্য আমাদের জন্যে সাজিয়ে রেখে গিয়েছে।

এইসব ষাঁড়াগাছের বাইরের দিকে গা বেয়ে বর্ষাকালে জড়িয়ে-জড়িয়ে লতিয়ে ওঠে ঢোলকলমী আর কেলে-কোঁড়ার লতা, ডগা, পাতা আর ফুল। এখন গ্রীষ্মের তাপে বহিরঙ্গের ভূষণ বিরল হলেও মাথার চূড়ায় ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় গায়ে-গায়ে আলোকলতার সোনালি ডালের জড়াজড়িতে দেখাচ্ছে যেন সবুজ আর রেশমি বুনটে সোনার জরিতে মিলেমিশে চোখ-জুড়ানো বাহারে কিংখাবের ঠাসবুনানি। তারই ছিদ্রপথে আকাশ থেকে সকালের রোদের কণাগুলি মঞ্চের পরিচ্ছন্ন তলভূমিতে

বিন্দু-বিন্দু হিরণ্যবর্ণের বুটি বুনে-বুনে বিচিত্র আলপনা এঁকে দিয়েছে। মাথা নীচু করে প্রবেশপথে একদিক থেকে ভিতরে ঢুকে অপর দিক থেকে বেরিয়ে এসে পরপর এ-ঝাঁক থেকে ও-ঝাঁকের গলি পেরিয়ে বিভূতিদাকে যেন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের মহলে-মহলে ঘোরাতে লাগলাম। চলার পথে আশেপাশে বিরল কিছু কালকাসুন্দা আর আশশ্যাওড়া এবং কচাভেরেণ্ডার ছোটো-ছোটো ঝোপ। আর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তাজা সুগন্ধ সদ্য-ফোঁটা ফুলের ঘেঁটুবন। আপন সৌরভে সুরভিত হয়ে চতুর্দিক মৌ-মৌ করছে। বেলেমাটির আলগা ধুলার স্তূপ সরিয়ে ছাতারে পাখিগুলো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে জলে স্নান করার মতো থেকে-থেকে ডানা ঝাপটাচ্ছে। কাছে-দূরে শালিখ পাখির ঝাঁক বিচিত্র সুরে কলরব করছে। গাছের নীচু সরু ডালে-ডালে চড়াই পাখিরা নেচে-নেচে ঘুরছে। পাশের গাছগুলির উপরের ডালে পাতার আড়ালে বুলবুলিরা গান গাইছে : টুকলি-টুকলি···চিকলু-চিকলু। এদিকে জোড়ায় জোড়ায় খঞ্জনদম্পতি অস্থির হয়ে উড়ে এসে বসছে আর শিশ দিচ্ছে। পদ্মবিলের কিনারে সাদা বকগুলো মাছের লোভে নীরব প্রতীক্ষায় বসে আছে। আশেপাশে কাদা-খোঁচা আর গাঙশালিখের ঝাঁক, উপরে উড়ছে শঙ্খচিল।

এরপর আমরা দুজনে খোলা আকাশের নীচে এসে পৌছলাম। পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছি। সামনে সারি-সারি শিমুলবনের প্রাঙ্গণে শাখাপ্রশাখার বাঁকে-বাঁকে নবীন পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে গ্রীষ্মের সেই সকালের সোনার রৌদ্র এসে পড়েছে আমাদের মুখে বুকে অঙ্গে-অঙ্গে। হালকা হাওয়ায় পদ্মবিলের অগভীর জলে পদ্মের পাপড়ি কাঁপছে, মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, পদ্মপাতা কেঁপে-কেঁপে মাথা নাড়িয়ে জলের উপর মৃদু চক্রাকারে আবর্তের সৃষ্টি করছে। উত্তরপুবে ঘাটের পাড়ে রাখাল ঘোষের আম-বাগানে গাছে-গাছে লম্বা বোঁটায় আম ঝুলছে,—দুলছে। ক্রমশ চড়া রোদের উত্তাপে পশ্চিম-উত্তরের বাঁশের ঝাড়ে-ঝাড়ে মাঝে-মাঝে উথল-পাথল দমকা হাওয়ায় সাঁ-সাঁ-সাঁ শব্দ উঠছে আর বাতাসে দুলে মাথা নাড়িয়ে মোটা তলতা বাঁশের সঙ্গে নিটুর (solid) বাঁশগুলো জট পাকিয়ে গায়ে-গায়ে ঘর্ষণ করে থেকে-থেকে আওয়াজ তুলছে : কট্-কট্-কট্-কট্ ···শোঁয়াও-শোঁয়াও-শোঁয়াও। ··· সেদিনের সেই সুপ্রভাতের প্রসন্ন প্রকৃতি। সেই আকাশ, বাতাস, সেই আলো, আর মধুর-মধুর সুগন্ধ। বিচিত্র ধ্বনিতে, পাখির সংগীতে, গন্ধে বর্ণে রূপে সুসজ্জিত ভুবন যেন সহস্র বাহু বিস্তার করে বিভূতিভূষণকে স্বাগত জানাতে সেই মায়াময় মুহূর্তগুলিতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল।

সম্মোহিত বিভূতিদা এতক্ষণ পরে যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালেন। যেন নেশার ঘোরে কম্পিত স্বরে অস্থির চিত্তে মুখ খুলে প্রথমে আস্তে-আস্তে এবং তারপরই বাঁধভাঙা খুশির জোয়ার বইয়ে বলতে লাগলেন : 'তাই তো করুণা, সত্যিই তো—সত্যিই তো দেখালে বটে একটা 'বিউটি স্পট।' তারপর একটু থামলেন। কী যেন ভেবে নিয়ে জানি না, কেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আর একটানা বলতে আরম্ভ করলেন : 'উফ্! এ-যে কী—ওঃ!—তুমি এসব বুঝবে না—জানো—এ একটা—উঃ! —বুঝলে—এ এমন একটা জিনিস—এ তোমাদের খুব সৌভাগ্য, জানলে···'। আবার একটু চুপ করে আপন মনে কী যেন স্বগতোক্তির মতো দু-চার কথা বলতে গিয়েই আমার চোখে তাঁর আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুটি রাখলেন। কয়েক মুহূর্ত···তারপরই প্রসন্ন হাসি হেসে তাঁর মুখ দিয়ে নীচু স্বরে খেদোক্তির মতো মন্তব্যটি বেরিয়ে এল : 'এ-যে তোমাদের আকাইপুর—এই গ্রাম থেকে অপুর মতো ছেলে বেরুনো উচিত ছিল।'

করুণাময় মুখোপাধ্যায়

স্মরণে

সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন

গৌরকিশোর ঘোষ

সমর সেন, এই নামটির প্রতি প্রথম কেন আকৃষ্ট হই, কবিতা পড়ে, না তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, ইংরাজিতে রেকর্ড নম্বর পেয়ে এম এ পাশ করেছেন, তাঁর একটা পেপার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও যত্ন করে রাখা আছে, এই-রকম একটা কিংবদন্তী শুনে, এখন আর সে কথা ঠিক মনে করতে পারছিনে। তবে ১৯৩৯ সালে মফস্বল শহরে থাকতেই সমর সেনের নাম আমার কানে গিয়ে পৌচেছিল। কবিতা ভবন থেকে বুদ্ধদেব বসু নতুন কবিদের নিয়ে এক পয়সার একটি সিরিজে তাঁদের কবিতা পর পর প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন। এ খবরও আমরা রাখতাম। এবং ৩৯ সন নাগাদই সমর সেনের কয়েকটি কবিতা নামে 'এক পয়সায় একটি সিরিজের' চটি বইটি আমাদের হাতে পৌছে যায়।

এবং সেই মফস্বল শহরে সমর সেনের কয়েকটি কবিতা নিয়ে কবিতাপ্রেমিক তরুণ মহলে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া আর কেউ সমর সেনের কবিতাকে কবিতা বলে গ্রহণ করবার দুঃসাহস দেখাননি। কবি হিসাবে সমর সেন একেবারেই রোমান্টিক ছিলেন না, এ কথা বলা ঠিক হবে না। যাঁরা তাঁর 'গ্রহণে'র আগের কবিতা পড়েছেন, তাঁরা তাঁর কবিতায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং মননের তবকে মোড়া রোমান্টিকতার সন্ধান পাবেন। সমর সেনের কবিতার ভাষা চাঁছা-ছোলা পরিষ্কার গদ্যধর্মী। যদিও তিনি জীবনানন্দ দাসকে 'ইমেজ' শিকারী বলে কখনও কখনও ঠাট্টা করতেন, কিন্তু তাঁর কবিতাতে তিনি 'ইমেজ' ব্যবহারে কিছু কসুর করেননি। তবে সমর সেনের ইমেজারি অত্যন্ত সংযত, এটা বলতেই হবে। সমর সেন ব্যক্তিগত জীবনে যেমন মিতবাক, তেমনই তাঁর কবিতাও। সমর সেনের বাকভঙ্গিমাই এমন ছিল যে, যা বলতেন, সেটাই শ্লেষ বা শ্লেষধর্মী বলে মনে হত। এক কথায় যদি সমর সেনকে বোঝাতে হয়, তবে বলতে হয় যে, তিনি একজন আদ্যন্ত নাগরিক। এবং এই নাগরিকমনস্কতা খুব বেশী লোকের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর এই আরবানিটিই তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

সমর সেনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটে, তিনি যখন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে এসে জয়েণ্ট এডিটারের পদে যোগ দেন। তার আগে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে সেণ্ট্রাল

এভিনিউয়ের কফি হাউসের হাউস অফ লর্ডসে। একদিন দুজনেই আনন্দবাজার পত্রিকার সিঁড়ি ভেঙে উঠছি। একই তলায় আমাদের দুজনেরই অফিস। ওঁর অবশ্য লিফটের কাছেই একটা আলাদা ঘর ছিল। উপরে উঠেই হঠাৎ চোখা-চোখি হয়ে গেল। সমরবাবু স্মিত হেসে বললেন, আরে, আপনি কি এখানেই কাজ করেন? আমিও হেসে বললাম, আজ্ঞা হাঁ। সমরবাবু বললেন, আপনাকে তো কফি হাউসে প্রায়ই দেখি। আমি বললাম, আজ্ঞা হাঁ। আমিও আপনাকে দেখি। সমরবাবু বললেন, আপনার দেখার চোখ আছে তো! আশ্চর্য! সেই হল পরিচয়ের সূত্রপাত। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর সঙ্গে দেখা। তখনও অনুভব করলাম, সেই চাপা এবং উষ্ণ আমন্ত্রণ।

সমরবাবুর সঙ্গে কফি হাউসে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু ওঁকে একা পেলে, কিংবা যদি দেবতাম আমার পরিচিত কেউ ওঁর সঙ্গে আছে, তবে ক্বচিৎ কখনও ওঁর টেবিলে গিয়ে বসেছি। নচেৎ আফিসে, যে কয় মাস উনি ছিলেন, ওঁর ঘরেই ওঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। অবশ্য সমরবাবু বলেই ওঁর সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এবং, যদিও দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বিশেষ হত না, সে সম্পর্কটা ওঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যে বজায় ছিল, তাতে কোনও ভুল নেই।

অথচ পলিটিক্যাল মতবাদে আমি আর সমরবাবু ছিলাম দুই মেরুপ্রান্তের বাসিন্দা। কিংবা এটাও ঠিক বলা হল না। আসলে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেতাম সমরবাবুর সঙ্গে। সেটা ঠিক পরিষ্কারভাবে গুছিয়ে হয়ত বলা যায় না। সেটা এও হতে পারে যে, একটা স্নায়ুপরায়ণ সমাজের স্বপ্ন দুজনেই দেখেছি নিজের নিজের মতো করে। এমন একটা সমাজ যেখানে মানুষ নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। যেখানে শোষণ থাকবে না, পীড়ন থাকবে না। এইরকম কোনও একটা আদর্শে সমরবাবু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। না হলে, তাঁর নিরন্তর সংগ্রামের এবং নীরব আত্মত্যাগের কোনও মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন সিনিক হলে লোকে আদর্শ-কাদর্শ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে ওঠে সমরবাবুর মধ্যে সেই সিনিসিজ্‌ম্ ছিল না, আদৌ তাঁকে সিনিক বলতে পারা যায় কি না, আমার সেই প্রশ্ন। আরবানিটি আর সিনিসিজ্‌ম্ আমার কাছে অন্তত সমার্থক নয়। গভীর প্রত্যয় না থাকলে সমর সেন যেভাবে তাঁর জীবনের শেষ দশ-পনের বছর কাটিয়ে গিয়েছেন, সেটা সেইভাবে কাটিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। শেষ দশ-পনের বছর সমরবাবু একজন সন্তের জীবনই যাপন করেছেন। মানুষের ভবিষ্যতে তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কি না, তা তিনিই ভালো বলতে পারতেন। কিন্তু যতক্ষণ মানুষের সমাজটা আছে, ততক্ষণ সেটা মানুষের আত্মবিকাশের ক্ষেত্র হয়ে উঠুক, এটা হয়ত তিনি চাইতেন। মানুষকে শোষণমুক্ত করতে না পারলে মানুষ আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে না, এটা তিনি জানতেন। মানুষকে শোষণমুক্ত করার সংগ্রামে সমর সেন শেষ অবধি প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর র‍্যাডিক্যালিজ্‌ম্ তিনি শেষ পর্যন্ত যে ছাড়েননি, ফ্রন্টিয়ার কাগজের প্রিন্টার্স লাইনে সম্পাদকের নাম সমর সেনই তার বড় সাক্ষী।

সমর সেন যদি সিনিক হতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে কোনও বড় কাগজে চাকরি নিয়ে স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে যেতেই পারতেন। এরকম সিনিক আমরা হামেশাই দেখি। যদিও তিনি লিখেছেন যে :

তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি
ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য
তার উপরে নেই।

কিন্তু এই নীতি তিনি নিজের জীবনচর্যায় গ্রহণীয় বলে মনে করেননি। আমি যতটুকু তাঁকে চিনি, তাতে বলতে পারি, সমর সেন 'ভারি ট্যাঁক ছাড়া কিছুই টেঁকে না', এ কথা জেনেও কোনদিন কোনও ভারি ট্যাঁককে আমল দেননি।

কবি সমর সেন বয়সে ছিলেন তরুণ। দ্বিতীয়যুদ্ধপূর্ব পৃথিবীর চেহারাটা, বিশেষ করে কলকাতার শিক্ষিত বাঙালির মানসিক চেহারাটা সমর সেনের বুদ্ধিগ্রাহ্য অনুভূতিতে যেভাবে নাড়া দিয়েছিল, তাঁর কবিতায় প্রথম দিকে আমরা তারই স্থলিখিত বিবরণ পাই। যথা :

নিজের ছায়াভীরু,
ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই,
অদৃষ্ট বিরূপ হলে নিষ্ফল পুরুষকার,
মহাশূন্যে কণামাত্র স্ফুলিঙ্গ নেই,
বিচ্ছিন্ন ভারি মেঘ মুখোমুখি মনে হয়,
আসন্ন প্রলয়।
তবু শাহসে বুক বেঁধে, প্রায় খালি বাসে চেপে
ময়দানে উধাও।

কিংবা

নিঃসঙ্গ, শেষ মিনারে

সূর্যপূজারীর শবের উপরে যেমন
শূন্য থেকে আজ
একচক্ষু, ছিন্নপাখা জিজ্ঞাসার পাখি
নামে, শুধু নামে।

কিংবা

মরা সমুদ্রে মরণ আসে না,
লোনা জলে শরীর ভাসে।

উপরের উদাহরণগুলো সবই টানা হল, তাঁর গ্রহণ কবিতা থেকে। এই কবিতা লেখার সময় ইওরোপে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে। সময়কাল সম্ভবত ৩৯। কিন্তু কলকাতার বাঙালির গতানুগতিক জীবনে তার ঢেলা বিশেষ অনুভূত হয়নি তখনও। তখনও 'একটি বুদ্ধিজীবী' ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস শুনছেন,

অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই,
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

সমর সেন কবিতা লিখতে শুরু করেছেন '৪ সাল থেকে। যখন তাঁর বয়েস আঠার। আর পঁয়ত্রিশ বছরে এসেই সমর সেন স্বীকার করেন,

পুত্রকন্যা এখনও আঙুলে গোণা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানি না
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়।

কবি সমর সেন বুঝে গিয়েছিলেন যে, ক্ষুরধার বুদ্ধির একটা ভার আছে। সেই ভারে পঁয়ত্রিশ বছরের যুবাকেও জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে। এই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই সম্ভবত তাঁকে অকালেই অনেক জ্ঞানী করে তুলেছিল।

তখন কারো কারো মুখে শুনেছি,
গণ-আন্দোলনের তত্ত্বকথা,
শুনেছি, মহাত্মাজীর অহিংসা পণ্ডশ্রম,
ভণ্ডামী মাত্র।

সমর সেন অত্যধিক পরিশ্রমে হাহুতাশ চাপেন। কেন না, যদিও পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস, যদিও বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক, তথাপি বামপন্থী পত্রিকায় আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

এই অন্তর্লীন শ্লেষ জীবনের প্রতি, এটা সমর সেনের চরিত্রকে বিশিষ্ট করে রেখেছে। আরেকটা উদাহরণ দিই।

অবশেষে ঠকঠকে বুড়ি হয়ে মায়া গেল,
সংসার খালি,
দূর ছাই, কিছু ভালো লাগে না,
সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায় :
সমাজ বদলেছে অনেক, নিরুপায়,
নইলে হে হরি,
এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী।

৩৯ সনে সমরবাবুর কবিতা লেখা আরম্ভ হয় কি না বলতে পারব না, তবে তাঁর প্রথম কবিতার প্রকাশ ওই সময়েই। আর কবিতার কাল ওঁর শেষ হয় ১৯৫৩ সনে। তার পরে আর মাত্র কয়েকটি কবিতা দেখেছিলাম, দেশ পত্রিকায় ১৯৫৬ সনে। আর আনন্দবাজার পত্রিকায়, পূজা সংখ্যায়। ১৯৬২-তে। এই সবই ৫৩ সনের লেখা।

কবিতায় ক্লান্তির কথা, বার্ধক্যের কথা, সমরবাবুর মুখে শোনা গেলেও, কিছু কিছু কবিতার মধ্যে শুভনাস্তিক্যের স্বাদ পাওয়া গেলেও, সমরবাবু শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতাকেই তাঁর শেষ জীবনের অবলম্বন করে নিয়েছিলেন। এবং অবশ্যই এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক ও কমিটেড যোদ্ধা। শ্রান্তি, ক্লান্তি, বার্ধক্য, জরার চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি 'ফ্রন্টিয়ারে'র আমলে।

সমর সেন প্রথম দিকে অধ্যাপনা করতে ঢুকলেও সেখানে টিঁকে থাকতে পারেননি। ওঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু হয় দিল্লীতে আকাশবাণীর বার্তা দফতরে। তারপরে তিনি আকাশবাণী ছেড়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার বার্তা বিভাগে যোগ দেন। ১৯৫৭ সনে সমরবাবু মস্কো চলে যান, সোভিয়েট প্রকাশনালয়ে অনুবাদকের কাজ নিয়ে। ১৯৬১-তে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। চার বছরের মস্কো-বাসের অভিজ্ঞতা সমরবাবুর সোভিয়েট সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটিয়েছিল। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকায় যোগ দেবার আগে কয়েক বছর তিনি একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করেছেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডেও তিনি বেশী দিন কাজ করতে পারেননি। এই কাগজ ছাড়বার পর তাঁকে হুমায়ুন কবির ডেকে নেন

এবং 'নাউ' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার তাঁকে দেন। এই সময় থেকেই সমর সেনের একটা আলাদা ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটতে থাকে। যেন অজ্ঞাতবাসের পর গাণ্ডীব হাতে অর্জুন। কিন্তু 'নাউ' পত্রিকাতেও সমর সেন, তাঁর র‍্যাডিক্যাল মতবাদের কারণেই, সম্ভবত, টিঁকতে পারেননি। নিজেই 'ফ্রন্টিয়ার' নামে একটি র‍্যাডিক্যাল সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর সম্পাদক ছিলেন।

যেটা বলতে চাইছিলাম, সেটা এই। 'ভারি ট্যাক ছাড়া কিছুই টেঁকে না', সমর সেন, এই সত্য কথাটা জেনেও কেন 'ফ্রন্টিয়ারে'র মতো কাগজে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। যাঁর জীবনে কোনও গভীর বোধ কাজ করে না, যাঁর কোন কমিটমেণ্ট থাকে না, তাঁর পক্ষে কি এমন একটা ত্যাগীর জীবন যাপন করা সম্ভব?

সমর সেনকে কেন্দ্র করে একটা ভক্তগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। জলে যেমন হাঁস বিচরণ করে, ভক্ত বা গুণমুগ্ধদের দ্বারা পরিবৃত সমরবাবুও সেইরকম ছিলেন। সেটা তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ বাঁকা হাসি দেখলেই কারো বুঝতে অসুবিধা হত না।

১৯৪৬ সনে তিনি বোধ হয় শেষ কবিতা লেখেন। 'পাঁচ-মিশেলি' বলে তাঁর তিনটি কবিতা সেই বছরেই দেশ পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর দুটো বেরিয়েছিল ১৯৬২ সনে, আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায়। সমর সেনের 'উড়ো খৈ' বলে কয়েকটা লেখাও আনন্দবাজার পত্রিকার দৈনিক সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় তাঁর যে দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, তার শেষ কবিতাটির নাম নতুন পাতা। সেটা এখানে তুলে দিলাম। সমরবাবুকে ভালো বোঝা যাবে।

মৃত্যুর পরে সব শেষ :
কিছু আহা উহু, বেশি দুর্নাম
চেলারা নতুন গুরুকে করে প্রণাম
বিধবার ঠোঁটে থাকে পানের রেশ।

এই হলেন সমর সেন। এবং এইটেই সম্ভবত তাঁর শেষ প্রকাশিত কবিতা। তাঁর মৃত্যুতে জগতের কী ক্ষতি হবে জানিনে, কিন্তু যাঁরা তাঁকে কাছ থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ থাথা শূন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হবেন, এতে ভুল নেই।

আমি মাসিক "চতুরঙ্গে"র গ্রাহক হতে চাই। যাণ্মাসিক / বার্ষিক গ্রাহক-চাঁদা হিসাবে ২৪ টাকা/ ৪৫ টাকা এই সঙ্গে পাঠালাম। ..... মাস থেকে আমাকে গ্রাহকতালিকাভুক্ত করে নেবেন।

স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

পিনকোড